বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসন

কুণ্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ আলাদি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ আলাদি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে – যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com.*

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসন

প্রাপ্তিস্থান : তুলি _কলম □ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

বেতালপঞ্চবিংশতি
ও
বত্রিশ সিংহাসন

অনুবাদ ও সম্পাদনা □ শুভপতি দত্ত

সাহিত্য তীর্থ □ ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৯৯

প্রকাশক : তীর্থপতি দত্ত ।। সাহিত্য তীর্থ
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং
২৪, কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত
অলঙ্করণ : পল্লব পূততুন্ড, দোলা পূততুন্ড

দাম : ২৫ টাকা

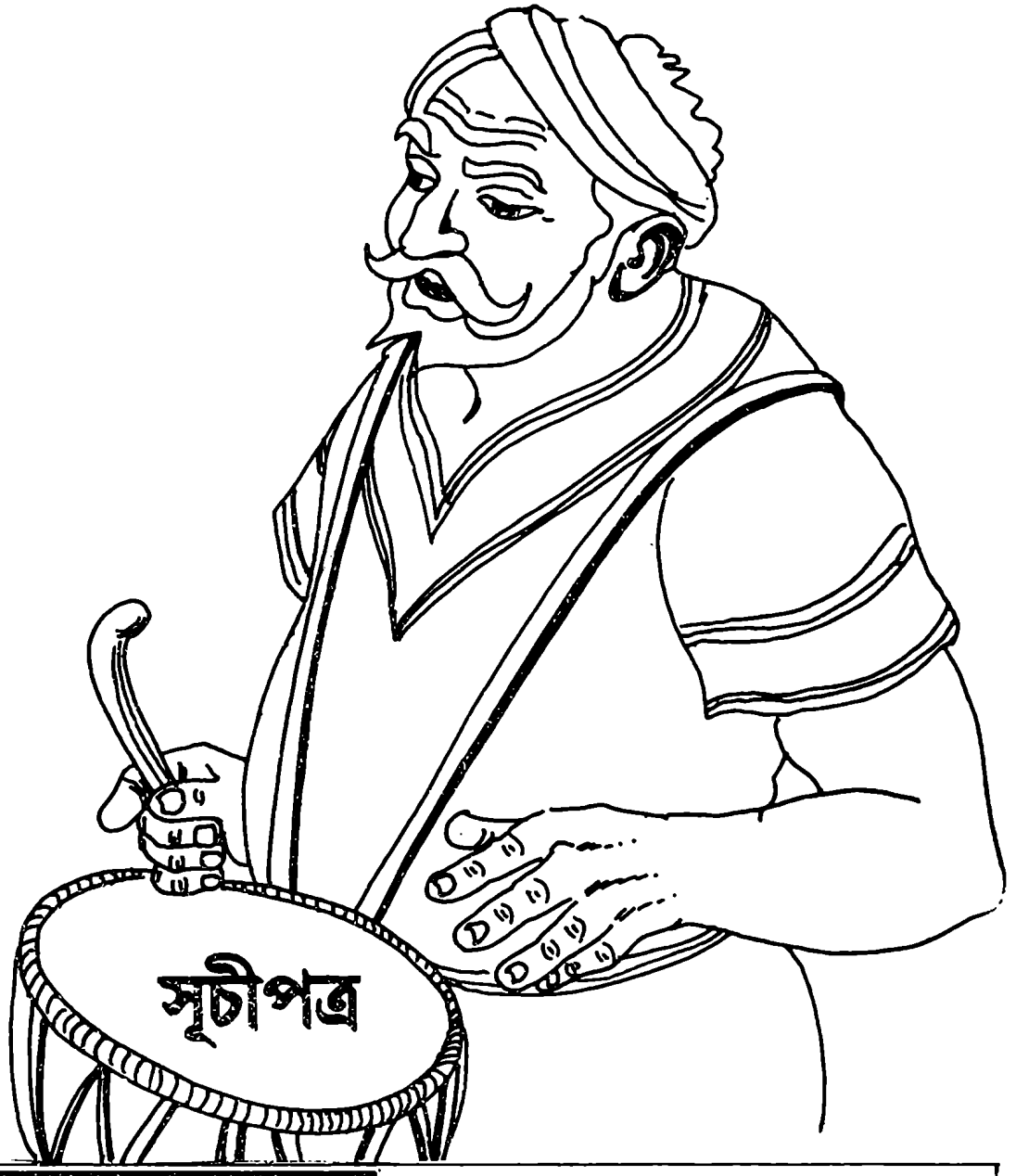

বেতাল পঞ্চবিংশতি ৭

বত্রিশ সিংহাসন ৯৭

বেতালপঞ্চবিংশতি

রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা

আজ থেকে অনেক বছর আগেকার কথা। তখন উজ্জয়িনী নামে এক নগর ছিল। নগরটি দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি সেখানে বাস করতো সব পণ্ডিত আর গুণী লোকেরা। সেখানকার রাজার নাম ছিল গন্ধর্বসেন। তিনিও খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

মহারাজ গন্ধর্বসেনের চার রাণী ও ছয় পুত্র ছিল। রাজকুমাররা গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করে পণ্ডিত ও বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাজা গন্ধর্বসেন হঠাৎ মারা যান। তখন নিয়ম ছিল বড় পুত্র সিংহাসনে বসবে। গন্ধর্বসেনের বড় পুত্র শঙ্কু মহাসমারোহে সিংহাসনে বসেন।

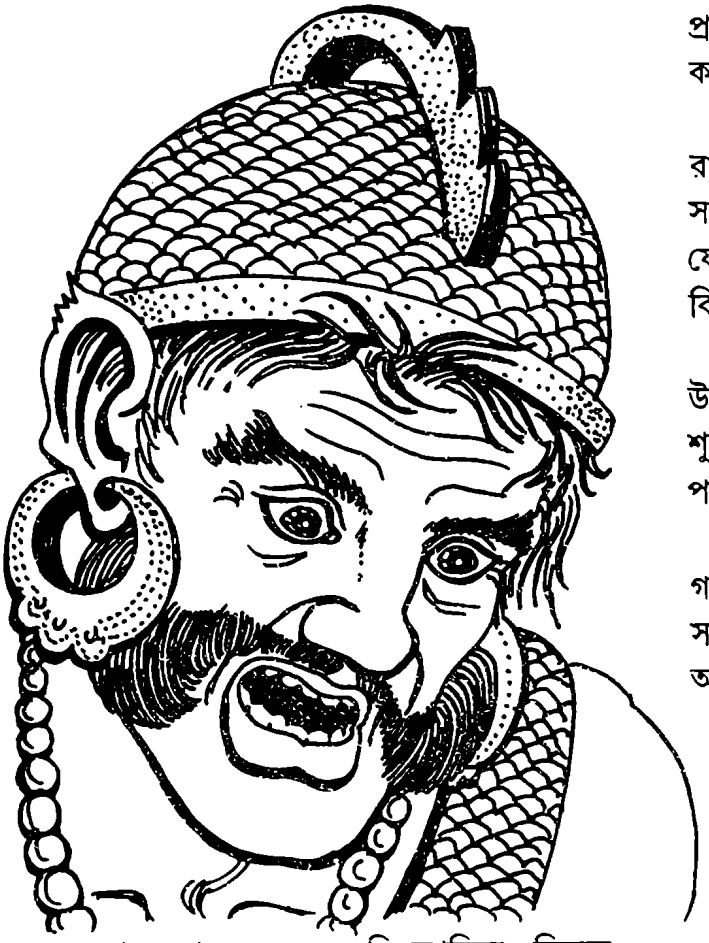

ছয় রাজকুমারের মধ্যে বিক্রমাদিত্য ছিলেন সবচেয়ে ছোট — তাঁর খুব সিংহাসনে বসার লোভ। তাই তিনি চুপিচুপি শঙ্কুকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসলেন।

অবশ্য অন্যায় পথে সিংহাসনে বসলেও রাজা হিসাবে বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত ছিলেন। প্রথমেই তিনি রাজ্যের সীমা অনেক বাড়িয়ে নিলেন। বিক্রমাদিত্যের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন — আমি সকল প্রজার রাজা। প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখার ভার আমার। অথচ আমি রাজপ্রাসাদে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছি। আমার লোকেরা প্রজাদের সাথে কেমন ব্যবহার করে তা একবার দেখা উচিত।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি রাজ্যের ভার তাঁর ভাই ভতৃহরির হাতে দিয়ে ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বের হলেন। বিক্রমাদিত্য বহু দেশ ঘুরলেন, প্রজাদের সাথে আলাপ করলেন, তাদের অসুবিধার কথা শুনলেন।

একদিন তিনি খবর পেলেন যে ভতৃহরি, যার হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে এসেছিলেন, তিনি নাকি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে রাজপাট ফেলে বনে গিয়ে যোগসাধনা করছেন। এ খবর পাওয়ামাত্র বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে হয়েছে কি, দেবরাজ যখন দেখলেন যে উজ্জয়িনীতে কোন রাজা নেই, চারদিকে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে তখন তিনি এক যক্ষকে নগরের পাহারাদার হিসাবে পাঠালেন।

এই যক্ষ বিক্রমাদিত্যকে চিনতো না। সে দেখে গভীর রাতে একটা লোক নগরে ঢুকছে। যক্ষ সাথে সাথে তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এ্যাই, আমায় না বলে কোথায় যাচ্ছিস? তোর নাম কি?

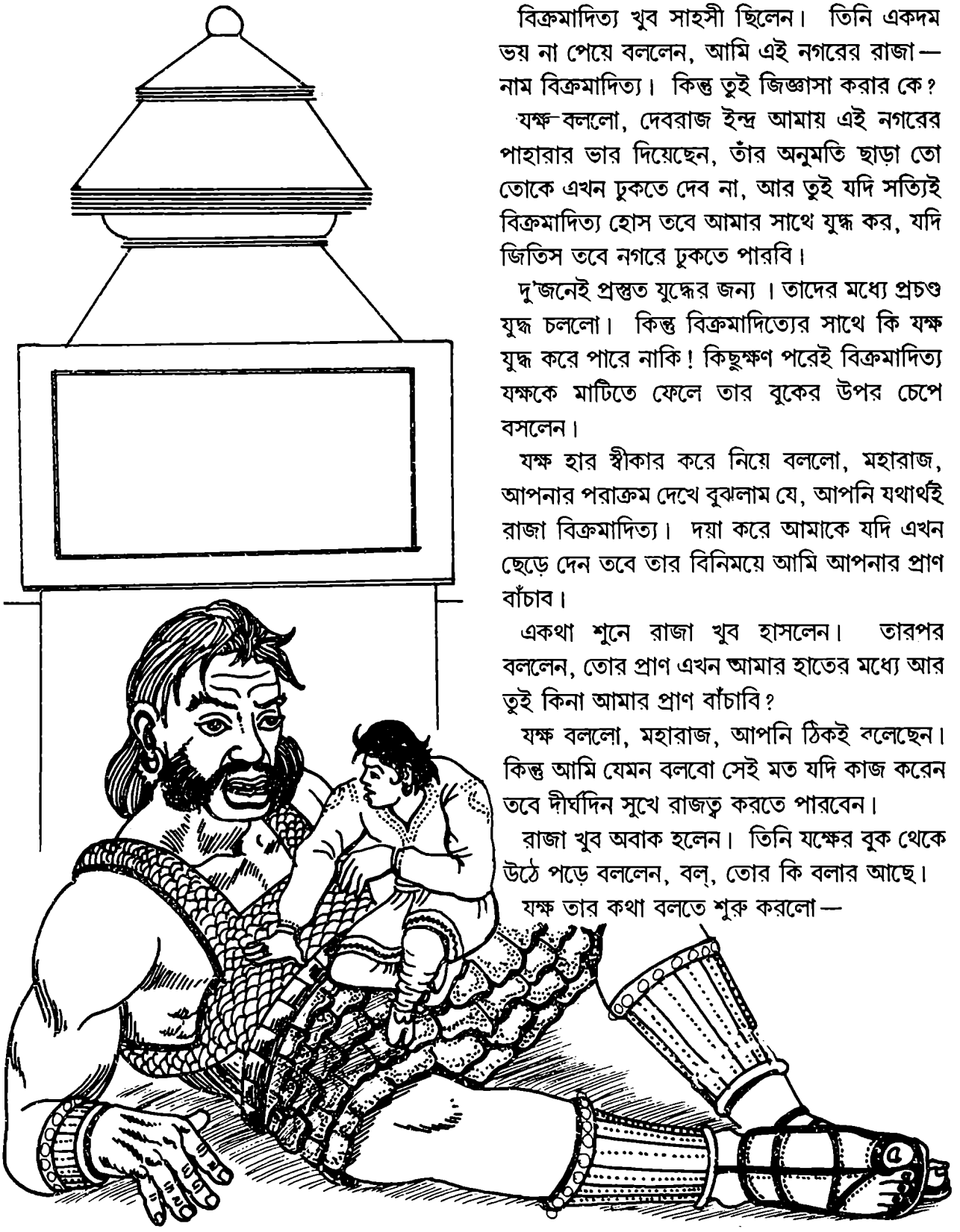

বিক্রমাদিত্য খুব সাহসী ছিলেন। তিনি একদম ভয় না পেয়ে বললেন, আমি এই নগরের রাজা— নাম বিক্রমাদিত্য। কিন্তু তুই জিজ্ঞাসা করার কে?

যক্ষ বললো, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের পাহারার ভার দিয়েছেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া তো তোকে এখন ঢুকতে দেব না, আর তুই যদি সত্যিই বিক্রমাদিত্য হোস তবে আমার সাথে যুদ্ধ কর, যদি জিতিস তবে নগরে ঢুকতে পারবি।

দু'জনেই প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সাথে কি যক্ষ যুদ্ধ করে পারে নাকি! কিছুক্ষণ পরেই বিক্রমাদিত্য যক্ষকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলেন।

যক্ষ হার স্বীকার করে নিয়ে বললো, মহারাজ, আপনার পরাক্রম দেখে বুঝলাম যে, আপনি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। দয়া করে আমাকে যদি এখন ছেড়ে দেন তবে তার বিনিময়ে আমি আপনার প্রাণ বাঁচাব।

একথা শুনে রাজা খুব হাসলেন। তারপর বললেন, তোর প্রাণ এখন আমার হাতের মধ্যে আর তুই কিনা আমার প্রাণ বাঁচাবি?

যক্ষ বললো, মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি যেমন বলবো সেই মত যদি কাজ করেন তবে দীর্ঘদিন সুখে রাজত্ব করতে পারবেন।

রাজা খুব অবাক হলেন। তিনি যক্ষের বুক থেকে উঠে পড়ে বললেন, বল্, তোর কি বলার আছে।

যক্ষ তার কথা বলতে শুরু করলো—

ভোগবতী নামে এক নগর ছিল। সেখানকার রাজার নাম চন্দ্রভানু। চন্দ্রভানুর খুব শিকারের শখ ছিল, মাঝে মাঝেই তিনি দলবল নিয়ে শিকারে বেরোতেন। এমনি একদিন শিকার করতে করতে এক বনে গিয়ে দেখলেন, এক সাধু মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে করে গাছের ডালে ঝুলে আছেন। আশেপাশের গ্রামের লোকেদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সাধু কারো সাথে কোন কথা বলেন না এবং বহুকাল ধরে এমনভাবে তপস্যা করছেন।

বাড়ি ফিরে এসে চন্দ্রভানু মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সত্যি কি কঠোর পরিশ্রম করছেন ঐ সাধু! ওঁর তপস্যা যদি কোনভাবে ভাঙা যায় তবে বেশ হয়।

পরদিন তিনি সারা রাজ্যে ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, যে ঐ সাধুকে রাজসভায় নিয়ে আসতে পারবে তাকে এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

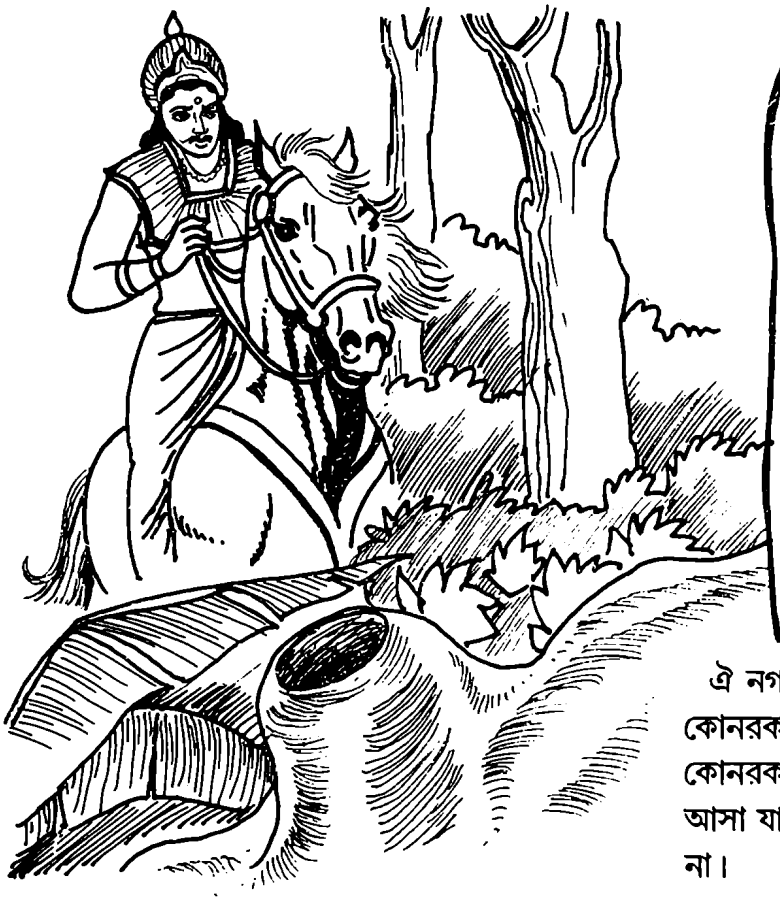

ঐ নগরে একটি মেয়ে থাকতো, সে খুবই গরিব। কোনরকমে দু'বেলা খেতে পায়। সে ভাবলো, যদি কোনরকমে সাধুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে আসা যায়, তাহলে আর আমার কোন অভাব থাকে না।

সে রাজার কাছে গিয়ে বললো, মহারাজ, আমি ঐ সাধুকে বিয়ে করে ছেলেসুদ্ধ এখানে নিয়ে আসবো। আমায় তবে পুরো এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন তো?

মহারাজের সম্মতি পেয়ে মেয়েটি তখনি বনের দিকে যাত্রা করলো। গিয়ে দেখল সাধু সেই একইভাবে পা উপর দিকে, মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে আছেন। সাধুর রোগা-প্যাটকা চেহারা দেখে সে ভাবল, এখন একে না জাগানোই ঠিক হবে। সেখানে একটা কুটির তৈরি করে সে থাকতে লাগল। রোজ সে মোহনভোগ রান্না করতো আর একটু একটু করে সাধুর মুখে দিত। বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগায় সাধুও তা খেয়ে ফেলতেন।

এইভাবে কিছুদিন মোহনভোগ খেতে খেতে সাধু গায়ে জোর পেলেন, চোখ মেলে তাকালেন। তারপর গাছ থেকে নেমে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? একা একা এই বনে কি করছ?

সে উত্তরে বললো, আমি দেবকন্যা, তীর্থ করতে বেরিয়েছি। আপনার কঠোর তপস্যা দেখে ভাবলাম, কিছুদিন এখানে থেকে আপনার সেবা করি।

সাধু খুব খুশি হয়ে বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি খুশি হয়েছি। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আমি তোমার আশ্রম দেখতে চাই।

মেয়েটি সাধুকে তার কুটিরে নিয়ে গেল, আর খুব সেবাযত্ন করতে লাগল। সাধু তার মিথ্যা ছলনায় ভুলে তাকে বিয়ে করলেন এবং সেই কুটিরেই রয়ে গেলেন। এক বছর পর তাদের খুব সুন্দর একটি ছেলে হলো। মেয়েটি তখন সাধুকে বললো, বহুদিন হলো আমরা এখানে আছি, আমার মনে হয় এবার আমাদের তীর্থে বেরোনো উচিত।

সাধু রাজি হলেন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা হলো। মেয়েটি সাধুকে নিয়ে সোজা রাজসভায় এসে উপস্থিত হলো।

তাদের দেখে রাজা তাঁর সভাসদদের বললেন, দেখ মেয়েটি তার কথা রেখেছে। সাধুকে বিয়ে করে ছেলেসুদ্ধ নিয়ে এসেছে। কথামত ওকে এক লক্ষ

মুদ্রা দেওয়া হোক।

একথা সাধুর কানে যেতে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। ছেলেকে সেখানেই ফেলে রেখে তিনি বনের দিকে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক এই রাজার উপর প্রতিশোধ নেবই।

আরও কঠোর তপস্যা করে সাধু আরও ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তারপর রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করলেন।

এখানেই গল্প শেষ করে যক্ষ বললো, মহারাজ, আপনি, চন্দ্রভানু আর ঐ যোগী, তিনজনে একই নগরে, একই লগ্নে, একই নক্ষত্রে জন্মেছিলেন। আপনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হয়েছেন। চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও ভোগবতী নগরের রাজা হয়েছিলেন। আর ঐ যোগী কুমোরের ঘরে জন্মেছিল, কিন্তু যোগসাধনা করে সে অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। চন্দ্রভানুকে হত্যা করে সে তাঁকে বেতাল করে শ্মশানের একটা শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখন আপনাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে। আপনি যদি তার হাত থেকে রেহাই পান, তবে বহুদিন রাজত্ব করতে পারবেন।

এই বলে যক্ষ চলে গেল। বিক্রমাদিত্য এসব কথা চিন্তা করতে করতে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন। প্রজারা এতদিন পর তাদের রাজাকে পেয়ে তো মহা খুশি। গোটা রাজ্যে খুশির জোয়ার ছড়িয়ে পড়লো। রাজাও প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

রাজসভায় একদিন শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী এলেন। তিনি রাজার সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তারপর রাজার হাতে একটা ফল দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন। রাজা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা বলেছিল এ সে নয়তো? না জেনে ফলটা

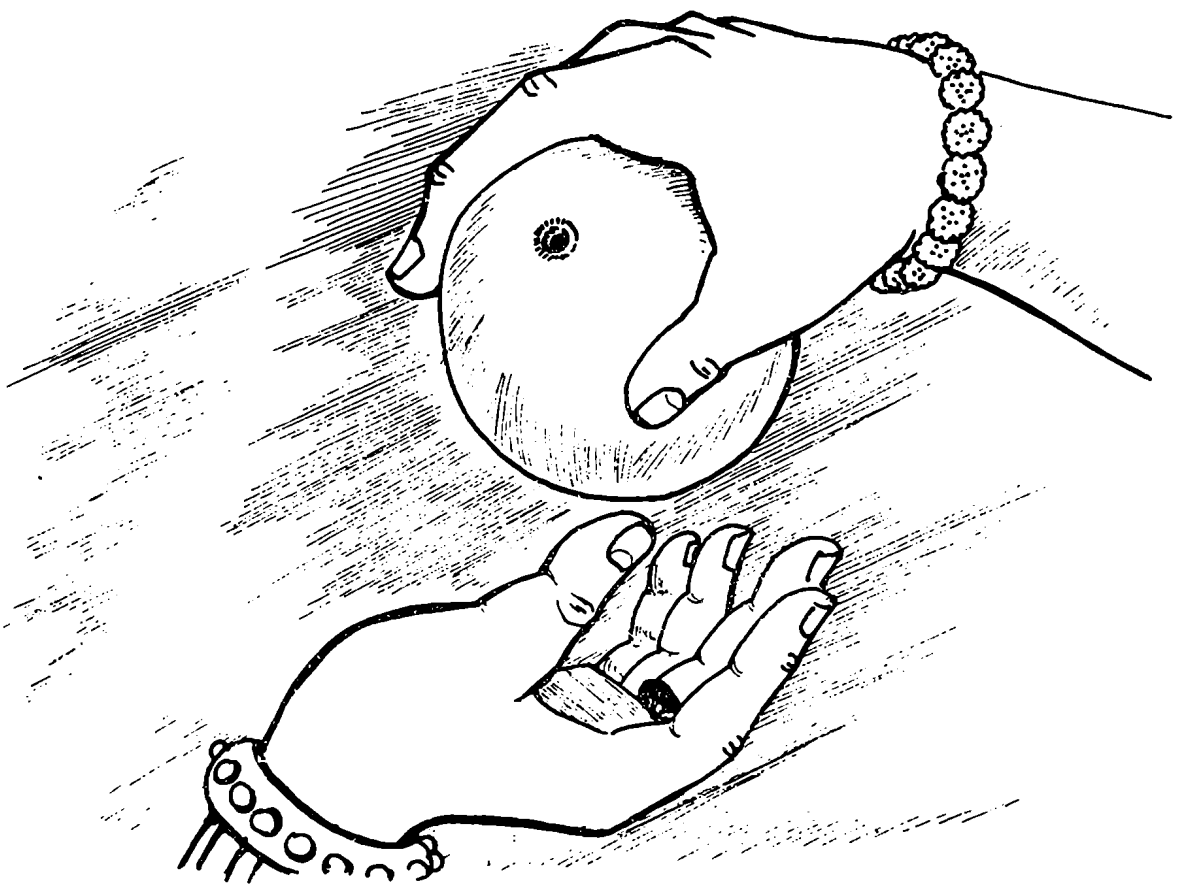

খাওয়া ঠিক হবে না।

তিনি যত্ন করে ফলটা রাজকোষে রেখে দিলেন।

এরপর থেকে সন্ন্যাসী রোজ আসতে লাগলেন আর যাবার সময় একটি করে ফল দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। রাজাও সব ফল রাজকোষে রেখে দিতেন।

একদিন বিক্রমাদিত্য সভাসদদের সাথে ঘোড়াশালা দেখতে গেছেন, সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে রোজকার মত তাঁকে ফলটি দিলেন।

কিন্তু হঠাৎ ফলটি রাজার হাত থেকে পড়ে গেল এবং তার মধ্যে থেকে এক অপূর্ব রত্ন বের হলো। রাজা অবাক হয়ে সাধুকে বললেন, আপনি কি জন্য আমায় এই দামী রত্নযুক্ত ফল দিলেন?

সাধু বললেন, মহারাজ, শাস্ত্রে আছে—রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ এবং চিকিৎসকের কাছে খালি হাতে যেতে নেই, তাই আমি এই ফলটি নিয়ে আসি। আর শুধু এই ফলটির মধ্যেই যে রত্ন আছে তা নয়, আমি প্রতিদিন আপনাকে যে ফলগুলো দিয়েছি, তার প্রত্যেকটার মধ্যে একই রত্ন আছে।

রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে দিয়ে সেই ফলগুলি আনিয়ে ভেঙে দেখলেন প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করে রত্ন আছে। তারপর রাজা এক জহুরীকে দিয়ে সেই রত্নগুলি পরীক্ষা করালেন। জহুরী বললো, মহারাজ, রত্নগুলির মূল্য কয়েক কোটি মুদ্রারও বেশী। এককথায় বলতে গেলে এগুলি অমূল্য রত্ন।

শুনে রাজা খুব আনন্দিত হলেন, তারপর সন্ন্যাসীর হাত ধরে বললেন, প্রভু, আমার সাম্রাজ্যও আপনার এই রত্নগুলির সমান দাম হবে না, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এই সব অমূল্য রত্ন কোথায় পেলেন আর কেনই বা এসব আমায় দিলেন, তা জানতে ইচ্ছা করছে।

সন্ন্যাসী বললেন, মহারাজ, ঔষধ আর মন্ত্রণা সবার সামনে বলা ঠিক নয়। যদি বলেন তো নির্জনে গিয়ে বলি।

রাজা তখন সন্ন্যাসীকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, প্রভু, আপনি আমায় এত দামী দামী রত্ন দিলেন, অথচ একদিনও আমার বাড়িতে কিছু খেলেন না। আদেশ করুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি, আমি প্রাণ দিয়ে তা পালন করবো।

সন্ন্যাসী বললেন, আগামী ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে গোদাবরী নদীর তীরের শ্মশানে আমি মন্ত্রসিদ্ধ করবো; তাতে আমার অনেক ক্ষমতা লাভ হবে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যদি সেদিন রাত্রে আমার আশ্রমে যান আর কথামত কাজ করেন তাহলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

রাজা বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, ঠিক সময়ে আমি আপনার আশ্রমে পৌঁছে যাব।

বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ করে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে সেই কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত এলো। বিক্রমাদিত্য ঠিক সময়ে হাতে একখানা তলোয়ার নিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে দুই হাতে দুটি কঙ্কালের খুলি নিয়ে বাজাচ্ছেন, আর তার চারদিকে বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনীরা নাচছে।

এসব ব্যাপার দেখে বিক্রমাদিত্য কিছুমাত্র ভয় পেলেন না। হাত জোড় করে বললেন, প্রভু, আমি হাজির, বলুন কি করতে হবে।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে হাত দিয়ে সামনে পাতা আসন দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশি হয়েছি। এখান থেকে দুই ক্রোশ দক্ষিণে একটা শ্মশান আছে, সেখানে দেখবে শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝুলছে। তুমি সেটা গাছ থেকে নামিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।

বিক্রমাদিত্য 'যে আজ্ঞা' বলে রওনা হলেন। সন্ন্যাসী আবার যোগাসনে বসলেন।

অমাবস্যার রাত ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। তাতে আবার মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক থেকে ভূতপ্রেতের চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসছে। এমন অবস্থায় কার না একটু ভয় হয়! কিন্তু বিক্রমাদিত্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বড় বড় পা ফেলে শ্মশানে গিয়ে পৌঁছলেন।

সেই বীভৎস জায়গার কথা মুখে বলে শেষ করা যায় না। তিনি দেখলেন, চারদিকে ভূতপ্রেত, ডাকিনীরা জ্যান্ত মানুষ ধরে খাচ্ছে। আর সেই শিরীষ গাছের শিকড় থেকে মগডাল পর্যন্ত ধক্‌-ধক্‌ করে আগুন জ্বলছে।

শিরীষ গাছের আরও কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন গাছের ডালে মাথা নীচের দিকে ও পা দুটি উপর দিকে করে দড়ি বাঁধা একটি মড়া ঝুলছে।

বিক্রমাদিত্যের আর বুঝতে বাকি রইলো না যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা বলেছিল এ সেই। দেরী না করে তিনি তর-তর করে গাছে উঠে কোমর থেকে তলোয়ার বার করে তাই দিয়ে মড়ার পায়ের দড়ি কেটে দিলেন। মড়াটি নীচে পড়েই চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। রাজা তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কি করে তোমার এমন দশা হলো?

এই কথা শুনে মড়াটি খিলখিল করে হাসতে লাগল। এসব দেখে তো রাজা একেবারে হতভম্ব। এই সুযোগে মড়াটি নিজেই সুড়সুড় করে গাছে উঠে আবার আগের মত ঝুলে রইল। রাজাও ছাড়ার পাত্র নন। তিনিও আবার গাছে উঠে দড়ি কেটে তাকে নীচে ফেললেন।

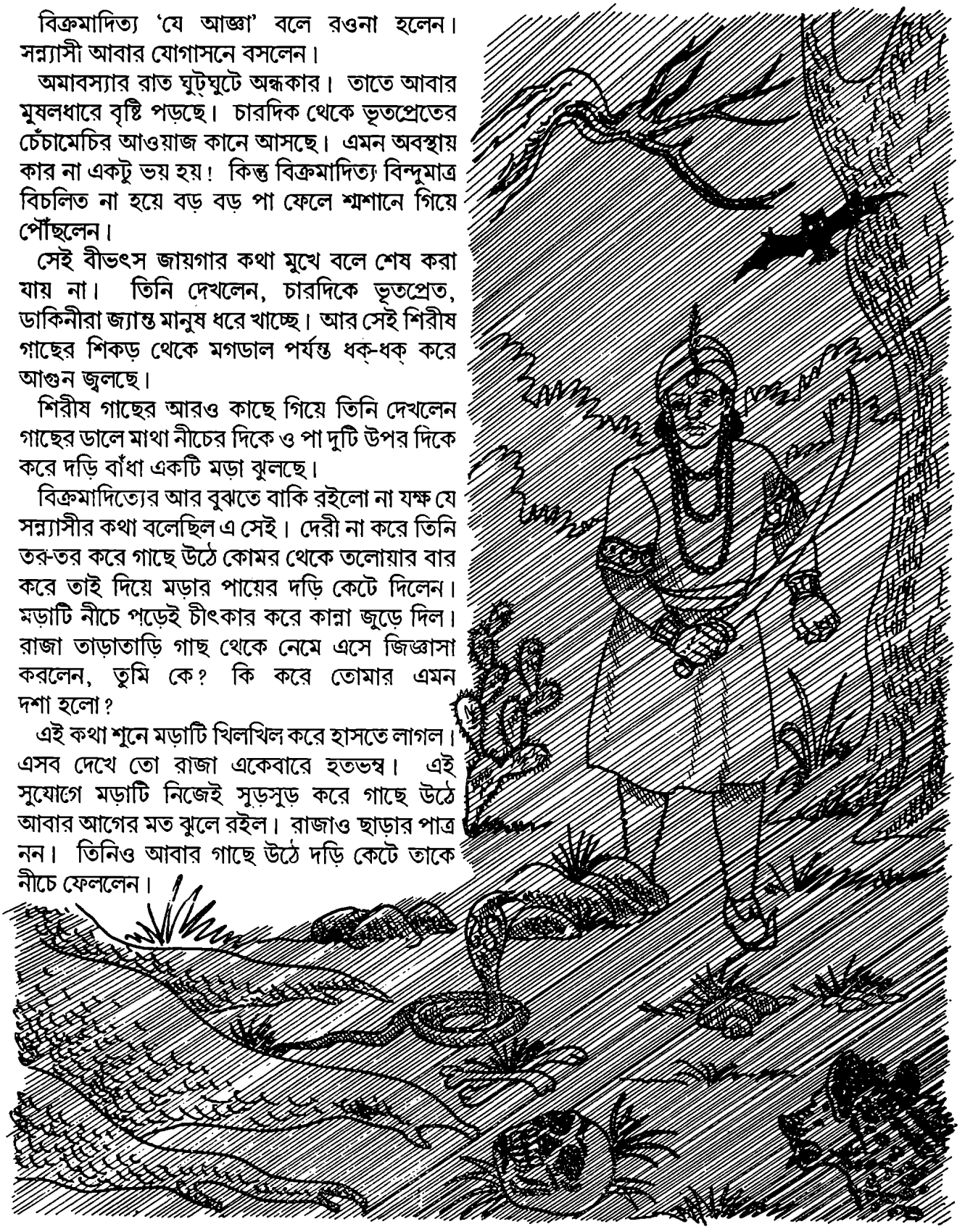

গাছ থেকে নেমে রাজা তাকে তার এই দুরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু সে চুপ করে রইলো।

বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, এ হয়তো সেই রাজা চন্দ্রভানু, সন্ন্যাসী একে এমন করে রেখেছে। তখন তিনি মড়াটিকে নিজের গায়ের চাদর দিয়ে জড়িয়ে কাঁধে তুলে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

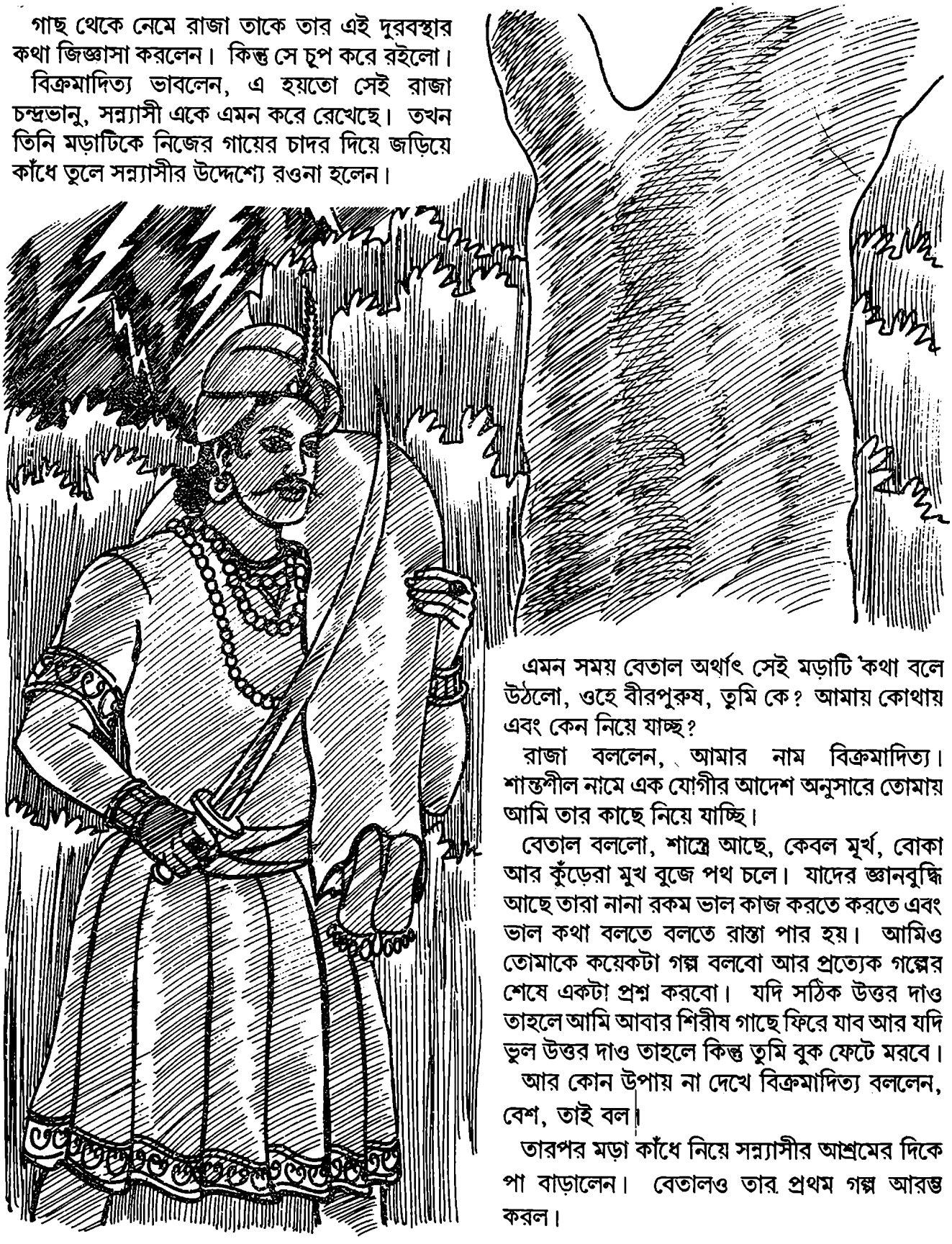

এমন সময় বেতাল অর্থাৎ সেই মড়াটি কথা বলে উঠলো, ওহে বীরপুরুষ, তুমি কে? আমায় কোথায় এবং কেন নিয়ে যাচ্ছ?

রাজা বললেন, আমার নাম বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক যোগীর আদেশ অনুসারে তোমায় আমি তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বেতাল বললো, শাস্ত্রে আছে, কেবল মূর্খ, বোকা আর কুঁড়েরা মুখ বুজে পথ চলে। যাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে তারা নানা রকম ভাল কাজ করতে করতে এবং ভাল কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হয়। আমিও তোমাকে কয়েকটা গল্প বলবো আর প্রত্যেক গল্পের শেষে একটা প্রশ্ন করবো। যদি সঠিক উত্তর দাও তাহলে আমি আবার শিরীষ গাছে ফিরে যাব আর যদি ভুল উত্তর দাও তাহলে কিন্তু তুমি বুক ফেটে মরবে।

আর কোন উপায় না দেখে বিক্রমাদিত্য বললেন, বেশ, তাই বল।

তারপর মড়া কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে পা বাড়ালেন। বেতালও তার প্রথম গল্প আরম্ভ করল।

প্রথম গল্প

সেকালে বারাণসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র পুত্র ছিল। নাম বজ্রমুকুট। সে ছিল বাপ-মায়ের নয়নের মণি।

বজ্রমুকুট শিকার করতে খুব ভালবাসতো। সে একদিন মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে গভীর বনে শিকার করতে গেল। বনের মাঝে এদিক ওদিক কিছুটা ঘোরার পর সে দেখল একটি খুব সুন্দর সরোবর। তার জলে হাঁস, বক আর অন্যান্য জলচর প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৌমাছিরা গুনগুন করে এ ফুল থেকে ও ফুলে বসছে, তীরে কোকিল ও অন্যান্য পাখিরা গান গাইছে। বড় সুন্দর জায়গা। মিষ্টি বাতাস ও গাছের শীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বসলে ঘুম এসে যায়।

রাজকুমার ঘোড়া থেকে নেমে একটা বকুল গাছের সাথে ঘোড়া বাঁধলো। তারপর সরোবরের জলে স্নান করলো। তীরে একটা শিবমন্দির দেখে সেখানে

পূজা করতে বসলো। পূজা শেষ হলে ঠাকুর প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো।

এসে দেখলো এক রাজকন্যা তার সখীদের সাথে এসে স্নান আর পূজা সেরে গাছের ছায়ায় বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে বজ্রমুকুটের খুব ভাল লাগলো।

রাজকন্যাও বজ্রমুকুটকে দেখে মুগ্ধ হলো। তারপর নিজের খোঁপা থেকে একটা পদ্মফুল খুলে হাতে নিল। ফুলটি প্রথমে কানে পরলো, তারপর কান থেকে খুলে দাঁতে কাটলো, তারপর মাটিতে ফেলে দিল এবং যাবার সময় ফুলটি কুড়িয়ে নিজের বুকে রাখলো। তারপর সখীদের সাথে চলে গেল।

রাজকুমার এর কোন মাথা-মুণ্ড বুঝলো না। কিন্তু রাজকুমারীকে তার বড়ই ভাল লেগেছে। বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের সাথে দেখা হতে তাকে সব খুলে বললো। সব শুনে মন্ত্রীপুত্র বজ্রমুকুটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদে ফিরে এলো।

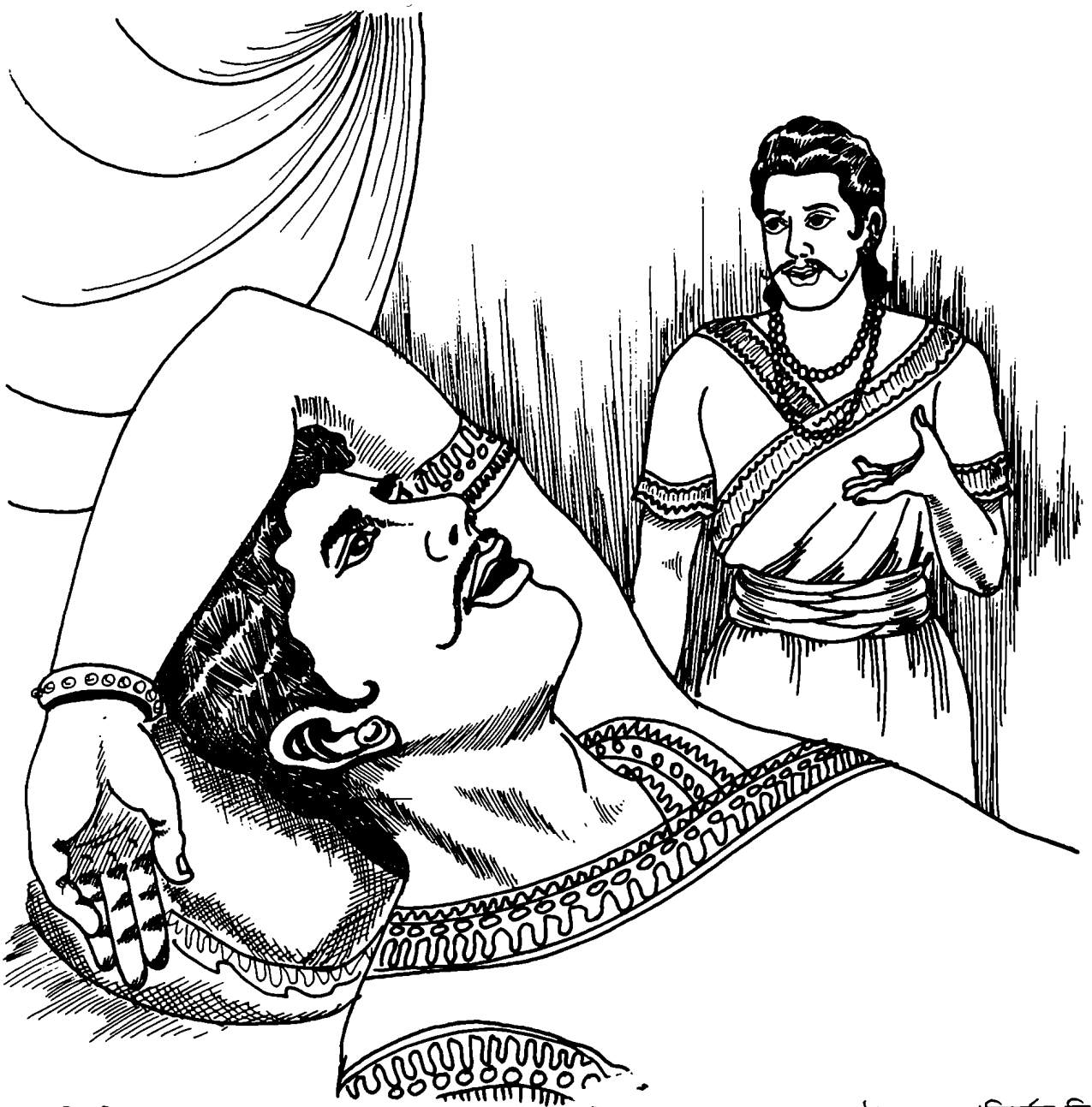

বাড়ি ফিরে রাজকুমার কেবল মনমরা হয়ে বসে থাকে। কারো সাথে বিশেষ কথাবার্তা বলে না, কোন কাজকর্ম করে না, সব সময় কেবল সেই রাজকুমারীর কথা চিন্তা করে। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে না ফলে রাজকুমারের চেহারা ক্রমশ খারাপ হতে লাগলো।

রাজকুমারের এই অবস্থা দেখে মন্ত্রীপুত্রের বড়ই চিন্তা হতে লাগলো। সে একদিন রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার হঠাৎ এমন পরিবর্তন কি কারণে?

রাজকুমার বললো, বন্ধু, আমি যদি ঐ রাজকন্যাকে বিবাহ না করতে পারি তাহলে প্রাণ ত্যাগ করবো।

মন্ত্রীপুত্র বললো, যাবার সময় রাজকন্যা কি তোমায় কিছু বলে গেছে?

বজ্রমুকুট তখন পদ্মফুলের কথা বললো।

মন্ত্রীপুত্র খানিক চিন্তা করে বললো, তাহলে তো সব জানাই হয়ে গেল। শোন, মাথা থেকে ফুলটি নিয়ে কানে পরার মানে সে কর্ণাট নগরে থাকে, দাঁতে ফুল কাটার মানে দন্তকাট রাজার মেয়ে, মাটিতে ফুল ছুঁড়ে ফেলার মানে ওর নাম পদ্মাবতী, আর বুকে তুলে নেওয়ার মানে সে তোমায় বিয়ে করতে চায়।

আর দেরী না করে রাজপুত্র তখনি মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে করে কর্ণাট নগরের দিকে যাত্রা করলো। অবশ্য সঙ্গে রাজকীয় পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র নিতে ভুললো না।

সেখানে পৌঁছে দেখল রাজবাড়ির সামনে এক কুঁড়ে ঘরে এক বুড়ি বসে আছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে বুড়িকে বললো, মা, আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, একটু থাকবার জায়গা দিতে পার?

তাদের সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি কথা শুনে বুড়ির খুব ভাল লাগল। সে বললো, বাছা, আমার এখানে তোমরা যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারো।

আস্তে আস্তে তারা বুড়ির সাথে ভাব জমালো। বুড়ির কাছে শুনলো যে তার ছেলে রাজবাড়িতে চাকরি করে। সে নিজেও রাজকন্যা পদ্মাবতীর ধাইমা ছিল। রাজবাড়ির সকলেই তাকে খুব ভালবাসে। বুড়ি রোজ একবার করে রাজবাড়িতে যায় পদ্মাবতীর সাথে দেখা করতে।

বজ্রমুকুট বললো, মা, তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে? কাল রাজকন্যা পদ্মাবতীকে গিয়ে বলবে, সরোবরের তীরে যে রাজকুমারকে দেখেছিল, সে তার সংকেত বুঝে এখানে এসেছে।

—কাল কেন? আমি এখনই যাচ্ছি। এই বলে বুড়ি রাজবাড়ির দিকে রওনা দিল।

অন্দরমহলে পদ্মাবতীকে একা দেখে সে বললো, বাছা, তোমায় আমি মেয়ের মত করে মানুষ করেছি। আমি চাই কোন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। সরোবরের তীরে যে রাজকুমারকে তুমি দেখেছিলে সে এখন আমার বাড়িতে। আমার মতে সে সব দিক থেকেই তোমার উপযুক্ত।

একথা শুনে রাজকন্যা বুড়ির দু'গালে চড় মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সে বাড়ি এসে রাজকুমারকে সব বললো।

তা শুনে বজ্রমুকুট খুব ভেঙে পড়লো। কিন্তু মন্ত্রীপুত্র বললো, এতে ভেঙে পড়ার কি আছে? গালে দশ আঙুলের ছাপ মানে দশদিন পর তার সাথে তোমার দেখা হবে।

দশদিন পর বুড়ি আবার রাজবাড়িতে গিয়ে রাজকন্যার সাথে দেখা করলো। এবার সে বুড়িকে গলা ধাক্কা দিয়ে খিড়কী-দরজা দিয়ে বার করে দিল।

তা শুনে বজ্রমুকুট খুব হতাশ হলেও মন্ত্রীপুত্র বললো, আর ভাবনা নেই, আজ রাতে রাজকন্যা তোমায় খিড়কী-দরজা দিয়ে যেতে বলেছেন।

সেদিন রাত্রে মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারকে খিড়কী-দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো। ভেতরে গিয়ে বজ্রমুকুট দেখে রাজকন্যা তার জন্যই অপেক্ষা করছে। সেদিন রাতেই দু'জনার বিয়ে হলো। পরদিন রাজকুমার যখন অন্দরমহল থেকে বেরোতে যাবে তখন রাজকুমারী তাকে কিছুতেই ছাড়ল না। দেখতে দেখতে রাজকুমার এক মাস সেখানে কাটিয়ে দিল।

একদিন বজ্রমুকুট রাজকুমারীকে বললো, দেখো আমার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের জন্যই তোমাকে আমি পেয়েছি। অথচ এক মাস হলো আমি তার কোন খবর নিই না। সে কেমন আছে কি করছে তা একবার জানা দরকার।

রাজকুমারী বললো, তুমি খুব অন্যায় করেছ। আমি নানা রকম মিষ্টি তৈরি করে পাঠাচ্ছি। তুমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো।

দীর্ঘদিন পর দুই বন্ধুর দেখা হওয়ায় দু'জনের চোখেই জল এলো। বজ্রমুকুট মন্ত্রীপুত্রকে তার সৌভাগ্যের কথা বললো। তখন রাজকুমারীর সখী এসে মিষ্টি দিয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞাসা করলো, এসব কার জন্য?

রাজকুমার বললো, বন্ধু, আমার স্ত্রী তোমার জন্য এই মিষ্টি পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি যেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে খাইয়ে আসি।

মন্ত্রীপুত্র বড় দুঃখের সাথে বললো, কিন্তু এ মিষ্টি তো আমি খেতে পারব না, এতে বিষ মাখানো আছে। আমার পরিচয় তার কাছে দিয়ে তুমি ঠিক কাজ কর নি।

রাজকুমার তখন একটি মিষ্টি নিয়ে বুড়ির পোষা বিড়ালকে খেতে দিল। তা খাওয়ামাত্র বিড়ালটি মারা গেল।

তখন রাজকুমার খুব ভেঙে পড়লো, বললো, পদ্মাবতীর সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। চলো বন্ধু, আমরা আজই দেশে ফিরে যাই।

মন্ত্রীপুত্র বললো, সেটা করা ঠিক হবে না। তুমি বরং পদ্মাবতীকে গিয়ে বল যে মিষ্টি খেয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাকে কিছুই জানতে দিও না। তারপর রোজকার মত যখন সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তুমি তার গা থেকে সব গয়না খুলে একটা পুঁটলি বাঁধবে আর বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে চলে আসবে।

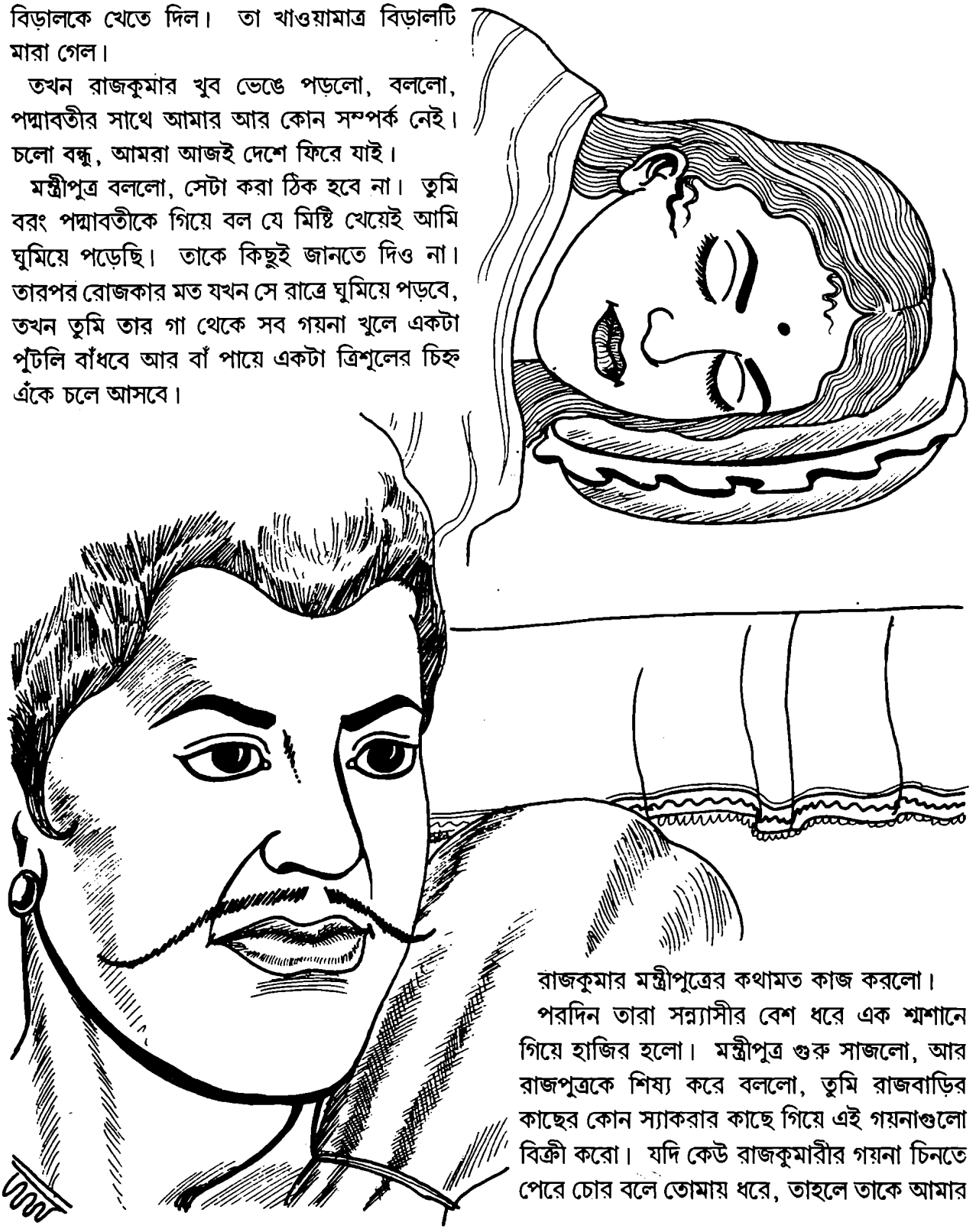

রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রের কথামত কাজ করলো।

পরদিন তারা সন্ন্যাসীর বেশ ধরে এক শ্মশানে গিয়ে হাজির হলো। মন্ত্রীপুত্র গুরু সাজলো, আর রাজপুত্রকে শিষ্য করে বললো, তুমি রাজবাড়ির কাছের কোন স্যাকরার কাছে গিয়ে এই গয়নাগুলো বিক্রী করো। যদি কেউ রাজকুমারীর গয়না চিনতে পেরে চোর বলে তোমায় ধরে, তাহলে তাকে আমার

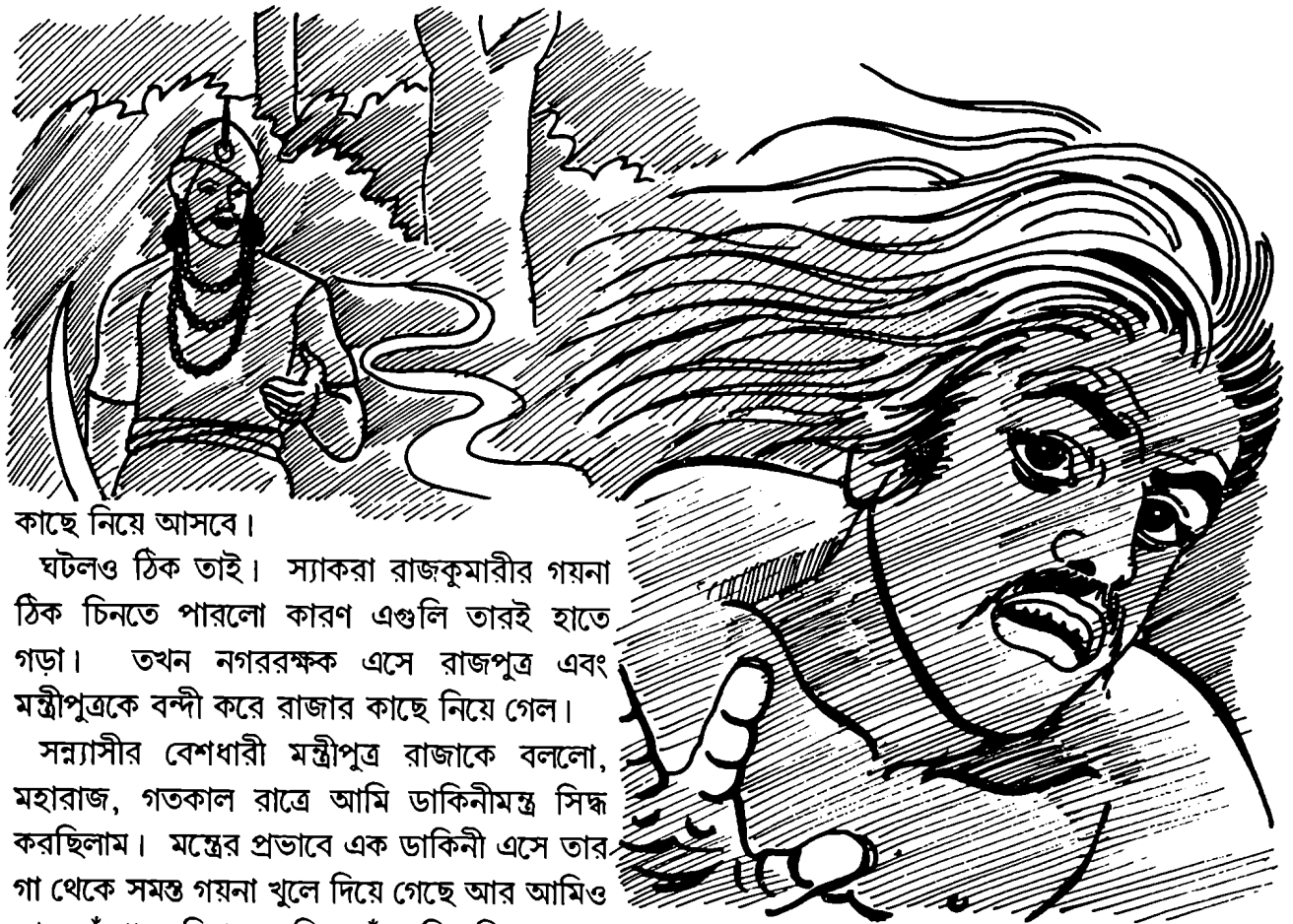

কাছে নিয়ে আসবে।

ঘটলও ঠিক তাই। স্যাকরা রাজকুমারীর গয়না ঠিক চিনতে পারলো কারণ এগুলি তারই হাতে গড়া। তখন নগররক্ষক এসে রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রকে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

সন্ন্যাসীর বেশধারী মন্ত্রীপুত্র রাজাকে বললো, মহারাজ, গতকাল রাত্রে আমি ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করছিলাম। মন্ত্রের প্রভাবে এক ডাকিনী এসে তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে দিয়ে গেছে আর আমিও তার বাঁ পায়ে ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।

রাজা অন্দরমহলে গিয়ে রাণীকে বললেন, দেখ তো পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে কোন চিহ্ন আঁকা আছে কিনা।

রাণী দেখে এসে বললেন, হ্যাঁ, একটা ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

একথা শুনে দুঃখে রাগে অন্ধ হয়ে রাজা হুকুম দিলেন, রাজকুমারীকে গভীর বনে ছেড়ে আসা হোক।

মন্ত্রীপুত্রও রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মাবতীকে যেখানে ছেড়ে আসা হয়েছে সেখানে গেল। গিয়ে দেখে গাছতলায় বসে পদ্মাবতী মনের দুঃখে কাঁদছে। তারপর তাকে শান্ত করে রাজকুমার ঘোড়ার পিঠে নিয়ে নিজের দেশের দিকে রওনা হলো।

রাজা প্রতাপমুকুট ও রাণী এতদিন পর তাদের ছেলে-বৌকে ফিরে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হলেন। রাজধানীতে আনন্দের উৎসব পড়ে গেল।

এখানে গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, এবার বলো, পদ্মাবতী, তাঁর বাবা দন্তবাট আর মন্ত্রীপুত্র, এদের মধ্যে সবচেয়ে অপরাধী কে?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা দন্তবাট।

—কেন? বেতাল প্রশ্ন করল।

বিক্রমাদিত্য বললেন, কারণ, পদ্মাবতী মন্ত্রীপুত্রকে শত্রু মনে করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আর মন্ত্রীপুত্রও পদ্মাবতীকে শত্রু মনে করে তার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল। শত্রুকে মারায় কোন দোষ হয় না। কিন্তু রাজা দন্তবাট ন্যায় বিচার ভুলে মেয়েকে নির্বাসন দিলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার আগের মত শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছের ডালে ঝুলে পড়লো। বিক্রমাদিত্যও তার পিছন পিছন গিয়ে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পুনরায় রওনা দিলেন।

বেতাল তার দ্বিতীয় গল্প শুরু করল।

দ্বিতীয় গল্প

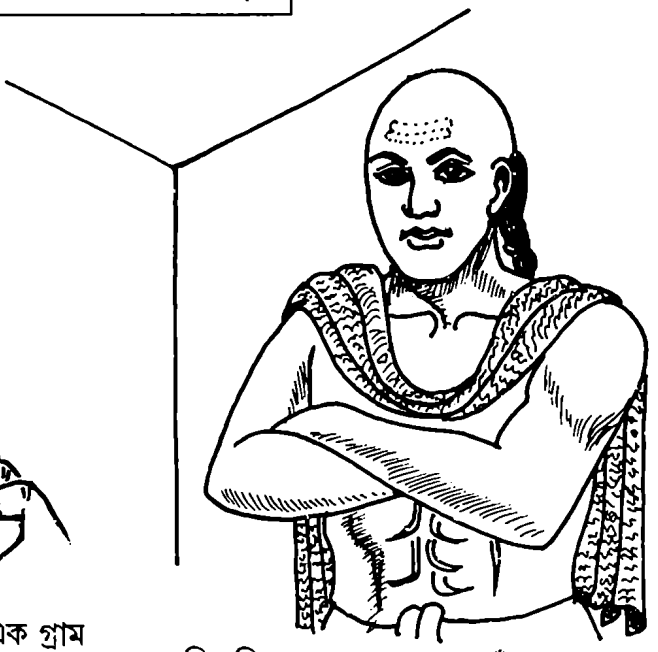

সেকালে যমুনানদীর তীরে জয়স্থল নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে কেশবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ঐ ব্রাহ্মণের এক ছেলে ও মধুমালতী নামে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। ক্রমে মধুমালতীর বিয়ের বয়স হলে ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে চারদিকে ভাল পাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ যজমানের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে গ্রামের বাইরে গেছেন। ব্রাহ্মণের ছেলেও পড়াশুনার জন্য গুরুবাড়িতে গেছে। বাড়িতে শুধু মধুমালতী আর তার মা। এমন সময় ত্রিবিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে কেশবের বাড়িতে এলো। কেশবের স্ত্রী দেখলেন ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমনি মিষ্টি। তার উপর ছেলেটির সাথে কথা বলে বুঝলেন ওদের বংশও ভাল। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, যদি এর সাথে মধুমালতীর বিয়ে হয় তাহলে বেশ হয়। তাকে বললেন, আমার মেয়েকে যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে তোমার সাথে তার বিয়ে দেব। মধুমালতীর সুন্দর রূপে মুগ্ধ হয়ে ত্রিবিক্রম এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হলো। এখন কেশব ফিরলেই সম্বন্ধটা পাকা হয়।

কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে মধুমালতীর সাথে বিয়ে দেবার জন্য একটি করে পাত্র সঙ্গে করে ফিরলেন। তাদের নাম বামন আর মধুসূদন। মোট তিনটি পাত্র হলো, তিনটি পাত্রই রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অবস্থায় ও বংশমর্যাদায় সমান। কেশব মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করছেন এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে বললেন, ওগো, তুমি কি চিন্তা করছ? এদিকে সাপের কামড়ে মধুমালতীর যে প্রাণ যায়!

তখন কেশব, তাঁর ছেলে আর পাত্ররা এদিক ওদিক থেকে পাঁচ ছয়জন বিষবৈদ্য নিয়ে এলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে বিষবৈদ্যরা বললেন, মেয়েকে আর বাঁচান গেল না, এখন যা কর্তব্য তাই করুন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মধুমালতী মারা গেল। সকলে শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন কেশব, তাঁর ছেলে এবং পাত্ররা মধুমালতীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। শোকে কাতর হয়ে কেশব ও তাঁর ছেলে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

পাত্র তিনটি কিন্তু তখনি চলে গেল না। ত্রিবিক্রম নিভে যাওয়া চিতা থেকে হাড়গুলো কুড়িয়ে কাপড়ে বেঁধে ঘরের কোণে রেখে দিয়ে দেশ ঘুরতে বেরোল। বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থে বেরোল। মধুসূদন ঐ শ্মশানের এককোণে পাতার কুঁড়েঘর বানিয়ে চিতা থেকে ছাইগুলো জড়ো করে এনে যত্ন করে কুঁড়েঘরে রেখে যোগাভ্যাস করতে লাগল।

ব্রাহ্মণীর এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে বামন 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে তখনি খাওয়ার পাত্র থেকে হাত তুলে নিলো। তাই দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, কি হলো? খাওয়া বন্ধ করলেন কেন?

বামন বললো, যেখানে এমন রাক্ষুসীর মত মা আছে সেখানে খাই কি করে বলুন?

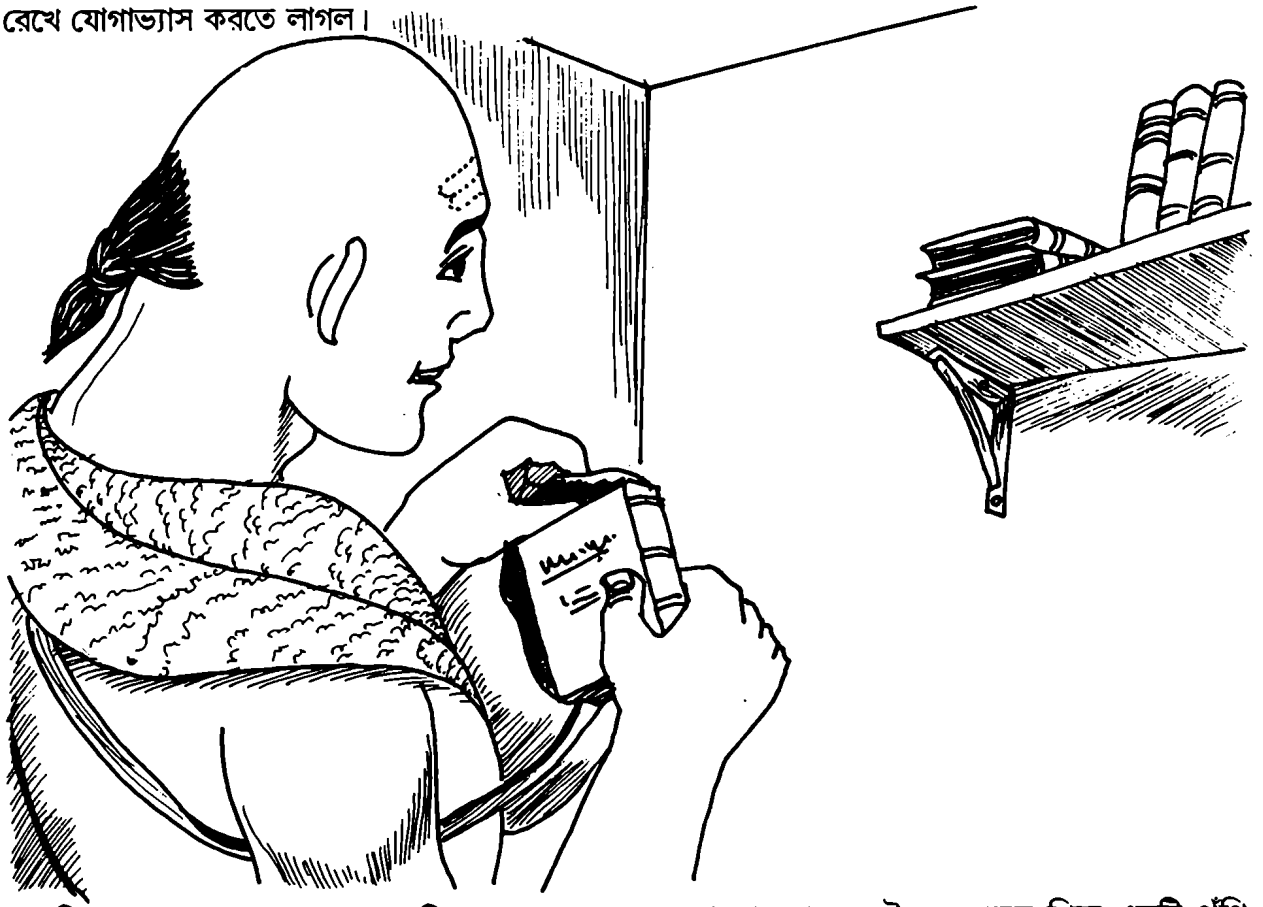

এদিকে বামন ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরবেলা এক ব্রাহ্মণের বাড়ি এলো। ব্রাহ্মণ তাকে আদর আপ্যায়ন করে খেতে বসালেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করতে লাগলেন। এই সময় তাদের পাঁচ বছরের ছেলে মা-কে জ্বালাতন করতে লাগল। ব্রাহ্মণী ছেলেকে নানাভাবে শান্ত করতে লাগলেন; কিন্তু সে কোন কথা শুনল না। তখন ব্রাহ্মণী তিতিবিরক্ত হয়ে ছেলেকে জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। ছেলেটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ তখন একটু হেসে ঘরে গিয়ে একটি পুঁথি নিয়ে এলেন। পুঁথি খুলে একটি মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ছেলেটি প্রাণ ফিরে পেয়ে আবার মাকে জ্বালাতে শুরু করলো।

বামন চমকে উঠে খুশি মনে খাওয়া শেষ করলো এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে এই পুঁথিতে মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র আছে, ঐ মন্ত্র জানতে পারলে, মধুমালতীকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। অতএব যে করেই হোক এটিকে হাতাতে হবে।

এই কথা ভেবে বামন রাতটা সেখানেই থেকে

গেল। গভীর রাতে সবাই যখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে তখন সে পাশের ঘর থেকে পুঁথিটি নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন পর বামন জয়স্থল নগরের সেই শ্মশানে এসে পৌঁছল। দেখলো মধুসূদন পাতার কুটিরে বসে যোগাভ্যাস করছে। এমন সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

তিন পাত্র একজায়গায় হলে বামন বললো, আমি মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র শিখেছি, তোমরা হাড় ও ছাই একসাথে কর, আমি মধুমালতীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারব।

তারা ব্যস্ত হয়ে ছাই ও হাড় জড়ো করে দিলো। তখন বামন পুঁথি খুলে একটি মন্ত্র জপ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে ছাই ও হাড়ের জায়গায় মধুমালতীর সুন্দর দেহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। পাত্ররা আনন্দে অধীর হয়ে বলতে লাগল, আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব। আমার জন্যই ও বেঁচে উঠেছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল।

এখানে গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করলো, মহারাজ এবার বলো, মধুমালতীর সাথে কোন্ পাত্রের বিয়ে হওয়া উচিত?

বিক্রমাদিত্য বললেন, বিয়ে হওয়া উচিত মধুসূদনের সঙ্গে, যে এতদিন পাতার কুটিরে শ্মশানবাসী হয়ে ছিল।

বেতাল বললো, যদি ত্রিবিক্রম হাড়গুলো না রেখে দিত আর বামন সঞ্জিবনী মন্ত্র না সংগ্রহ করতে পারত তবে কী করে মধুমালতী বেঁচে উঠত?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ত্রিবিক্রম হাড় সংগ্রহ করে ছেলের কাজ করেছিল, বামন প্রাণ দিয়ে বাপের কাজ করেছিল। তাদের সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে হতে পারে না। বাকী থাকে মধুসূদন। সে ছাই সংগ্রহ করে, কুঁড়ে ঘর বেঁধে এতকাল অপেক্ষা করেছে। তার সঙ্গেই মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিৎ।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার আগের মত গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্যও পেছন পেছন গিয়ে দড়ি কেটে তাকে পেড়ে এনে, কাঁধে তুলে, সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। বেতালও তৃতীয় গল্প আরম্ভ করল।

তৃতীয় গল্প

সেকালে বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, ধার্মিক ও দয়ালু রাজা ছিলেন। একদিন বীরবর নামে দক্ষিণ দেশ থেকে এক যোদ্ধা এসে তাঁর কাছে কাজ চাইল। তার চেহারা ও মিষ্টি ব্যবহারে খুশি হয়ে রাজা বললেন, বীরবর, তুমি কত টাকা বেতন চাও?

বীরবর বললো, মহারাজ, রোজ এক হাজার সোনার মোহর পেলেই আমার চলে যাবে।

রাজা বললেন, তোমার পরিবারে কতজন লোক?

বীরবর বললো, আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে—এই চারজনের পরিবার।

রাজা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, এর পরিবার ছোট অথচ কি জন্য এত টাকা চায়! নিশ্চয় এর কোন বিশেষ গুণ আছে অতএব কিছুদিন একে রেখে পরীক্ষা করা যাক।

বীরবর প্রতিদিন এক হাজার সোনার মোহর নিয়ে রাজা যে বাড়ি তাকে থাকবার জন্য দিয়েছেন সেই বাড়িতে যায়। বাড়ি গিয়ে মোহরের অর্ধেক বৈষ্ণব, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের দান করে। বাকী টাকা দিয়ে গরিব দুঃখী ও অনাথদের পেট ভরে খাইয়ে সামান্য টাকা নিজের সংসারে খরচ করে।

শুধু একদিন নয়, রোজ সে এইভাবে দিন কাটাতে লাগল। সারাদিন এইভাবে মোহর খরচ করে রাত্রে বীরবর অস্ত্রশস্ত্র ও সাজপোশাক পরে রাজবাড়ি পাহারা দিত। তাকে পরখ করার জন্য রাজা মাঝে মাঝে নানা কঠিন কাজ করতে পাঠাতেন। সে তখনি গিয়ে সে কাজ করে আসত।

একদিন গভীর রাতে হঠাৎ একটি মেয়ের কান্না শুনতে পেয়ে রাজা বীরবরকে এর কারণ খুঁজতে পাঠালেন। নিজেও গোপনে তার পেছনে পেছনে গেলেন।

বীরবর কান্না লক্ষ্য করে এক শ্মশানে পৌঁছল। দেখল এক পরমাসুন্দরী মেয়ে দামী গয়নাগাটি পরে কপাল চাপড়ে হাহাকার করে কাঁদছে। বীরবর তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, মা, আপনি কে? কেনই বা এত রাত্রে একা শ্মশানে বসে কাঁদছেন?

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজা রূপসেনের প্রাসাদে নানা অন্যায় কাজ চলছে, তাই আমি আর সেখানে থাকতে পারছি না কিন্তু আমি চলে গেলেই অলক্ষ্মী আসবে, তখন রাজার খুব অমঙ্গল হবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সে মারা যাবে, এই ধার্মিক গুণী রাজা মারা যাবে তাই আমি কাঁদছি।

এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে বীরবর শিউরে উঠল। দেবীর কাছে হাতজোড় করে বললো, মা, যদি কোন উপায়ে রাজার বিপদ দূর করা যায় তবে আমাকে বলুন, আমি প্রাণ দিয়েও তা করব।

রাজলক্ষ্মী বললেন, সে বড় কঠিন কাজ, পারবে তুমি সে কাজ করতে? এখান থেকে পূর্বদিকে আধযোজন দূরে মন্দিরে এক দেবী আছেন। যদি কেউ তার ছেলেকে নিজের হাতে ঐ দেবীর সামনে বলি দেয় তবে তাঁর দয়ায় রাজার সমস্ত অমঙ্গল কেটে যাবে।

এই কথা শুনে বীরবর বাড়ির দিকে রওনা হলো,

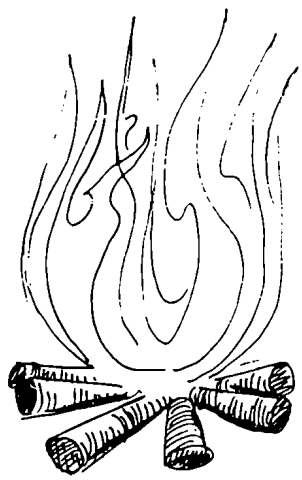

রাজাও তার পেছন পেছন চললেন। বীরবর বাড়ি গিয়ে বউকে সব কথা খুলে বললো। সেও ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে বললো, বাছা, তোমার মাথা কেটে দেবীকে অর্ঘ্য দিলে রাজার অমঙ্গল কেটে যাবে ও রাজ্য শক্তিশালী হবে।

ছেলে বললো, মা, এতো আমার সৌভাগ্যের কথা। প্রথমত তোমার আদেশ মত কাজ করছি, বাবার কর্তব্য পালনে সাহায্য করছি। তাছাড়া নিজের এই তুচ্ছ শরীরটা দেবতাকে নিবেদন করছি। আমার প্রাণত্যাগের এমন ভাল সময় আর আসবে না।

বীরবর ও তার পরিবারের প্রভুভক্তি দেখে রাজা খুব অবাক হলেন এবং গোপনে তাদের পেছন পেছন চললেন শেষটা দেখতে।

কিছুক্ষণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হলো, এবং ফুল, ধূপ, প্রদীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে ভক্তিসহকারে পূজা করল। তারপর ছেলের মাথা কেটে দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিল।

বীরবরের মেয়ে তার ভাইকে খুব ভালবাসত, এই দৃশ্য দেখে সেও খড়্গ নিয়ে নিজের বুকে বসাল। বীরবরের স্ত্রী দুঃখে পাগল হয়ে ঐ খড়্গ দিয়ে আত্মহত্যা করল। তখন বীরবর মনে মনে চিন্তা

ছেলের এই কথা শুনে বীরবর আনন্দিত হলো ঠিকই কিন্তু দুঃখও হলো। হাজার হোক একমাত্র ছেলে। তারপর সপরিবারে পূজার জিনিসপত্র নিয়ে সেই মন্দিরের দিকে চললো।

করতে লাগলো, প্রভুর কাজ শেষ করলাম, স্ত্রী পুত্রকন্যা হারালাম, আর কী সুখে জীবন ধারণ করি। এই বলে সে-ও খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেললো।

রাজা আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, আমার জন্যই এতগুলো প্রাণ গেল। আমার আর এ রাজ্য ভোগ করা সাজে না। তিনি খড়্গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে গেলেন।

তখন দেবী দুর্গা দেখা দিয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, বাছা, তোমার সাহস দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর চাও।

রাজা বললেন, মা, যদি খুশি হয়ে থাক, তবে ঐ চারজনকে জীবনদান কর। দেবী 'তথাস্তু' বলে স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মৃত চারজনের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তারা সুস্থ হয়ে উঠে বসল, যেন ঘুম থেকে উঠল। বীরবর ও তার স্ত্রী-পুত্রদের বেঁচে উঠতে দেখে রাজার মন আনন্দে ভরে গেল এবং দেবীর পায়ে পড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। রাজার ভক্তি দেখে দেবী খুশি হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে আরও বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা রাজসভায় এসে রূপসেন গতরাত্রের আশ্চর্য ঘটনার কথা সবার সামনে বললেন। তারপর সভাসদদের সাক্ষী রেখে, প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, এবার বল তো মহারাজ, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী মহৎ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজাই বেশী মহৎ।

বেতাল বললো, কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, বীরবর প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালন করেছিল। তার স্ত্রী আর ছেলে তো মরবেই, কারণ স্বামীর জন্য আর বাবার জন্য প্রাণ দেওয়া সেবকের ধর্ম। কিন্তু রাজার তো সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তবু তিনি সেবকের জন্য প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন।

এবারও ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গিয়ে শ্মশানের সেই গাছে ঝুলে রইল এবং বিক্রমাদিত্য গিয়ে দড়ি কেটে তাকে কাঁধে তুলে হাঁটতে শুরু করলেন। বেতালও চতুর্থ গল্প শুরু করল।

চতুর্থ গল্প

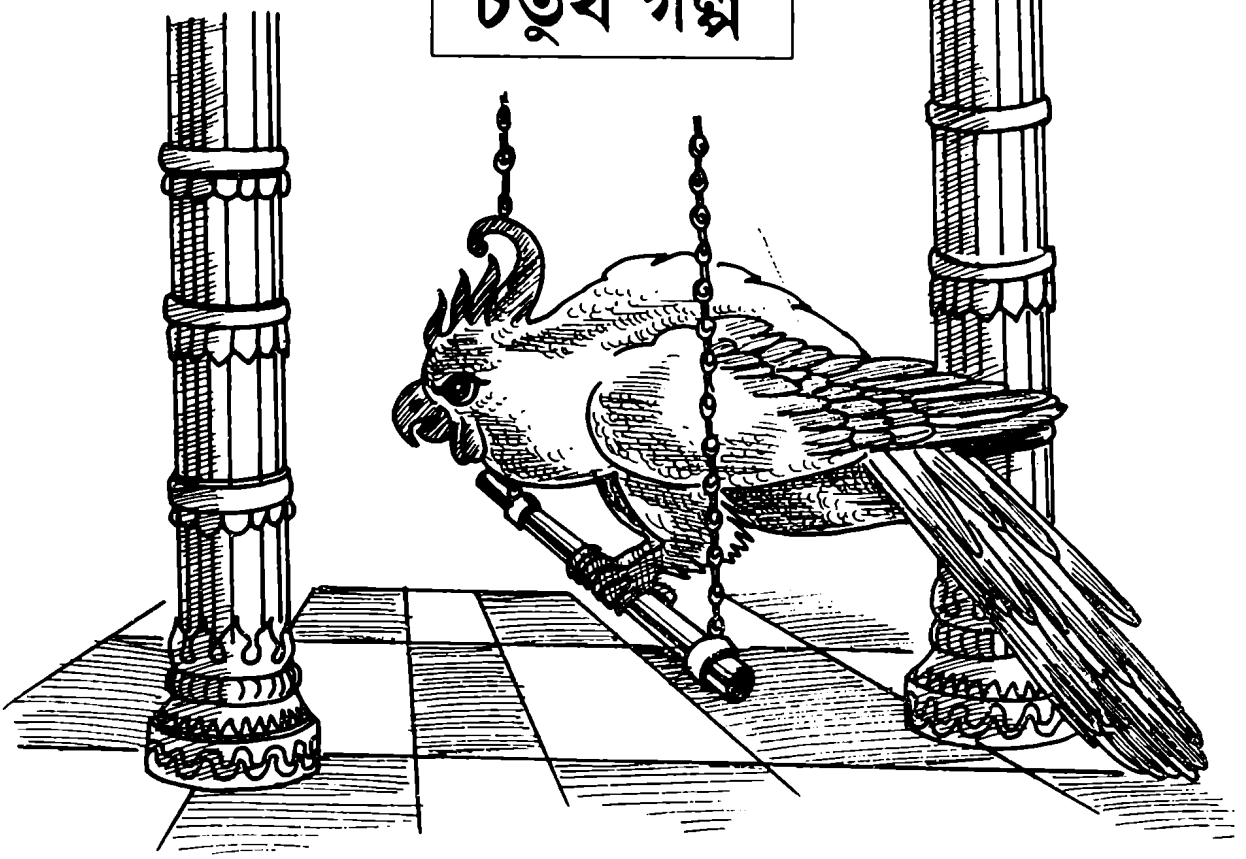

সেকালে ভোগবতী নগরে অনঙ্গসেন নামে একজন রাজা ছিলেন। চূড়ামণি নামে তাঁর একটি আশ্চর্য শুকপাখি ছিল। পাখিটি রাজার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত এবং তার গুণের অন্ত ছিল না। সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সঠিকভাবে বলতে পারত।

একদিন রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যদি তিনকালের কথা জান, তবে বল তো আমার কার সাথে বিয়ে হবে?

চূড়ামণি বললো, মহারাজ, মগধ দেশের রাজা বীরসেনের একটি সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা আছে, তাঁর সঙ্গেই আপনার বিয়ে হবে। নাম চন্দ্রাবতী।

রাজা অনঙ্গসেন চূড়ামণির কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য রাজদৈবজ্ঞ চন্দ্রকান্তকে ডেকে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। চন্দ্রকান্তও গণনা করে ঐ একই কথা বলায়, রাজা এক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে মগধরাজের কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে।

এদিকে চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে একটি সারি ছিল। সেও তিন কালের কথা বলতে পারত। চন্দ্রাবতী সারিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সারি, বল তো আমার মনের মত যোগ্য পাত্র কোথায় আছে?

সারি বললো, রাজকুমারী, ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনের সাথেই তোমার বিয়ে হবে।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই অনঙ্গসেনের দূত মগধরাজের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমনের কারণ রাজার কাছে বললেন। রাজা খুশিমনে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং অনেক দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে বিয়ে পাকা করতে এক ব্রাহ্মণকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন।

এরপর ভাল দিন দেখে অনঙ্গসেন মগধে এসে

চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে নিজের রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

চন্দ্রাবতী যখন তাঁর শ্বশুরবাড়ি ভোগবতীতে আসেন তখন তাঁর অতি প্রিয় সারি মদনমঞ্জরীকেও সঙ্গে এনেছিলেন।

একদিন অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন; তখন রাজা রাণীকে বললেন, দেখ, আমরা যখন বিয়ে করে সুখী হয়েছি তখন আমার ইচ্ছা আমাদের প্রিয় পাখিদেরও বিয়ে দিই। তাহলে তারাও আমাদের মত সুখী হবে। রাজার ইচ্ছায় শুক ও সারিকে বিয়ে দিয়ে একই খাঁচায় রাখা হলো।

একদিন দুই পাখিতে তর্ক শুরু হলো। সারি বললো, পুরুষরা বড়ই স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, অধর্মী এবং খুনি। সেইজন্য পুরুষদের আমার মোটেই ভাল লাগে না।

শুক রেগে বললো, মেয়েদের কথা আর বলো না। তারাও অত্যন্ত চপলা, মিথ্যা কথায় পটু আর লোভী।

উভয়ের এই তর্ক শুনে রাজা বললেন, তোমরা মিছিমিছি তর্ক করে তিক্ততার সৃষ্টি করছ কেন?

সারি বললো, মহারাজ, এ তর্ক মিছিমিছি নয়, পুরুষরা যে কত বড় অধর্মী তা আমার জানা আছে। শুনুন তবে একটা গল্প বলি।

ইলাপুরে মহাধন নামে একজন বণিক বাস করতেন। বিয়ের পর একটিও সন্তান না হওয়ায় বড়ই দুঃখে দিন কাটে মহাধনের। অবশেষে বেশী বয়সে একটি ছেলে হওয়ায় তাঁর আনন্দের সীমা

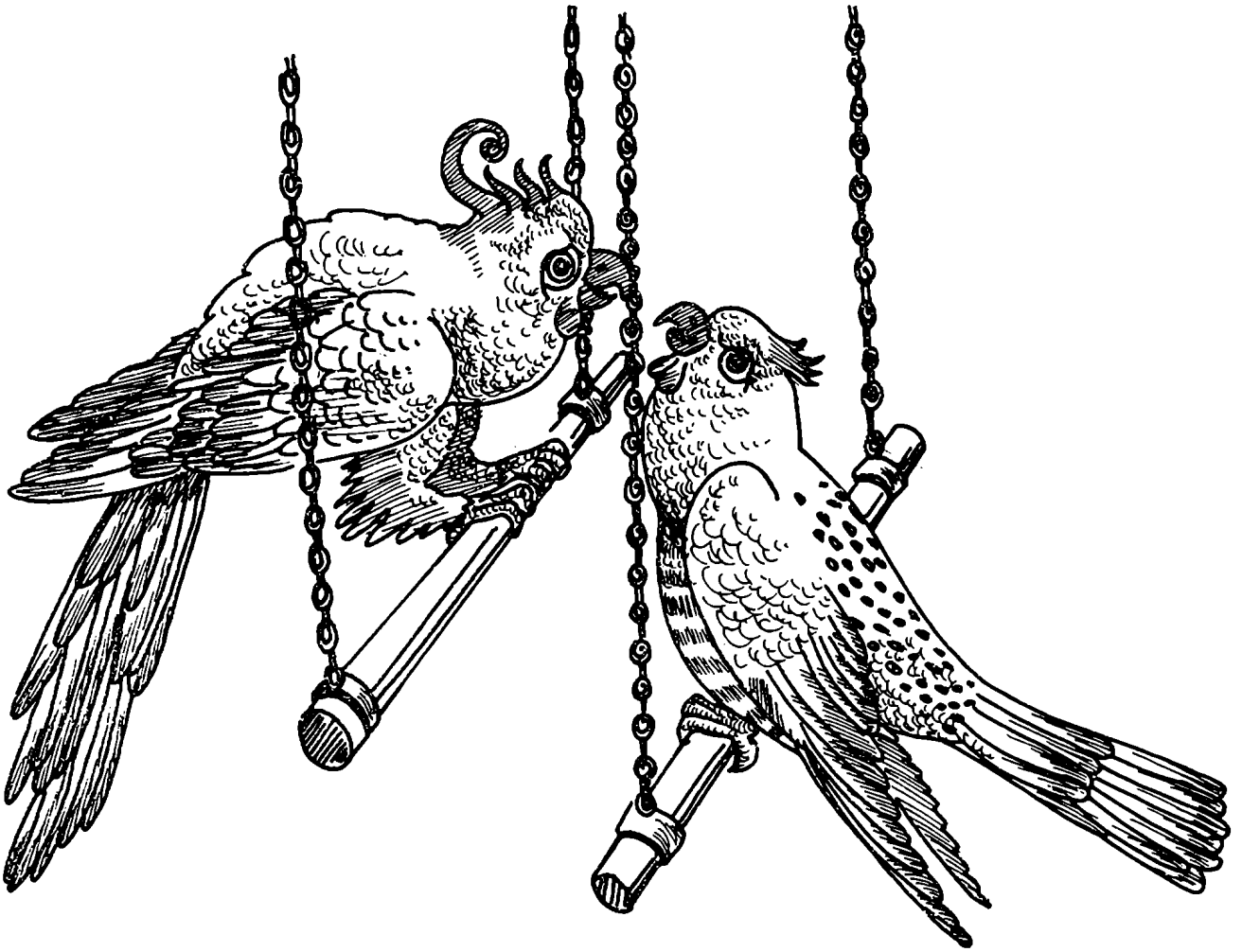

রইল না।

তিনি পুত্রের নাম রাখলেন নয়নানন্দ। পরম যত্নে বাবা মা তাকে মানুষ করতে লাগলেন। পুত্রের যখন পাঁচ বছর বয়স হলো তখন লেখাপড়া শেখার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু নয়নানন্দের স্বভাব মোটেই ভাল না। ছোটবেলা থেকেই সে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতো, লেখাপড়ায় ছিল অমনোযোগী। অনেক বদ অভ্যাস শিখল এবং মুখে খারাপ কথা ছাড়া ভাল কথা ছিল না। বয়সের সঙ্গে এই দোষগুলিও বাড়তে লাগলো।

এই অবস্থায় ইলাপুর ত্যাগ করে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন চন্দ্রপুরে তার বাবার বন্ধু হেমগুপ্তের কাছে গিয়ে বললো, কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ প্রবল ঝড় ওঠায় আমার সমস্ত জাহাজ জলে ডুবে যায়। কোনপ্রকারে একখণ্ড কাঠ সম্বল করে ঢেউয়ের সঙ্গে তীরে এসে আছড়ে পড়লাম। ভাগ্য সহায় ছিল তাই কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গেছি।

এই বলে সে কয়েকফোঁটা চোখের জল ফেললো।

সব ঘটনা শুনে হেমগুপ্তের বড়ই মায়া হলো। তিনি নয়নানন্দকে পরম আদরে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

যথাসময়ে মহাধনের মৃত্যু হলো। বাবার মৃত্যুতে অতুল ঐশ্বর্য নয়নানন্দের হাতে এসে পড়ায় সে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগলো। টাকা কেবল খরচই হচ্ছে, উপার্জন হচ্ছে না কিছুই। এইভাবে চললে রাজাও একদিন ফকির হয়—নয়নানন্দও দুর্দশায় পড়ল। সব টাকা শেষ হয়ে গেল।

হেমগুপ্ত একদিন মনে মনে ভাবলেন, কন্যা রত্নাবতীর জন্য একটি সুপাত্রের তো অনেকদিন ধরেই খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু মনের মত পাত্র পাচ্ছি না। সদ্বংশজাত এবং প্রচুর টাকার মালিক এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভাল।

স্ত্রীকে তাঁর মনের কথা খুলে বলায় স্ত্রীও খুশি হয়ে

মত দিলেন। ছেলেটিকে তাঁরও খুবই পছন্দ।

হেমগুপ্ত তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলে নয়নানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবে রাজি হলো। তারপর ভাল দিন দেখে রত্নাবতীর সঙ্গে নয়নানন্দের বিয়ে হলো। বিয়ের পর উভয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর নয়নানন্দের এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগলো না। আগেকার

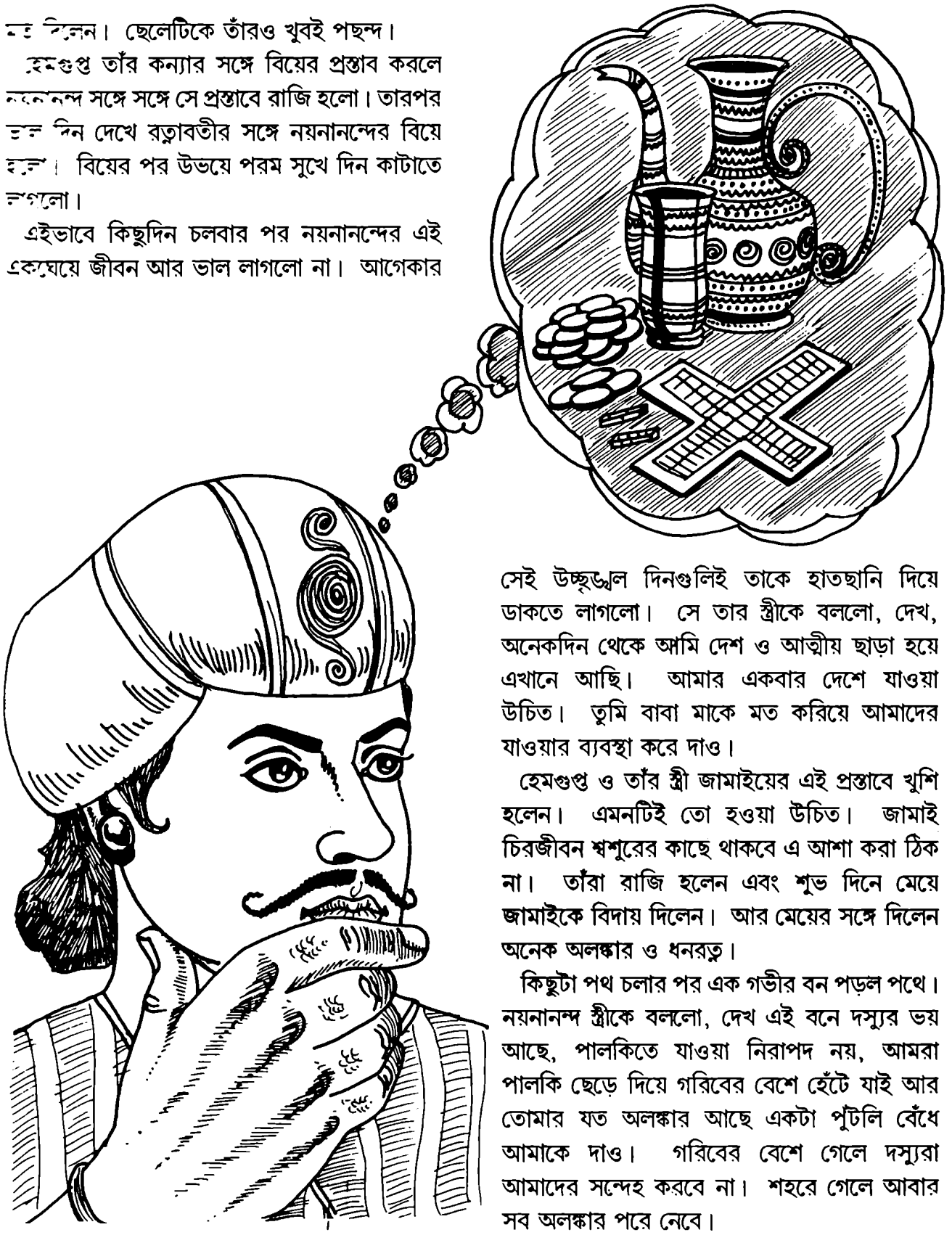

সেই উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলিই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। সে তার স্ত্রীকে বললো, দেখ, অনেকদিন থেকে আমি দেশ ও আত্মীয় ছাড়া হয়ে এখানে আছি। আমার একবার দেশে যাওয়া উচিত। তুমি বাবা মাকে মত করিয়ে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

হেমগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী জামাইয়ের এই প্রস্তাবে খুশি হলেন। এমনটিই তো হওয়া উচিত। জামাই চিরজীবন শ্বশুরের কাছে থাকবে এ আশা করা ঠিক না। তাঁরা রাজি হলেন এবং শুভ দিনে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন। আর মেয়ের সঙ্গে দিলেন অনেক অলঙ্কার ও ধনরত্ন।

কিছুটা পথ চলার পর এক গভীর বন পড়ল পথে। নয়নানন্দ স্ত্রীকে বললো, দেখ এই বনে দস্যুর ভয় আছে, পালকিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, আমরা পালকি ছেড়ে দিয়ে গরিবের বেশে হেঁটে যাই আর তোমার যত অলঙ্কার আছে একটা পুঁটলি বেঁধে আমাকে দাও। গরিবের বেশে গেলে দস্যুরা আমাদের সন্দেহ করবে না। শহরে গেলে আবার সব অলঙ্কার পরে নেবে।

রত্নাবতী খুব সরল মেয়ে। সে সব অলঙ্কার নয়নানন্দকে দিয়ে দিল। নয়নানন্দ সঙ্গের লোকজন ও পালকি বাহকদের বিদায় দিয়ে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। যেতে যেতে বনের মধ্যেই একটি কূয়োর মধ্যে রত্নাবতীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সমস্ত অলঙ্কার ও ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে গেল।

রত্নাবতী সেই নির্জন বনে কূয়োর মধ্যে পড়ে বাবা মার নাম করে জোরে জোরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

একজন লোক সেই বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কান্না শুনে কূয়োর মধ্যে চেয়ে দেখে পরমা সুন্দরী একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে। লোকটি অনেক কষ্টে রত্নাবতীকে কূয়ো থেকে উপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে? এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে তুমি এলেই বা কি করে?

রত্নাবতী প্রকৃত কারণ গোপন করে বললো, চন্দ্রপুরের হেমগুপ্ত বণিক আমার বাবা, আমার নাম রত্নাবতী। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম কিন্তু এখানে আসার পর কয়েকজন দস্যু আমার সব অলঙ্কার নিয়ে আমাকে এই কূয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে আর আমার স্বামীকে তারা মারতে মারতে নিয়ে গেছে।

রত্নাবতীর দুঃখের কথা শুনে লোকটিরও মনে দুঃখ

হলো। দয়ালু লোকটি রত্নাবতীকে তখনই তার বাবা মার কাছে পৌঁছে দিল।

সেখানেও রত্নাবতী প্রকৃত ঘটনা গোপন করায় বাবা মা ও আত্মীয়রা রত্নাবতীর দুঃখে খুবই কাতর হলো। জামাইয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা চিন্তা করে তাঁরা কাঁদতে লাগলো। বাবা হেমগুপ্ত মেয়েকে আবার অলঙ্কার তৈরি করে দিলেন।

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে স্ত্রীর অলঙ্কার বেচে দিয়ে জুয়া এবং মদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সব শেষ করে ফেললো। সে আবার দুর্দশার মধ্যে পরায় ঠিক করলো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আবার কিছু অর্থ হাতিয়ে পালিয়ে আসবে। তার স্ত্রীর প্রতি যে ব্যবহার সে করেছে তা নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির কেউ জানতে পারে নি। মনে মনে এই কুমতলব এঁটে একদিন সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাজির হলো।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল রত্নাবতীর সঙ্গে। নয়নানন্দ স্বপ্নেও ভাবে নি যে তার স্ত্রী বেঁচে আছে, তাই তাকে দেখে সে চমকে উঠলো।

তখন রত্নাবতী বললো, তুমি কিছু ভেব না, আমার বাড়ির কেউ প্রকৃত ঘটনা জানে না। আমি সকলকে বলেছি দস্যুরা আমার সব গয়নাপত্র নিয়ে আমাকে কূয়োর মধ্যে ফেলে তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার জন্য বাবা মা খুবই চিন্তায় আছেন, তোমাকে দেখলে তাঁরা খুব খুশি হবেন। তুমি যেন আবার আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না।

স্ত্রীর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলো নয়নানন্দ। এতদিন পরে জামাইকে দেখে শ্বশুর শ্বাশুড়ি দু'জনেই খুব আনন্দিত হলেন। জামাইকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে যেন উৎসবের ধূম পড়ে গেল।

কিন্তু সেই রাতেই ছোরা মেরে ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করে, তার সব গয়না নিয়ে নয়নানন্দ দূর দেশে পালিয়ে গেল।

গল্প শেষ করে সারি বললো, মহারাজ, যা বললাম তা আমার নিজের চোখে দেখা। সেই থেকে পুরুষদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মেছে আমার।

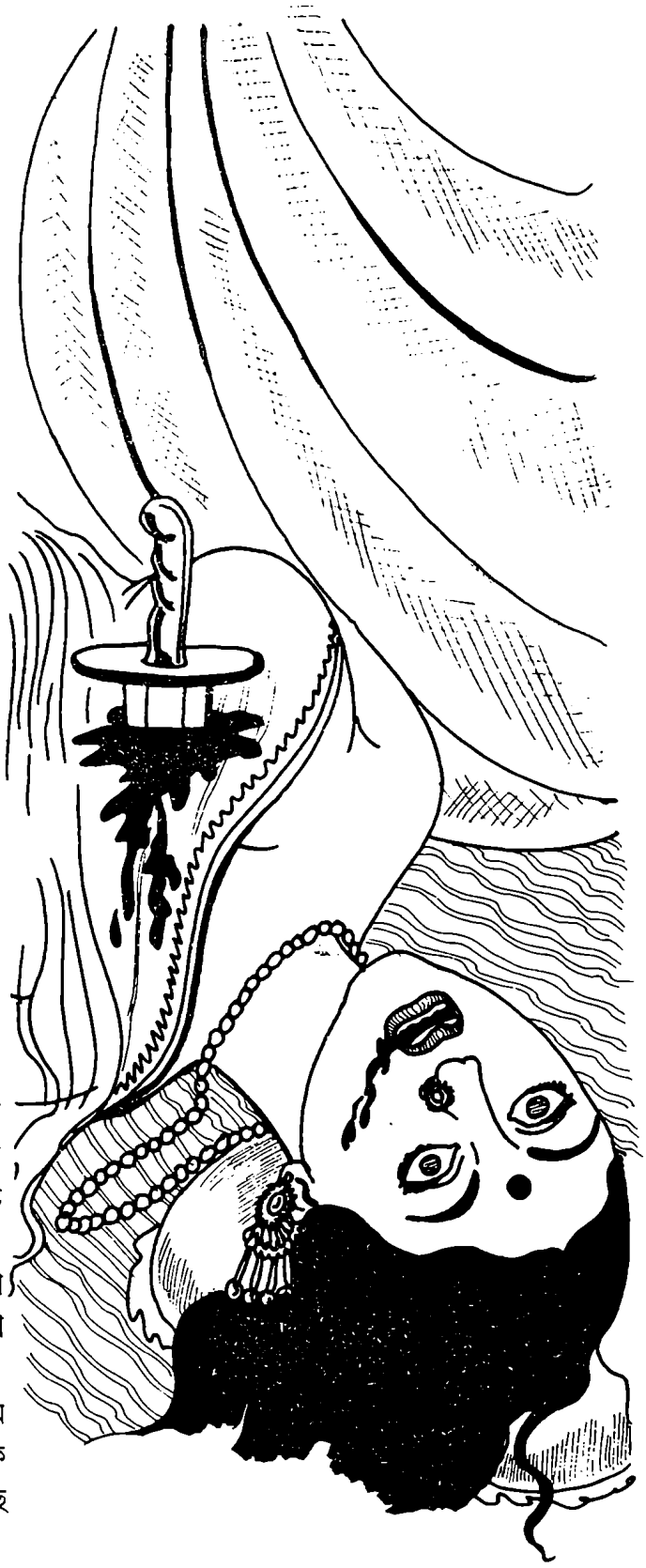

রাজা হেসে বললেন, ওহে চূড়ামণি, এবার তুমি বল কেন তুমি মেয়েদের উপর এত বিরক্ত এবং তাদের দেখতে পার না।

তখন শুক তার গল্প শুরু করল।

কাঞ্চনপুরে সাগরদত্ত নামে এক বণিক ছিলেন। তাঁর ছেলে শ্রীদত্ত ছিল রূপে গুণে ও স্বভাবে সকলের প্রশংসার যোগ্য। অনঙ্গপুরের সোমদত্ত বণিকের

কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য করতে বিদেশে গেলে স্ত্রী জয়শ্রী তার বাবার কাছে গিয়ে থাকল।

অনেকদিন চলে গেল কিন্তু শ্রীদত্ত বিদেশ থেকে না ফেরায় জয়শ্রী অধৈর্য হয়ে উঠল। অন্য মেয়েদের মত তার ভাগ্যে কি ঘরসংসার নেই?

একদিন তার প্রিয় সখীকে মনের কথা প্রকাশ করলো। সখী বললো, ধৈর্য ধর। ভগবান মুখ তুলে চাইলে তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে।

জয়শ্রী কিন্তু সখীর এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সেই সময় একজন রূপবান ও সুবেশ যুবক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। জয়শ্রীর মনে হলো, এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো তবে আমি কতই না সুখী হতাম।

যত দিন যেতে লাগল জয়শ্রীর মন ততই তার স্বামীর উপর বিরূপ হতে লাগল।

কিছুদিন পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য শেষ করে শ্বশুরবাড়ি ফিরে এল। অনেকদিন পর জামাইকে পেয়ে সোমদত্ত ও তাঁর স্ত্রী খুবই খুশি হলেন, কিন্তু জয়শ্রী মোটেই খুশি হলো না।

রাত্রে শাশুড়ি জামাইকে খাইয়ে দাইয়ে শুতে পাঠিয়ে পরে মেয়েকেও পাঠিয়ে দিলেন। জয়শ্রীর এতে ইচ্ছা না থাকলেও মায়ের কথা ফেলতে পারল না। শ্রীদত্ত স্ত্রীকে বিদেশ থেকে তার জন্য আনা সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দিতে গেল কিন্তু সে মুখ বেঁকিয়ে সে সব জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন শ্রীদত্ত খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে অগত্যা শুয়ে পড়ল এবং ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়েও পড়ল।

তখন জয়শ্রী সেইসব ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অলঙ্কার ও শাড়ী পরে সেই গভীর রাতে একলা বেরিয়ে পড়ল। সেই সময় এক চোর কাছেই লুকিয়ে ছিল। এত রাতে দামী গয়না পরে একটি স্ত্রীলোককে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে সে তার পিছু নিল। বেগতিক দেখে জয়শ্রী তার সখীর বাড়ি গেল।

সেদিন রাত্রে সেখানে সেই যুবকটি অতিথি হয়েছিল। কিন্তু একটি বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়ে দিলে সে মারা গেল। জয়শ্রী সেই মৃতদেহের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

কাছেই শিরীষ গাছে একটা ভূত ছিল। সে এই সব কাণ্ড দেখে মেয়েটির উপর খুবই রেগে গেল। মনে মনে বললো, এরকম মেয়েকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। তখন সে যুবকের মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জয়শ্রীর নাকের ডগাটি দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে আবার গাছে গিয়ে চড়ল। চোরটি এমন তাজ্জব ব্যাপার দেখে তো থ !

এতক্ষণে জয়শ্রী বুঝতে পারল যে যুবকটি মৃত। সে তখন তার প্রিয় সখীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললো। সখীকে বললো, বল আমি এখন কি করি? এ অবস্থায় আমি বাবা মার কাছে যাই কিভাবে? আর এর কারণই বা কি বলব? বিশেষ করে আমার স্বামীটিও আজ উপস্থিত। এই সঙ্কট অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া আমার আর পথ নেই, তুমি আমাকে বিষ এনে দাও তাই পান করে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার পাই। এই বলে সে কপাল চাপড়াতে লাগল।

সব শুনে জয়শ্রীর সখী চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর জয়শ্রী বললো, আমি একটা ভাল উপায় বের করেছি। ভেবে দেখ কেমন হবে। আমি এই অবস্থায় ঘরে ঢুকে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ

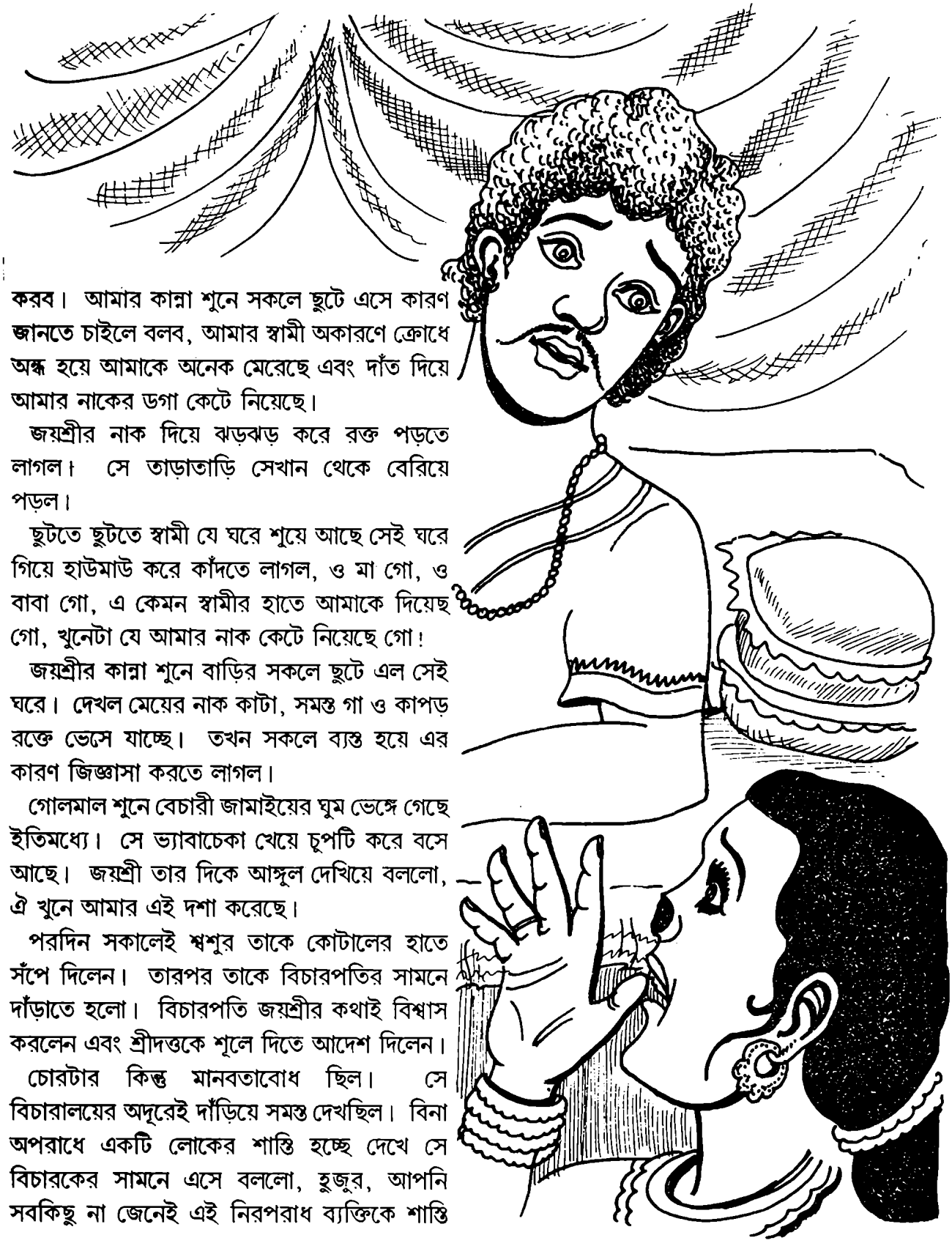

করব। আমার কান্না শুনে সকলে ছুটে এসে কারণ জানতে চাইলে বলব, আমার স্বামী অকারণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমাকে অনেক মেরেছে এবং দাঁত দিয়ে আমার নাকের ডগা কেটে নিয়েছে।

জয়শ্রীর নাক দিয়ে ঝড়ঝড় করে রক্ত পড়তে লাগল। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ছুটতে ছুটতে স্বামী যে ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরে গিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, ও মা গো, ও বাবা গো, এ কেমন স্বামীর হাতে আমাকে দিয়েছ গো, খুনেটা যে আমার নাক কেটে নিয়েছে গো!

জয়শ্রীর কান্না শুনে বাড়ির সকলে ছুটে এল সেই ঘরে। দেখল মেয়ের নাক কাটা, সমস্ত গা ও কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

গোলমাল শুনে বেচারী জামাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেছে ইতিমধ্যে। সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপটি করে বসে আছে। জয়শ্রী তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, ঐ খুনে আমার এই দশা করেছে।

পরদিন সকালেই শ্বশুর তাকে কোটালের হাতে সঁপে দিলেন। তারপর তাকে বিচারপতির সামনে দাঁড়াতে হলো। বিচারপতি জয়শ্রীর কথাই বিশ্বাস করলেন এবং শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ দিলেন।

চোরটার কিন্তু মানবতাবোধ ছিল। সে বিচারালয়ের অদূরেই দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখছিল। বিনা অপরাধে একটি লোকের শাস্তি হচ্ছে দেখে সে বিচারকের সামনে এসে বললো, হুজুর, আপনি সবকিছু না জেনেই এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি

দিচ্ছেন। আমার অনুরোধ, আপনি ন্যায় বিচার করুন। এই দুষ্টু মেয়েটির কথা বিশ্বাস করবেন না।

বিচারক তখন চোরের কাছে প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলেন। চোরের কথামত জয়শ্রীর সখীর বাড়িতে লোক পাঠালেন সত্য যাচাই করার জন্য। যখন তারা সত্যি সত্যি সেখানে মড়া মানুষটিকে দেখতে পেল আর জয়শ্রীর নাকের কাটা ডগাটিও নিয়ে এল তখন বিচারক চোরের কথাই সত্য বলে মেনে নিলেন এবং জয়শ্রীর মাথা মুড়ে, ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে শহরময় ঘোরাতে আদেশ দিলেন। শ্রীদত্তকে অন্যায়ভাবে হেনস্থা করার জন্য পুরস্কারদানে তাকে সন্তুষ্ট করলেন।

গল্প শেষ করে শুক বললো, তবেই বুঝুন মহারাজ, কেন আমি মেয়েদের পছন্দ করি না।

গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করলো, এবার বল তো মহারাজ কে বেশী খারাপ? নয়নানন্দ না জয়শ্রী?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে দুইজনই সমান।

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্যও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে ফেলে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

বেতালও তার পঞ্চম গল্প শুরু করল।

পঞ্চম গল্প

ধারা নগরে মহাবল নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর দূতের নাম ছিল হরিদাস। ঐ দূতের মহাদেবী নামে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটি বড় হলে হরিদাস উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে লাগলো।

মহাদেবী যখন জানল যে তার বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে তখন সে বাবাকে গিয়ে বললো, বাবা, আমাকে এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবে যার মধ্যে সমস্ত গুণ আছে।

হরিদাস মেয়ের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং সেই মত পাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে ডেকে বললেন, দক্ষিণদেশে হরিশচন্দ্র নামে আমার এক পরম বন্ধু আছেন, অনেকদিন হলো তাঁর কোন সংবাদ না পেয়ে খুবই চিন্তায় আছি, তুমি সেখানে গিয়ে তাঁর শুভ সংবাদ এনে আমাকে দাও।

রাজার আদেশ পেয়ে হরিদাস রওনা হলো। রাজা হরিশচন্দ্র দূতের কাছে বন্ধুর শুভ সংবাদ পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং দূতকে যথোপযুক্ত উপহার দিয়ে তাঁকে কয়েকদিন রাজপ্রাসাদে থেকে যেতে বললেন।

একদিন হরিদাসের কাছে এক ব্রাহ্মণপুত্র এসে বললো, আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার আছে।

হরিদাস অবাক হয়ে বললেন, বল তোমার কি চাই। যদি আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হয় তবে অবশ্যই তা পাবে।

ব্রাহ্মণপুত্র অসঙ্কোচে বললো, আপনার একটি পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে, আমি তাকে

বিয়ে করতে চাই, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিন।

হরিদাস বললেন, আমার কন্যার ইচ্ছা — যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হবে, তাকেই বিয়ে করবে।

ব্রাহ্মণপুত্র বললো, আমি ছোটবেলা থেকেই সমস্ত বিদ্যা রপ্ত করেছি। তা ছাড়া আমি এমন একখানা রথ তৈরি করেছি যার সাহায্যে যে পথ যেতে এক বছর সময় লাগবার কথা তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলে যাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণপুত্রের কথা শুনে হরিদাস খুশি হলেন, এবং পরদিন তাকে রথ নিয়ে আসতে বললেন। রাজার কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে হরিদাস দেশে ফেরার আয়োজন করল।

পরদিন যথাসময়ে ব্রাহ্মণপুত্র রথ নিয়ে উপস্থিত হলে উভয়ে সেই রথে চড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধারা নগরে গিয়ে উপস্থিত হলো।

এদিকে হরিদাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র, দুটি মহাগুণী পাত্র ঠিক করে তাদের কথা দিয়ে রেখেছিল যে হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এলেই মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে দেবে।

এবার যখন সেই দুই হবু বর জানতে পারল যে হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে তখন তারা হরিদাসের বাড়ি এসে উপস্থিত হলো।

তিন বর উপস্থিত হরিদাসের বাড়ি। হরিদাস সব শুনে খুবই বিপদে পড়লেন। মনে মনে চিন্তা করলেন, তিনজনই বিদ্যান ও অসাধারণ গুণের অধিকারী, এখন কাকে রেখে কাকে ত্যাগ করি।

কিন্তু ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস অতর্কিতে এসে মহাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেল।

সকালে খোঁজ করে দেখা গেল মহাদেবী ঘরে নেই। তখন সকলে পরামর্শ করতে বসলো। তিন ব্রাহ্মণপুত্রও ঘটনা শুনে তাদের কাছে উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে একজন সমাধিবলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত চোখের সামনে দেখতে পেত। সে বললো, আপনারা চিন্তিত হবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এক রাক্ষস আপনার কন্যাকে হরণ করে নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে রেখেছে। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় চিন্তা করুন।

দ্বিতীয় জন শুনে বললো, আমার এমন বিদ্যা জানা আছে যার সাহায্যে শব্দকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করতে পারি, কিন্তু সেখানে যাওয়ার কি উপায়?

তৃতীয় জন বললো, কোন চিন্তা নেই, আমার রথ আছে, এই রথে চড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হতে পারি।

তখন সময় নষ্ট না করে সেই রথে চড়ে তিন পাত্র বিন্ধ্যাচলে পৌঁছে রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে নিয়ে ফিরে এল।

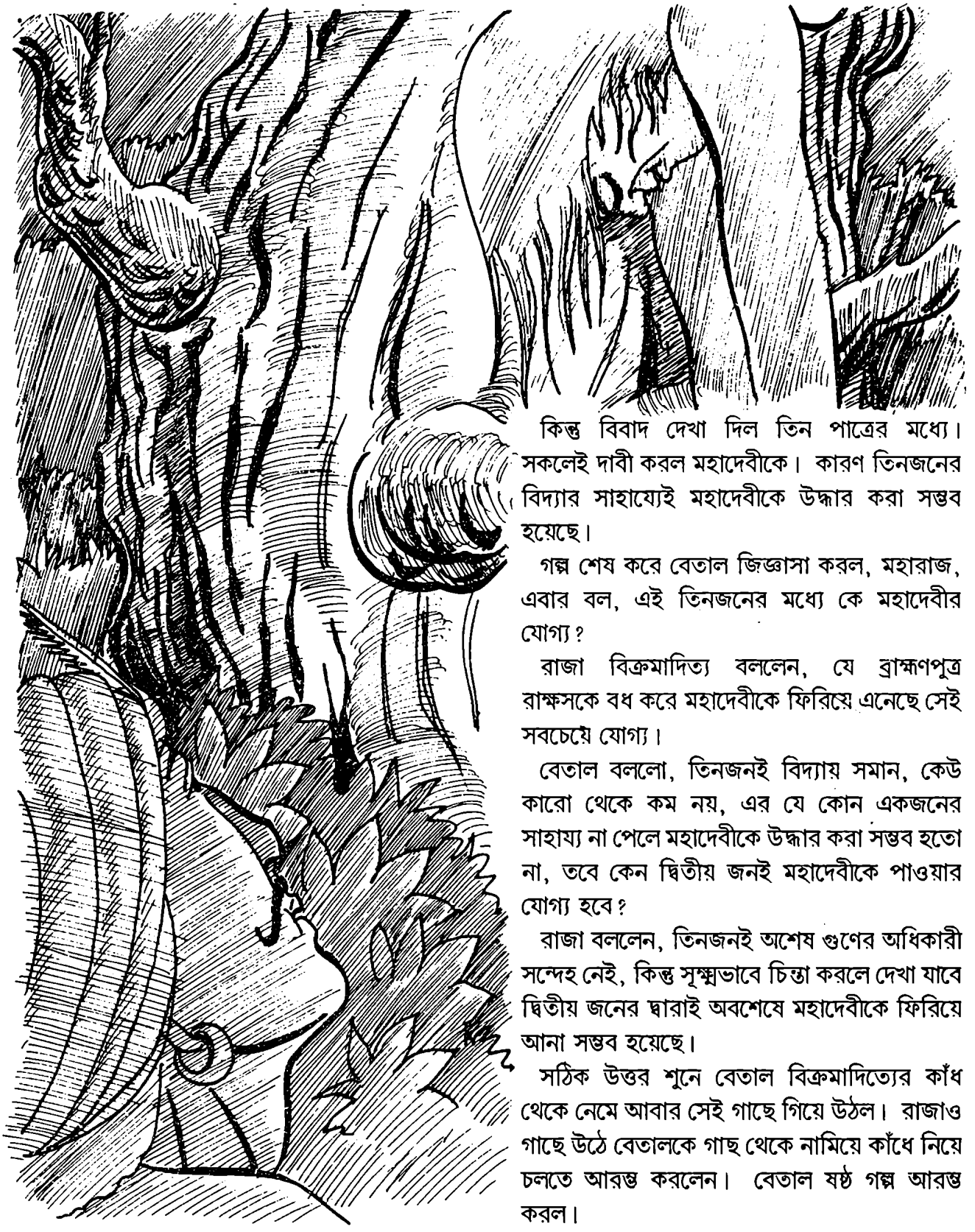

কিন্তু বিবাদ দেখা দিল তিন পাত্রের মধ্যে। সকলেই দাবী করল মহাদেবীকে। কারণ তিনজনের বিদ্যার সাহায্যেই মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, এবার বল, এই তিনজনের মধ্যে কে মহাদেবীর যোগ্য?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যে ব্রাহ্মণপুত্র রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে ফিরিয়ে এনেছে সেই সবচেয়ে যোগ্য।

বেতাল বললো, তিনজনই বিদ্যায় সমান, কেউ কারো থেকে কম নয়, এর যে কোন একজনের সাহায্য না পেলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হতো না, তবে কেন দ্বিতীয় জনই মহাদেবীকে পাওয়ার যোগ্য হবে?

রাজা বললেন, তিনজনই অশেষ গুণের অধিকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে দ্বিতীয় জনের দ্বারাই অবশেষে মহাদেবীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল বিক্রমাদিত্যের কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। রাজাও গাছে উঠে বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। বেতাল ষষ্ঠ গল্প আরম্ভ করল।

ষষ্ঠ গল্প

সেকালে ধর্মপুর নগরে ধর্মশীল নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার মনে বড় দুঃখ, তার কোন ছেলেপিলে নেই।

তাঁর মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন, মন্দির তৈরি করে দেবী দুর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন নিয়ম ও নিষ্ঠাসহ পূজার ব্যবস্থা করুন, এতে আপনার মঙ্গল হবে।

মন্ত্রীর পরামর্শ মত রাজা একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করিয়ে প্রতিদিন মহাধূমধামে দেবীর পূজা করতে লাগলেন।

ধর্মানুষ্ঠান ও দেবার্চনা করেও রাজার মনের ইচ্ছা কিন্তু পূর্ণ হলো না, অপুত্রক রাজার একটি পুত্রসন্তান লাভের বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি তা পেলেন না।

একদিন রাজা মন্দিরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে দেবীকে বলতে লাগলেন, দেবী, তুমি ত্রিলোকজননী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতারা তোমার আরাধনা করেন। তুমি সবার মনের ইচ্ছা পূরণ কর। আজ আমি তোমার ভক্ত তোমার স্মরণ নিয়েছি, আমার মনের একটি মাত্র ইচ্ছা পূরণ কর।

ভক্তের আকুল প্রার্থনা শুনে দেবী দেখা দিয়ে বললেন, আমি তোমার ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যা বর চাইবে তাই পাবে।

রাজা আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, যদি ভক্তের প্রতি কৃপা করতে চাও তবে এই বর দাও, আমি যেন অবিলম্বে পুত্রের মুখ দেখতে পাই।

দেবী বললেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি পুত্র লাভ করবে এবং সেই পুত্র শান্ত স্বভাব, সর্বগুণসম্পন্ন এবং সব বিষয়ে পারদর্শী হবে।

যথাসময়ে রাজা পুত্র লাভ করলে রাণী এবং পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেবীর পূজা দিলেন।

এই সময় দীনদাস নামে এক তাঁতীর ছেলে বন্ধুর সঙ্গে রাজধানীতে এসে তারই নিজ জাতির এক পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তাঁতীর ছেলে মনে মনে ভাবল, আমাদের রাজা দেবী দুর্গার কৃপায় বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র লাভ করেছেন। দেবীর কৃপা পেলে আমিও ঐ সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করতে পারি।

যা ভাবা তাই কাজ। দীনদাস মন্দিরে ঢুকে দেবীর কাছে ভক্তিচিত্তে প্রার্থনা করে বললো, দেবী, যদি তোমার কৃপায় আমি ঐ কন্যাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারি তবে নিজ হাতে আমার মাথা কেটে পূজা দেব। এই মানসিক করে দীনদাস বন্ধুর সঙ্গে ঘরে ফিরে এল।

কিছুদিন পর, ছেলের মনের কথা জানতে পেরে দীনদাসের বাবা ঐ কন্যার বাবার সাথে দেখা করে তাঁর মেয়ের সাথে দীনদাসের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন।

অল্পদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর দীনদাস আনন্দের সঙ্গে দিন কাটাতে লাগল। দেবীর কাছে শপথের কথা ভুলে গেল।

কিছুদিন পর বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এল দীনদাস। দেবী দুর্গার মন্দিরের কাছে উপস্থিত হলে সেই পূর্বের শপথের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, দেবীর কাছে আমার শপথের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। যে পাপ করেছি তার থেকে নিস্তার নেই। যা হোক, আর দেরী করা উচিত নয়, এখনই পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করে দেবীকে তুষ্ট করতে হবে।

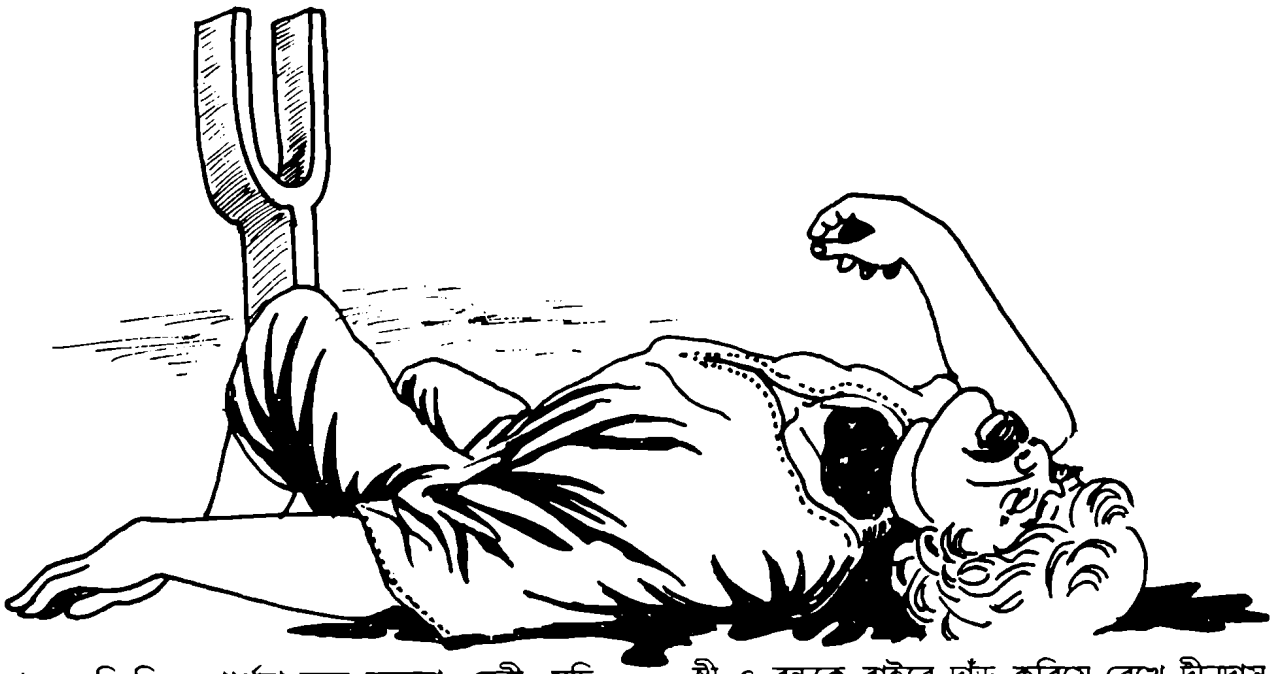

স্ত্রী ও বন্ধুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দীনদাস মন্দিরের ভিতরে ঢুকে প্রথমে ভক্তিসহকারে দেবীর পূজা করল তারপর মন্দিরের খড়্গ নিয়ে নিজ হাতে নিজের মাথা কেটে ফেললো।

দীনদাসের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে তার বন্ধু

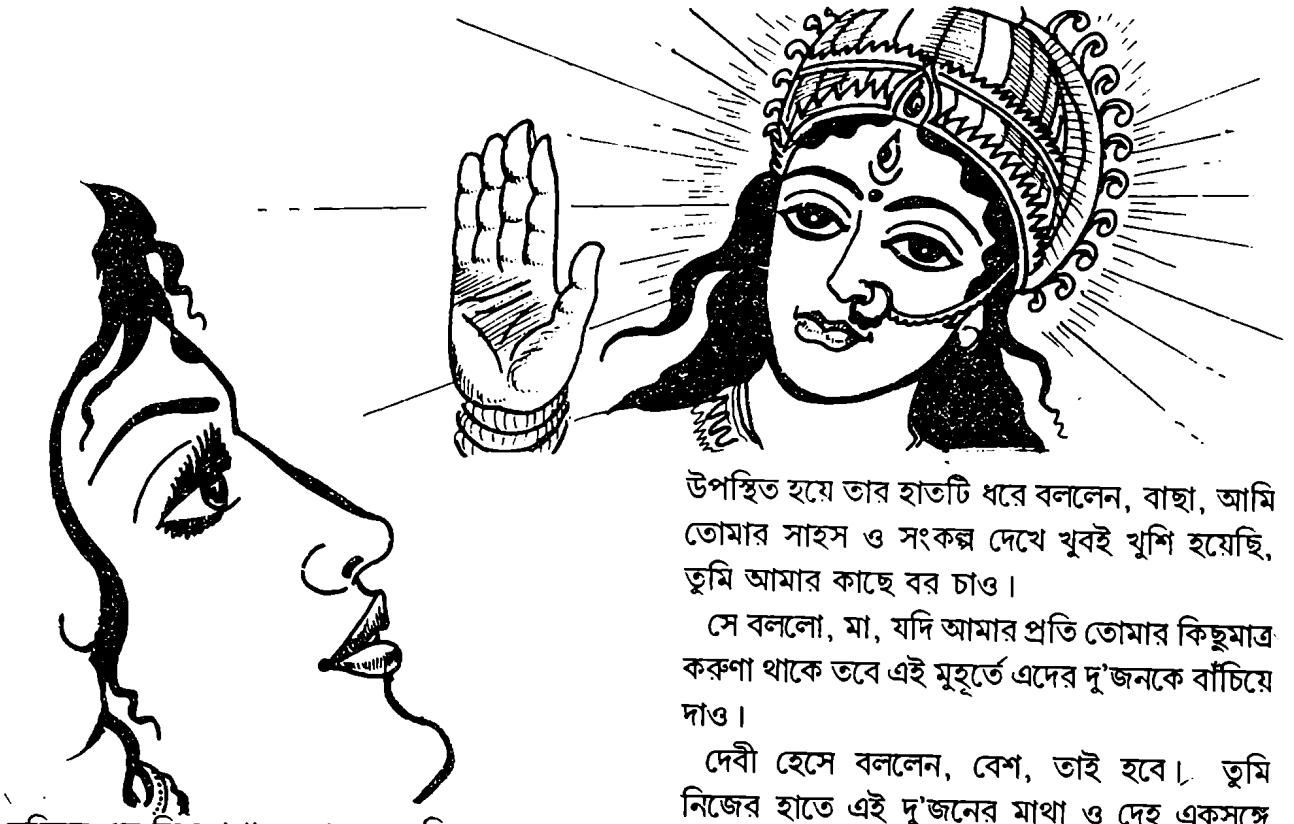

মন্দিরে এল কি ব্যাপার দেখতে। মন্দিরে ঢুকে বন্ধু যে দৃশ্য দেখল তাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে। পরে ভাবল—এখন উপায়! লোকে ভাববে বন্ধুর স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য আমিই এই কাজ করেছি। এমন অপবাদ শোনার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল। বন্ধুর পথকেই আমাকেও বেছে নিতে হবে। এই কথা চিন্তা করে সেও নিজের হাতে খড়্গ দিয়ে মাথা কেটে ফেলল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও দুই বন্ধু ফিরে আসছে না দেখে বিরক্ত হয়ে দীনদাসের স্ত্রী মন্দিরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখল তাতে তার বুদ্ধি লোপ পেল এবং কিছুক্ষণ মন্দিরের দরজা ধরে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। পরে মনে মনে চিন্তা করল,আগের জন্মে হয়তো অনেক পাপ করেছিলাম তাই এই দৃশ্য দেখতে হলো। আমারও মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই ভাল।

এই ভেবে সেই খড়্গ তুলে নিয়ে নিজের মাথাটি কেটে ফেলতে উদ্যত হতেই দেবী তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার হাতটি ধরে বললেন, বাছা, আমি তোমার সাহস ও সংকল্প দেখে খুবই খুশি হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর চাও।

সে বললো, মা, যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র করুণা থাকে তবে এই মুহূর্তে এদের দু'জনকে বাঁচিয়ে দাও।

দেবী হেসে বললেন, বেশ, তাই হবে। তুমি নিজের হাতে এই দু'জনের মাথা ও দেহ একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দাও। এই বলে দেবী সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

তাঁতীর মেয়েটি এই বর পেয়ে এতই আনন্দিত হলো যে তাড়াতাড়িতে একজনের মাথা অন্যজনের দেহে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠে বসলো।

এখানেই গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, এখন বেশ চিন্তা করে বল, এই দু'জনের মধ্যে কে ঐ মেয়েটির স্বামী হবে?

রাজা হেসে বললেন, খুবই কঠিন প্রশ্ন সন্দেহ নেই তবে নদীর মধ্যে গঙ্গা যেমন বড়, গাছের মধ্যে কল্পতরু, তেমনি প্রাণীর সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ। অতএব স্বামীর মাথাটি যে শরীরে জোড়া লাগানো হয়েছে সেই হবে মেয়েটির স্বামী।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজাকে ছেড়ে আবার গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজা বিক্রমাদিত্যও আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে পিঠে নিয়ে চলতে লাগলেন। বেতালও সপ্তম গল্প আরম্ভ করল।

সপ্তম গল্প

চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মেয়ের নাম ত্রিভুবনসুন্দরী। মেয়ের বিয়ের বয়স হলে রাজা মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ত্রিভুবনসুন্দরীর রূপ ও গুণের প্রশংসা চারদিকে প্রচার হলে নানা দেশের রাজারা সম্বন্ধের প্রস্তাব করে চিত্রকর দিয়ে নিজ নিজ ছবি আঁকিয়ে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু রাজকন্যার একজনকেও পছন্দ হলো না।

রাজা চন্দ্রাপীড় তখন অন্য উপায় না দেখে ঠিক করলেন, মেয়ের স্বয়ংবরের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মেয়ে তাতেও অমত প্রকাশ করল। সে বাবাকে বললো, ওসবের কোন প্রয়োজন নেই, বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি — এই তিনটি গুণের অধিকারী যিনি হবেন তাঁকেই আমি বিয়ে করব।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরদেশ থেকে চারজন যুবক রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। রাজা তাদের নিজ নিজ গুণের পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথমজন বললো, মহারাজ, ছোটবেলা থেকে বহু যত্ন ও পরিশ্রমে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছি আমি। তাছাড়া আমার একটি বিশেষ গুণ জানা আছে যার সাহায্যে প্রতিদিন একখানি কারুকার্য করা অপূর্ব কাপড় বুনে পাঁচটি রত্নের বদলে বিক্রি করি। একটি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিই, একটি দিই দেবতাকে, একটি আমি গয়না করে নিজের গায়ে পরি, আর একটি যত্ন করে রেখে দিই — আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে তার জন্য। আর শেষটি খরচ করে আমার বেশ

ভালোভাবেই চলে যায়। এমন গুণ আর কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয়জন বললো, আমি সমস্ত পশুপাখিদের ভাষা জানি। তাছাড়া আমার মত শক্তিশালী আর কেউ নেই।

তৃতীয়জন বললো, আমার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর একজনও নেই। এমন কোন শাস্ত্র নেই যা আমার জানা নেই।

চতুর্থজন বললো, আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর আমার একটি বিশেষ গুণ—আমি শব্দভেদী বাণ মারতে পারি। এমন গুণের অধিকারী আর কাউকে পাবেন না।

অবশেষে রাজা নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে ত্রিভুবনসুন্দরীর কাছে গিয়ে চারজন পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। সব শুনে ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো, কোন জবাব দিল না।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, তোমাকে যুক্তি দিয়ে বলতে হবে কে ত্রিভুবনসুন্দরীর স্বামী হবার যোগ্য?

রাজা বললেন, যে কাপড় তৈরি করে বিক্রি করে, সে তাঁতী। যে পশুপাখির ভাষা শিখেছে, সে বৈশ্য। যে শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছে, সে ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে শব্দভেদী বাণ মারতে শিখেছে সে রাজার স্বজাতীয়। শাস্ত্র

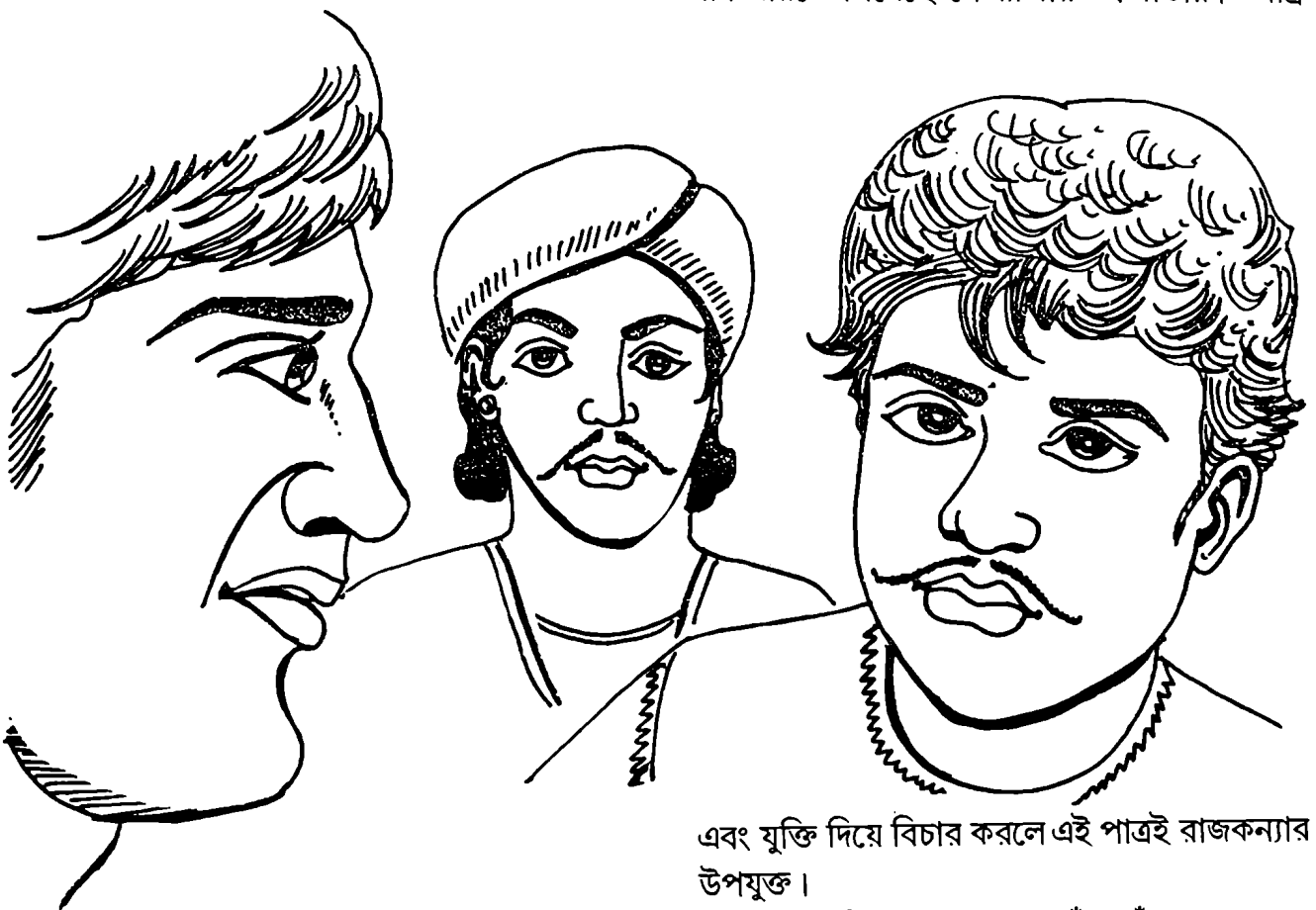

চারজনের গুণের কথা শুনে রাজা চন্দ্রাপীড় মনে মনে চিন্তা করলেন, পাত্র হিসাবে চারজনই তাঁর মেয়ের উপযুক্ত কিন্তু এদের মধ্যে সেই একজন কাকে নির্বাচন করি যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়।

এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই পাত্রই রাজকন্যার উপযুক্ত।

রাজার যুক্তি শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠলো, আর রাজাও নাছোড়বান্দা, তিনি তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে আবার চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও অষ্টম গল্প আরম্ভ করল।

অষ্টম গল্প

সেকালে মিথিলায় গুণাধীপ নামে এক রাজা ছিলেন।

চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত যুবক রাজার কাছে চাকরির আশায় মিথিলায় এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজা তখন অন্তঃপুরেই আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে চিরঞ্জীব রয়ে গেল কিন্তু রাজার দেখা পেল না।

এদিকে তার সব টাকাকড়ি ফুরিয়ে এল। চিরঞ্জীব মনে মনে ভাবতে লাগল, রাজা কতদিনে বাইরে আসবেন তার ঠিক নেই। এরপর ভিক্ষা করে খেতে হবে। কিন্তু ভিক্ষা করে খাবার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। রাজা ছাড়া অন্য কেই বা আমাকে চাকরি দেবে। কিন্তু রাজার উপর নির্ভর করে কতদিনই বা এখানে থাকা সম্ভব। তার চেয়ে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করা অনেক ভাল। এই ভেবে সে মিথিলা ত্যাগ করে বনে চলে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রাজা গুণাধিপের আমোদ-আহ্লাদের শখ মিটে যাওয়ায় অন্তঃপুর ত্যাগ করে আবার রাজকার্যে মন দিলেন।

এরপর একদিন দলবল সঙ্গে নিয়ে রাজা শিকার করতে ঐ বনে গেলেন। নানা স্থান ঘুরে একটা হরিণের পিছু ধাওয়া করে বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গীসাথীরা পেছনে পড়ে রইল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সারা দিন বনে বনে ঘুরে রাজা খিদেয় তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়লেন। শরীর আর বইছে না। অথচ কাছে কোথাও জলাশয় নেই। কিছুটা চলার পর বনের মধ্যে এক কুটির দেখে তিনি খুব খুশি হলেন, তাঁর আশা হলো নিশ্চয় ওখানে গেলে মানুষের দেখা পাওয়া যাবে।

কুটিরের সামনে গিয়ে দেখলেন একজন লোক

ধ্যান করছে। রাজা হাত জোড় করে তার কাছে জল চাইলেন। লোকটি আর কেউ নয়, সেই রাজপুত বীর চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব রাজাকে সাদরে বসতে দিয়ে জল ও ফলমূল এনে দিল খিদে মেটাবার জন্য। রাজা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেলেন।

তিনি চিরঞ্জীবকে বললেন, আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচালেন। আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। আপনার ব্যবহার দেখে আপনাকে তপস্বী মনে হলেও আপনার চেহারা এবং স্বভাব দেখে অন্যরকম মনে হয়। দয়া করে বলুন, কে আপনি? কেন এই গভীর বনে একা একা তপস্যায় দিন কাটাচ্ছেন?

চিরঞ্জীব রাজার অনুরোধ ফেলতে না পেরে সব খুলে বললো। শুনে রাজা বড়ই লজ্জা পেলেন। কিন্তু তখনই নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে সেই রাতটি সেখানে সেই কুটিরেই কাটালেন।

পরদিন সকালে রাজা নিজের পরিচয় দিয়ে চিরঞ্জীবকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। তিনি চিরঞ্জীবকে প্রিয়পাত্র হিসাবে নিজের কাছে রাখলেন। চিরঞ্জীব রাজার খুবই অনুগত ও বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

একবার রাজা বিশেষ দরকারে চিরঞ্জীবকে বিদেশে পাঠালেন। সে রাজার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে ফেরবার পথে সমুদ্রের ধারে একটি অপূর্ব মন্দির দেখে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলো। দেবীকে প্রণাম করে ফেরার মুখে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে চিরঞ্জীব মুগ্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, হে বীর, তোমার এখানে আসার কারণ কি?

উত্তরে চিরঞ্জীব তাকে সমস্ত ঘটনা বললো।

মেয়েটি বললো, তুমি এই সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব।

চিরঞ্জীব মেয়েটির কথামত ডুব দিল। উঠেই দেখে —আশ্চর্য! কোথায় মন্দির আর কোথায় সেই সুন্দরী! সে যে নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যাই হোক, সে ভিজে কাপড় ছেড়ে রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বললো।

এই অলৌকিক গল্প শুনে রাজার নিজের চোখে দেখার খুব ইচ্ছা হলো।

যথাসময়ে দু'জনে সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই মন্দিরে প্রবেশ করে দেবীকে ভক্তিসহকারে পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সেই একই দৃশ্য

দেখলেন।

রাজা গুণাধিপ সুপুরুষ ছিলেন। সেই মেয়েটি রাজাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে এসে বললো, মহারাজ, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার কথা শোন তবে আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে কর।

এই কথা শুনে মেয়েটি বললো, মহারাজ, আমি আপনার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়েছি, অন্যকে বিয়ে করব কি করে?

রাজা বললেন, তুমি কথা দিয়েছ, আমার আদেশ মেনে চলবে।

তখন মেয়েটি রাজি হলো এবং রাজা তাদের গন্ধর্ব মতে বিয়ে দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, রাজা আর চিরঞ্জীব—এদের মধ্যে কে বেশী মহত্ব আর উদারতার পরিচয় দিয়েছে?

বিক্রমাদিত্য বললেন, চিরঞ্জীবই বেশী মহত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বেতাল বললো, কিভাবে বল?

বিক্রমাদিত্য বললেন, যদিও রাজা গুণাধিপ শেষের দিকে চিরঞ্জীবের উপকার করেছেন কিন্তু চিরঞ্জীব সেই শিকারের দিনে তাঁকে জল, আহার ও আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছিল তার তুলনা হয় না।

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার চলে গেল গাছে ঝুলতে, রাজা বিক্রমাদিত্যও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে চললেন। বেতালও নবম গল্প আরম্ভ করল।

নবম গল্প

সেকালে মগধপুর নামক এক রাজ্যের রাজার নাম ছিল বীরবর। বীরবরের অনেক প্রজার মধ্যে হিরণ্যদত্ত নামে এক ঐশ্বর্যশালী বণিক ছিলেন। ঐ বণিকের মদনসেনা নামে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল।

বসন্ত উৎসবের দিনে মদনসেনা সুন্দর সাজে সেজে তার সখীদের সঙ্গে মনের আনন্দে উপবনে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় ধর্মদত্ত বণিকের ছেলে সোমদত্তও বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে সেখানে উপস্থিত হয়। সে দূর থেকে পরমাসুন্দরী মদনসেনাকে দেখে মুগ্ধ হলো। তার খুব ইচ্ছা তাকে বিয়ে করার।

সোমদত্ত মদনসেনার কাছে গিয়ে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

মদনসেনা বললো, পাঁচদিন পর আমার বিয়ে। তবে কথা দিলাম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

নির্দিষ্ট দিনে মদনসেনার বিয়ে হলো। রাতে আত্মীয়েরা চলে গেলে মদনসেনা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে খাটের একপাশে চুপ করে বসে রইল। তারপর স্বামীকে সোমদত্তর ঘটনা খুলে বললো।

একথা শুনে মদনসেনার স্বামী প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মত দিল। বললো, না যেয়ে যখন ছাড়বে না, তখন যাও। কথা যখন দিয়েছ তখন তা রাখাই উচিত।

মদনসেনা স্বামীর অনুমতি পেয়ে সেই মাঝরাত্রেই বিয়ের এক-গা-গয়না পরে সমস্ত গা কাপড়ে ঢেকে সোমদত্তর বাড়ির পথে চলল।

এক চোর তার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার কি ভয়-ডর নেই? এক-গা-গয়না পরে একা এই অন্ধকার রাতে পথে বেরিয়েছ? এখনই গয়নাগুলো খুলে আমাকে দাও।

মদনসেনা ভয় পেয়েছে কিন্তু সে ভাব বাইরে প্রকাশ না করে বললো, বণিক হিরণ্যদত্তের মেয়ে আমি। স্বামীর অনুমতি নিয়ে সোমদত্তের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ি যাচ্ছি প্রতিজ্ঞা পালন করতে। ভাই, এই সব গয়না আমি তোমাকেই দেব প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি ফিরে আসি তারপর।

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করে চোর তাকে ছেড়ে দিয়ে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় সেখানে বসে রইল।

মদনসেনা সোমদত্তের বাড়ি গিয়ে দেখে সে ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগিয়ে দিতেই সোমদত্ত এই গভীর রাতে তার ঘরে মদনসেনাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এত রাতে কি ভাবে এলে?

মদনসেনা মৃদু হেসে বললো, তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম সেই কথা রাখতেই আমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে এসেছি।

সোমদত্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, তুমি যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এতখানি কষ্ট স্বীকার করেছ এ জন্য আমি খুবই খুশি। সব জেনেও তোমার স্বামী

যে আসতে দিয়েছে এতে তার মহত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি নিরাপদে ফিরে যাও।

ফিরবার পথে মদনসেনার সাথে চোরের দেখা হলো। চোর জিজ্ঞাসা করল এত তাড়াতাড়ি সে ফিরল কি ভাবে। সব শুনে চোর বললো, আমি আর তোমার গয়না নেব না। তোমার মত ভাল মেয়ের জিনিস নিলে আমার খুব পাপ হবে। তুমি নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে যাও।

মদনসেনার স্বামী কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি তার এই ব্যবহারে। তাই মদনসেনা তার স্বামীর কাছে ফিরে এলে স্বামী আর আগের মত তার সঙ্গে কোন কথা না বলে চুপ করে শুয়ে রইল।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, তোমাকে বলতে হবে এই চারজনের মধ্যে কে সবচেয়ে হৃদয়বান এবং ভালমানুষ?

রাজা বললেন, চোরকেই আমি ভালমানুষ বলব।

বেতাল বললো, কেন মহারাজ?

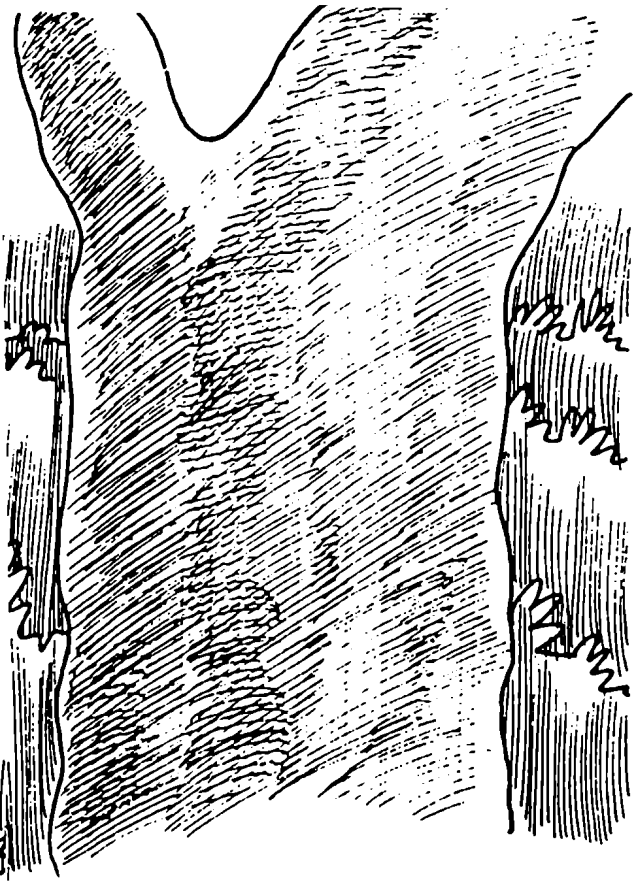

রাজা বললেন, কারণ মদনসেনার স্বামী খুশি মনে তাকে অনুমতি দেন নি, পরে খুব বিরক্তি দেখিয়েছিলেন। সোমদত্তের উচিত হয় নি অতরাত্রে মদনসেনাকে একা যেতে দেওয়া, মদনসেনা যদিও কথা রাখতে বেরিয়েছিল কিন্তু অত গয়না পরে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে ওভাবে বেরিয়ে যাওয়া তার উচিত হয় নি। কিন্তু চোরের কাজ সুযোগ পেলেই চুরি করা। সেই গভীর রাতে মদনসেনাকে একা পেয়ে সে তার অলঙ্কার অনায়াসেই নিতে পারত, কিন্তু সে শ্রদ্ধা দেখিয়ে এবং তাকে বিশ্বাস করে কিছুই করে নি। এমন উদারতা সামান্য একজন চোরের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার শ্মশানে গিয়ে সেই গাছে ঝুলে রইল আর বিক্রমাদিত্যও তাঁর যা কাজ তাই করলেন। বেতালও দশম গল্প আরম্ভ করল।

দশম গল্প

গৌর দেশে বর্ধমান নামে এক নগর ছিল। সেখানে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর নাম অভয়চন্দ্র। এই মন্ত্রী বৌদ্ধ ছিলেন। মন্ত্রীর মুখ থেকে বৌদ্ধের বাণী শুনে শুনে রাজাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেই রাজা পূজা এবং হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সকল কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করে দিলেন—আমার রাজ্যমধ্যে ঐসব কাজ করা চলবে না। কেউ ওসব করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

প্রজারা এতদিনের অনুষ্ঠান মন থেকে ত্যাগ করতে না চাইলেও শাস্তির ভয়ে ত্যাগ করল। যে সব প্রজা লুকিয়ে লুকিয়ে দেব-দেবীর পূজা করল তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো।

অভয়চন্দ্র রাজাকে বলতেন, মহারাজ, ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা হলো অহিংসা পরমধর্ম। সব ধর্মের উপরে অহিংসা ধর্ম। হাতির মত বিরাট দেহধারী প্রাণী থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র পোকামাকড় সকল প্রাণেরই সমান মূল্য, তাই তাকে বিনাশ করা মহাপাপ। প্রতিটি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করা মহৎ কাজ। পরের মাংস খেয়ে যারা নিজেদের দেহের মাংস বৃদ্ধি করে তাদের মত পাপী এ জগতে আর নেই। যারা এই

কাজ করে তারা মৃত্যুর পর নরকে যায়। মাংসের ন্যায় মদ খাওয়াও মহা পাপ। মদ এবং মাংস ত্যাগ করলে আয়ু , বিদ্যা, বল, ধন সবকিছু বাড়বে।

এইভাবে উপদেশ দিয়ে অভয়চন্দ্র রাজাকে এমনভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করলেন যে কোন লোক তার কাছে বৌদ্ধধর্মের গুণগান করলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করতেন এবং সে রাজার প্রিয়পাত্র হতো।

তারপর একদিন রাজার মৃত্যু হলো। তাঁর ছেলে ধর্মধ্বজ কিন্তু ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাবান। তিনি রাজা হয়েই বৌদ্ধদের শাস্তি দিতে লাগলেন। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রকে কঠোর শাস্তি দিলেন। তাঁর মাথা মুড়িয়ে, গাধায় চাপিয়ে সমস্ত নগর ঘুরিয়ে রাজ্যের বাইরে বের করে দিলেন। প্রজারা এতদিনে তাদের সনাতন হিন্দুধর্ম ফিরে পেল।

বসন্তোৎসবের দিন রাজা ধর্মধ্বজ তাঁর তিন রাণীকে নিয়ে উপবনে বেড়াতে গেলেন। সেই উপবনে সুন্দর একটি সরোবর ছিল। সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটে ছিল। রাজা নিজে সরোবরে নেমে পদ্মফুল তুলে এনে রাণীদের দিলেন কিন্তু একটি ফুল এক রাণীর পায়ের উপর পড়ে গেলে তিনি এমন আঘাত পেলেন যে তাঁর পা ভেঙ্গে গেল। রাণী বেদনায় কেঁদে উঠলেন। রাজা নানাভাবে তাঁর ব্যথা দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠেছে। উপবন জ্যোৎস্নায় থৈ থৈ করছে। চাঁদের আলো লেগে দ্বিতীয় রাণীর গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। তিনিও ব্যথায় ছটফট করতে লাগলেন।

সেই সময় কোন গৃহস্থের বাড়িতে হামাল দিস্তার শব্দে তৃতীয় রাণী মূর্চ্ছা গেলেন। এইসব দেখে রাজা সেখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন।

এই অদ্ভুত গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, তোমাকে বলতে হবে এই তিন রাণীর মধ্যে কার শরীর সবচেয়ে কোমল?

রাজা বললেন, এর উত্তর খুবই সহজ। চাঁদের আলো গায়ে লাগলে যাঁর ফোসকা পড়ে, আমার মতে তাঁর শরীরই সবচেয়ে কোমল।

বেতাল রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করে তাড়াতাড়ি আবার শিরীষ গাছে গিয়ে উঠে পড়ল। রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও একাদশ গল্প আরম্ভ করল।

একাদশ গল্প

পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। দান ও সৎ কাজেই তাঁর দিন কাটত।

তিনি একদিন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশকে ডেকে বললেন, দেখ, ভেবে দেখলাম রাজা হয়েও যদি কেবল পরের জন্যই খেটে মরি তবে রাজা হয়ে লাভ কি? আমার সব রকম ভোগ সুখ করবার ক্ষমতা আছে। এই পৃথিবীতে এসে আমোদ আহ্লাদই যদি না করলাম তবে আর রাজা হওয়া কেন? তাই আমি ঠিক করেছি এখন থেকে শুধু ফূর্তি করব আর আমার সব কাজ করবে তুমি।

মন্ত্রী খুবই চিন্তায় পড়লেন ঃ আমার পক্ষে কি রাজকার্য পরিচালনা করা সম্ভব! রাজার যে বিচার-বুদ্ধি ও ধৈর্য আছে তা কি আমার আছে!

যাই হোক, একান্ত বাধ্য হয়েই তিনি রাজকার্য চালাতে লাগলেন কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

একদিন বাড়িতে বসে তিনি একমনে এই সবই চিন্তা করছিলেন। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী বললেন, তোমার কি হয়েছে বল তো! সব সময় দেখি এক মনে কি যেন ভাবছ। আগে তো তুমি এমন ছিলে না?

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ তখন বললেন, তুমি তো জান, রাজা সব রাজকার্যের ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন, রাজ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই দেখছেন না। কিন্তু আমার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

স্ত্রী বললেন, দেখ, রাজকার্য চালানো তোমার কম্ম নয়। বরং এক কাজ কর, এসব ছেড়ে কিছুদিন তীর্থে ঘুরে এস, শরীর মন দুই-ই ভাল হবে।

সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর কথামত রাজার অনুমতি নিয়ে তীর্থ করতে বেরলেন। অনেক দেশ ঘুরে দক্ষিণে রামেশ্বরে পৌঁছলেন। সেখানে রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে ভক্তিভরে পূজা নিবেদন করে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিশাল এক সোনার গাছ বেরল আর সেই গাছের মাথায় সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে বীণা বাজিয়ে গান করছেন। সত্যপ্রকাশ তন্ময় হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন। পরে সেই গাছটা আস্তে আস্তে জলের নীচে তলিয়ে গেল।

এই দেখে তিনি আর থাকতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে রাজার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা বললেন।

রাজা সত্যপ্রকাশকে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি আর দেরী না করে সত্যপ্রকাশের হাতে রাজ্যভার দিয়ে রামেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের কাছে যা যা শুনেছিলেন সবই দেখলেন। তবে রাজা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি নৌকোয় করে সেখানে গিয়ে সেই সোনার গাছে উঠে বসলেন এবং গাছটি রাজাকে নিয়ে তখনই পাতালে চলে গেল।

পাতালে গিয়ে সেই সুন্দরী রাজার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বীরত্ব ও সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তুমি এখানে কেন এসেছ? আর তোমার পরিচয়ই বা কি?

রাজা বললেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা—বল্লভ। তোমার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে আমি এখানে এসেছি।

মেয়েটি বললেন, তোমাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তোমার রাণী হতে পারি তবে একটি সর্তে, অমাবস্যার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

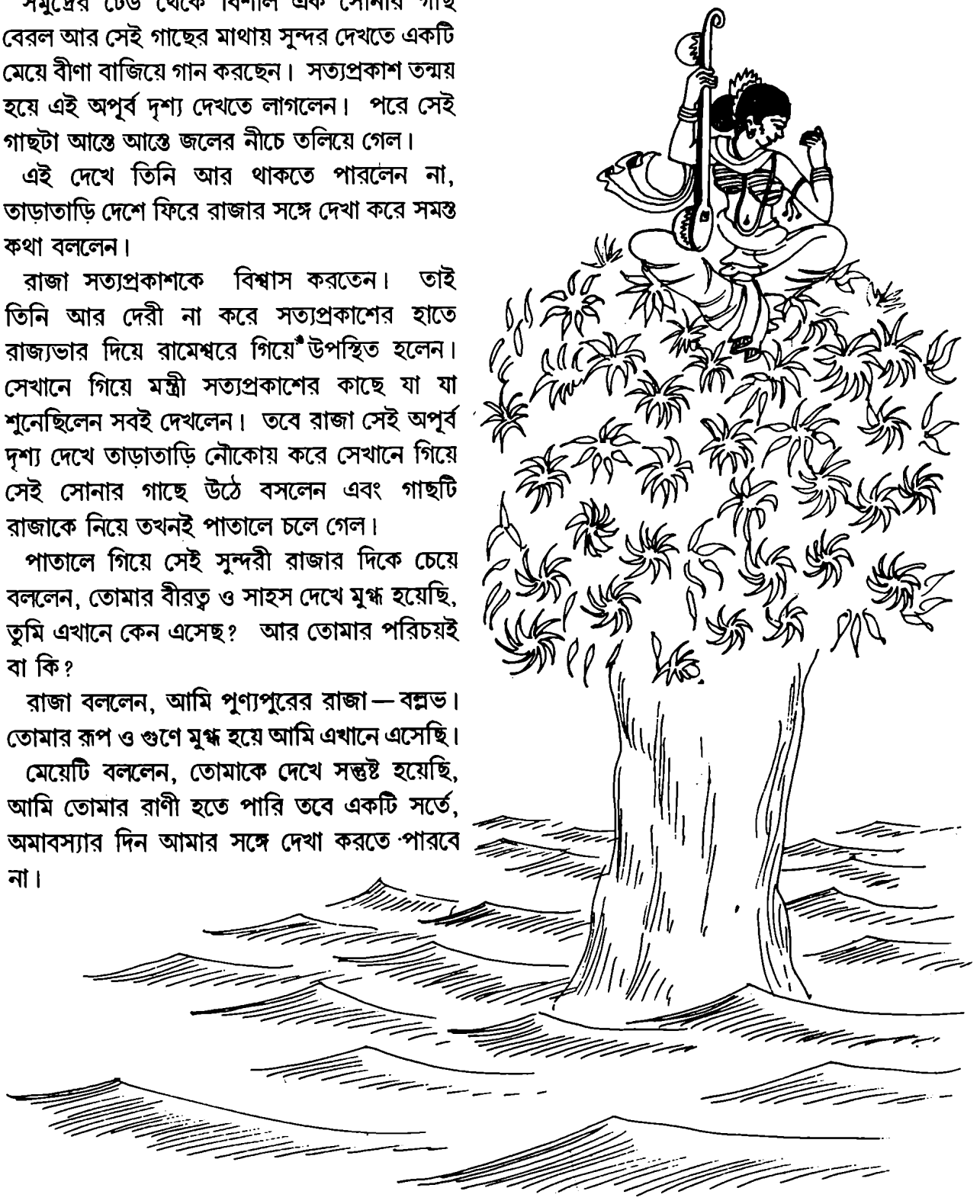

রাজা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেন। তখন গন্ধর্বমতে দু'জনের বিয়ে হলো। দু'জনে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর অমাবস্যা এল। রাজা অন্দরমহল থেকে চলে গেলেন। কিন্তু এর কারণ জানবার জন্য বিশেষ কৌতূহলী হয়ে অন্ধকার রাত্রে হাতে তরবারি নিয়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখতে লাগলেন।

তিনি দেখলেন ঠিক মাঝরাতে একটা রাক্ষস এসে রাণীকে ধরতে গেল। রাজা আর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে রাক্ষসের সামনে উপস্থিত হয়ে হাতের তরবারি দিয়ে রাক্ষসের মাথা কেটে ফেললেন।

রাজা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি এতদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করেছ? আর তোমার প্রকৃত পরিচয়ই বা কি?

রাণী তখন বললেন, শোন তবে আমার সেই দুঃখের কথা। আমি গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের মেয়ে, নাম রত্নমঞ্জরী। আমি বাবার আদরের মেয়ে ছিলাম। বাবা যখন খেতে বসতেন আমি কাছে না থাকলে তাঁর খাওয়া হতো না। একদিন সখীদের সঙ্গে খেলায় এতই মেতে ছিলাম যে কখন বাবার খাওয়ার সময় হয়েছে তা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। এতে বাবা আমার উপর এতই রেগে গেলেন যে আমাকে অভিশাপ দিলেন ঃ আজ থেকে তোর

বাসস্থান হবে পাতালে আর প্রতি অমাবস্যাতে এক রাক্ষস এসে তোকে নানাভাবে কষ্ট দেবে।

এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ শুনে আমি কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বললাম, বাবা, সামান্য ভুলের জন্য আমায় এমন কঠোর শাস্তি দিও না।

রাণীর তখন আনন্দে চোখে জল এসে গেছে। জলভরা চোখে বললেন, তুমি আমাকে বাঁচালে। এতদিন কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

বাবা আমার কাতর আবেদনে সাড়া দিলেন এবং নিজেও বুঝলেন তাঁর স্নেহের কন্যার প্রতি কি অবিচার করেছেন। বললেন, তবে জেনে রাখ, মহাবলশালী এক রাজা যেদিন ঐ রাক্ষসকে বধ করবেন সেই দিন তুমি শাপমুক্ত হবে। আজ আমি শাপমুক্ত হলাম। এখন তোমার অনুমতি পেলে বাবার কাছে ফিরে যাই।

রাজা বললেন, আগে আমার রাজধানীতে চল, পরে তোমার বাবার কাছে যাবে।

রত্নমঞ্জরী রাজী হলেন এবং রাজা তাঁকে নিয়ে রাজধানীতে গিয়ে বেশ কিছুদিন কাটাবার পর রাণীকে তাঁর বাবার কাছে যেতে অনুমতি দিলেন।

তখন রত্নমঞ্জরী বললেন, মহারাজ, দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে বাস করে আমার গন্ধর্বত্ব চলে গেছে, আমি এখন মানুষের মত হয়ে গেছি। আমার বাবা গন্ধর্বদের রাজা। আমার মনে হয় আমি আর বাবার কাছে ফিরে গিয়ে সেই স্নেহ-ভালবাসা পাব না; তাই আমার ইচ্ছা আমি এখানেই থেকে যাই।

রাজা এই কথা শুনে খুবই খুশি হলেন, তিনিও চাইছিলেন না রাণী তার বাবার কাছে ফিরে যাক। মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি আবার আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতে লাগলেন।

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ এই সব দেখে শুনে মনের দুঃখে মারা গেলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, বল মহারাজ, মন্ত্রী মরলো কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা আবার আনন্দসাগরে ডুবে যাওয়ায় মনের দুঃখে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ মারা গেলেন। তিনি দেখলেন প্রজারা রাজা হারা হয়ে অনাথ হলো। প্রজাদের সুখ সুবিধা দেখার আর কেউ রইল না। রাজ্যে কোন অঘটন ঘটলে সব দোষ পড়বে মন্ত্রীর উপর। এভাবে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।

মনের মত উত্তর পেয়ে বেতাল আবার সেই গাছে গিয়ে ঝুলে রইলো আর রাজা বিক্রমাদিত্যও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন। বেতালও দ্বাদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

দ্বাদশ গল্প

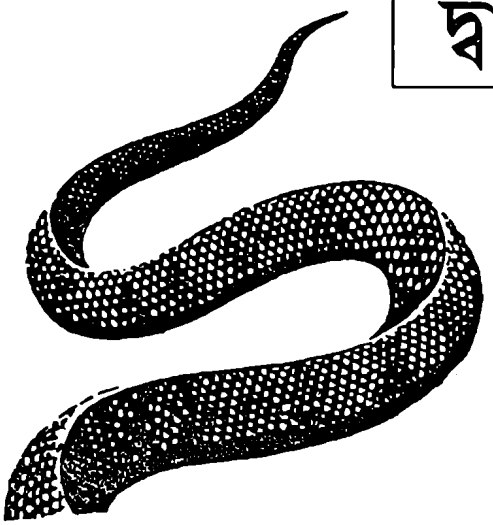

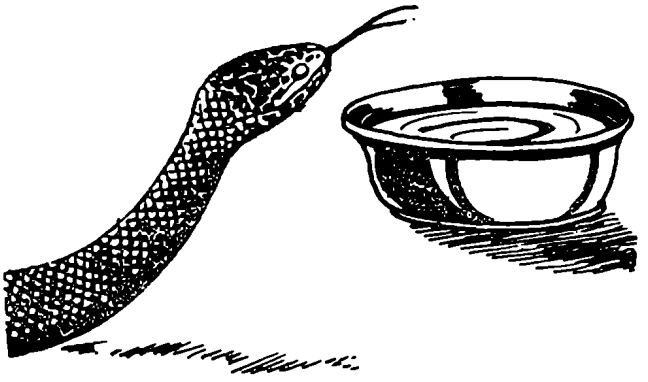

সেকালে চূড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। রূপে গুণে তিনি ছিলেন অসাধারণ আর তাঁর ধনসম্পত্তিও ছিল প্রচুর। স্ত্রী লাবণ্যবতীও সবদিক দিয়েই তাঁর উপযুক্ত ছিলেন। সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা।

একদিন দারুণ গ্রীষ্মের রাতে ঘরের মধ্যে টিকতে না পেরে তাঁরা ছাদে বিছানা করে ঘুমাচ্ছিলেন। সেই সময় এক গন্ধর্ব রথে করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুন্দরী লাবণ্যবতীকে দেখে সেই গন্ধর্ব তাঁকে রথে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেবস্বামীর ঘুম ভাঙলে পাশে স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িময় অনেক খুঁজেও লাবণ্যবতীকে না পেয়ে মনের দুঃখে সে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হতেই চারদিক ভাল করে খুঁজলেন কিন্তু স্ত্রীকে না পেয়ে পাগলের মত হয়ে গেলেন। তারপর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন।

একদিন দুপুরবেলা তিনি এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। কাছেই এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে বললেন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি, আমাকে জল ও আহার দিয়ে প্রাণ বাঁচান।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে এক বাটি দুধ এনে তাঁকে দিলেন।

এদিকে কিছুক্ষণ আগেই এক বিষধর সাপ দুধে মুখ দেওয়ায় ঐ দুধ বিষাক্ত হয়ে ছিল। দেবস্বামী ঐ দুধ খাওয়ামাত্র বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন, আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করি নি, তবে কেন আমাকে বিষ খাইয়ে মারলেন? এই বলে ব্রাহ্মণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা গেলেন।

ব্রাহ্মণ এই ঘটনায় খুবই দুঃখ পেলেন এবং বাড়ির মধ্যে গিয়ে নির্দোষ স্ত্রীকে অনেক গালাগালি করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, এদের মধ্যে কে দোষী?

রাজা বললেন, সাপের মুখে বিষ থাকে এবং সে তার স্বভাবকর্মই করেছে, এতে তাকে দায়ী করা যায় না। ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীও সেই দুধ যে বিষাক্ত তা জানতেন না, সেই কারণে তাঁরাও দায়ী হতে পারেন না। অতিথি ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের পক্ষেও সরল বিশ্বাসে তা পান করা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে দোষী যদি কেউ হন তবে ঐ ব্রাহ্মণ। যিনি সবকিছু না জেনেই নিজের স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও তাঁর যা কাজ তাই করলেন। বেতালও তার ত্রয়োদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

ত্রয়োদশ গল্প

চন্দ্রহৃদয় নগরে রাজা রণধীর নামে এক প্রতাপশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর মত সৎ ও দয়ালু রাজা খুব কমই দেখা যায়। তাঁর রাজ্যের প্রজারা সুখেই দিন কাটাতো। কিন্তু হঠাৎ চোরের উপদ্রব শুরু হলো। তখন প্রজারা রাজার কাছে গিয়ে নিজের নিজের দুঃখের কথা বললো।

রাজা সব কথা শুনে বললেন, আর যাতে চুরি না হয় তার জন্য আমি সব ব্যবস্থা করছি।

তিনি প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। নগরের বিভিন্ন স্থানে তাদের নিযুক্ত করে জানিয়ে দিলেন, চোর চুরি করে যদি পালিয়ে যায় তবে সেই অঞ্চলে নিযুক্ত প্রহরীর প্রাণদণ্ড হবে।

প্রহরীরা এই কঠোর শাস্তির কথা শুনে খুবই সতর্ক হলো কিন্তু চুরি না কমে বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

রাজা ঠিক করলেন চোর ধরার জন্য তিনি নিজে রাত্রে বের হবেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরের পর রাজা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নগর প্রহরায় বের হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন অপরিচিত লোককে দেখে তিনি বললেন, তোমার পরিচয় কি বল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?

লোকটি বললো, এত রাতে যখন বের হয়েছি তখন বুঝতেই পারছ আমি চোর। চুরি করাই আমার কাজ। তা তুমি কে হে বাপু? তোমার পরিচয়টা এবার দাও।

রাজা বললেন, বুঝতে পারছ না আমি কে? আমিও তোমারই মত একজন চোর।

তখন চোর খুশি হয়ে বললো, তবে চল একসঙ্গেই চুরি করতে যাই।

রাজা চোরের কথায় রাজি হলেন।

সেইদিনই দু'জনে এক ধনীর বাড়িতে ঢুকে অনেক টাকাকড়ি চুরি করল। তারপর নগর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে এক সুড়ঙ্গপথের সামনে এসে দাঁড়াল। চোর রাজাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

এই সময় এক দাসী এসে কথায় কথায় রাজার পরিচয় পেয়ে বললো, মহারাজ, যদি প্রাণে বাঁচতে চান তবে এখনই এখান থেকে চলে যান, এই চোর এক দুর্দান্ত দস্যু। খুব খারাপ লোক।

রাজা এই কথা শুনে বললেন, আমি তো বাইরে যাবার পথ চিনি না, যদি তুমি আমাকে দয়া করে পথটা দেখিয়ে দাও তবে বড় উপকার হয়।

তখন সেই দাসীর সাহায্যে রাজা প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন রাজা রণধীর অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেই পাতালে প্রবেশ করে চোরের বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন।

এক রাক্ষস এই পাতাল নগরীকে রক্ষা করতো।

চোর বিপদ বুঝে সেই রাক্ষসের শরণাপন্ন হয়ে জানাল, এই বিপদে যদি আমাকে সাহায্য না কর তবে আমায় এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে।

এই কথা বলে চোর রাক্ষসকে অনেক মূল্যবান উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করলো।

রাক্ষস খুশি হয়ে বললো, তোমার কোন ভয় নেই, এখনই আমি রাজার সব সৈন্য-সামন্ত খেয়ে শেষ করছি।

এই বলে রাক্ষস সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজার সৈন্য-সামন্ত, হাতি, ঘোড়া সব খেতে লাগল। এই অবস্থা দেখে সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

তাই দেখে রাজাও পালাতে আরম্ভ করলেন। রাক্ষসের সহায়তায় সাহসী হয়ে চোর রাজার পিছু ধাওয়া করল। রাজার কাছে এসে চোর রাজাকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, রাজা হয়ে যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মত পালাচ্ছিস?

রাজা এই অপমানজনক কথা সহ্য করতে না পেরে প্রাণভয় তুচ্ছ করে চোরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ চললো দু'জনের মধ্যে। অবশেষ রাজা চোরকে পরাজিত করে তাকে প্রাণে না মেরে বেঁধে নিয়ে এলেন রাজধানীতে।

বিচার করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন রাজা। চোরকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ঘোরাতে লাগল প্রজারা।

কিন্তু ধর্মধ্বজ বণিকের কন্যা শোভনার ঐ চোরকে দেখে খুব ভাল লাগল। সে গিয়ে তার বাবাকে জানাল, যেমন করে হোক ঐ চোরকে মুক্ত করে আমার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

বণিক বললো, এ প্রস্তাবে রাজা কিছুতেই রাজি হবেন না। কারণ এই চোরকে ধরার জন্য রাজার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, এমন কি রাজার প্রাণও চলে যেতে পারত।

শোভনা বললো, যদি ওকে ছাড়িয়ে আনতে না পার তবে তোমার সামনে আমি আত্মঘাতি হব।

একান্ত নিরুপায় হয়ে ধর্মধ্বজ রাজার কাছে আবেদন করল, মহারাজ, আমার একান্ত অনুরোধ, আমার সব সম্পত্তি নিয়ে ঐ চোরকে মুক্ত করে দিন।

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে রাজা বললেন, এই চোর আমার প্রজাদের অনেক ক্ষতি করেছে, আমারও প্রাণ নিতে চেষ্টা করেছে। আমি কিছুতেই একে ছেড়ে দেব না।

যথাসময়ে চোরকে শূলস্তম্ভের কাছে এনে দাঁড় করানো হলো। ইতিমধ্যে শোভনার বিষয় নগর মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে। চোরও সব শুনে প্রথমে হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। এই সময় রাজপুরুষরা তাকে শূলে চড়িয়ে দিলেন।

শোভনা চোরের মৃত্যুসংবাদ শুনে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে চিতা সাজিয়ে চোরের মৃতদেহের সাথে আত্মাহুতি দিতে গেল।

এই চিতার পাশেই দেবী কাত্যায়নীর মন্দির ছিল। শোভনার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে দেবী দেখা দিয়ে বললেন, তোমার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়েছি, বর চাও।

শোভনা বললো, দেবী, যদি আমায় কৃপা কর তবে এই চোরকে বাঁচিয়ে দাও।

দেবী তাই করলেন। অমৃত পান করিয়ে চোরকে বাঁচিয়ে দিলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, চোর কেন প্রথমে হেসেছিল এবং পরে কেঁদেছিল?

বিক্রমাদিত্য বললেন, হেসেছিল কারণ তার মনে হয়েছিল আমি যখন মরতে যাচ্ছি তখন এই মেয়েটি আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। তারপর কেঁদেছিল কারণ চোর ভাবল আমার জন্য এই মেয়েটি তার সর্বস্ব দিতে চেয়েছিল অথচ আমি তার জন্য কিছুই করতে পারতাম না, এমনই হতভাগ্য আমি।

আবার ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানের সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল আর রাজাও তাকে তখনই নামিয়ে কাঁধে নিয়ে আবার রওনা হলেন। বেতালও চতুর্দশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

চতুর্দশ গল্প

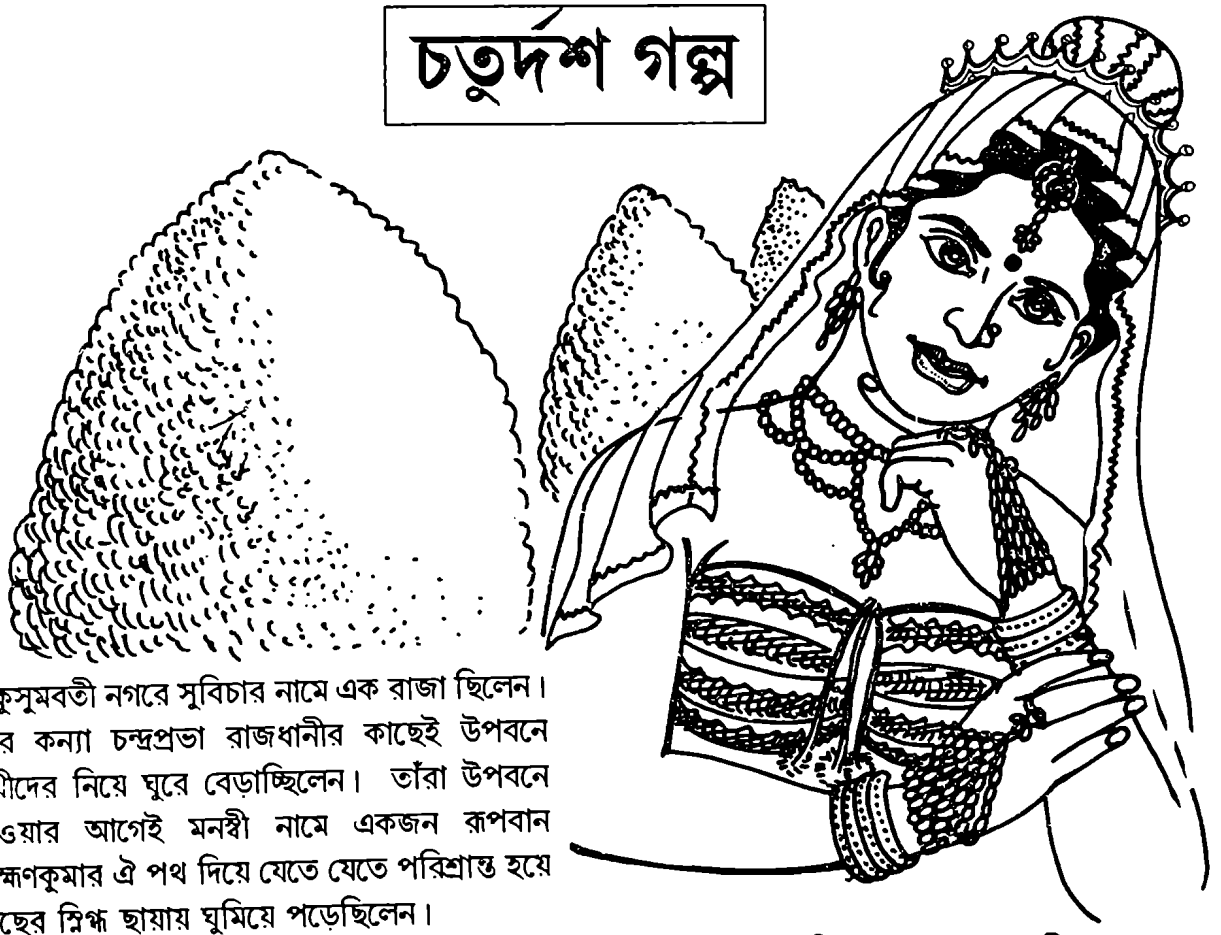

কুসুমবতী নগরে সুবিচার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কন্যা চন্দ্রপ্রভা রাজধানীর কাছেই উপবনে সখীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা উপবনে যাওয়ার আগেই মনস্বী নামে একজন রূপবান ব্রাহ্মণকুমার ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে পরিশ্রান্ত হয়ে গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

রাজকুমারী ও তাঁর সখীদের পায়ের শব্দে ও কথায় ব্রাহ্মণকুমারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চন্দ্রপ্রভাকে দেখে মুগ্ধ হলেন যুবক। এমন সুন্দরী মেয়ে তিনি আগে কখনও দেখেন নি।

রাজকুমারীও এমন রূপবান যুবক কখনও দেখেন নি। মনস্বীকে তাঁর খুব ভাল লাগল। সখীরা রাজকুমারীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে রাজধানীতে চলে গেল।

ব্রাহ্মণকুমার নিদারুণ হতাশায় সেইখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সেই সময় শশী ও ভূদেব নামে দু'জন পথিক সেখানে পৌঁছলেন। তাঁরাও পথশ্রমে ক্লান্ত। কামরূপ থেকে বিদ্যাশিক্ষা করে তাঁরা দেশে ফিরছিলেন। মনস্বীকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁরা চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরাল। তারপর কারণ জিজ্ঞাসা করতে মনস্বী তাদের সব কথা খুলে বললেন। আরও বললেন, তাঁকে না পেলে আমি বাঁচব না।

ভূদেব বললেন, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করো না, এখন আমার সঙ্গে চল। তুমি যাতে তাকে পাও তার সব ব্যবস্থা আমি করছি।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভূদেব তাঁকে এক অক্ষরের মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, এই মন্ত্রের এমন গুণ, এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি এক ষোল বছরের যুবতীতে পরিণত হবে, আবার ইচ্ছা করলেই নিজের চেহারা ফিরে পাবে।

তখন মনস্বী মন্ত্রপ্রয়োগে ষোল বছরের এক সুন্দরী কন্যা হয়ে গেলেন। ভূদেব হলেন আশী বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মনস্বীকে বধূর বেশে সাজিয়ে রাজা সুবিচারের কাছে উপস্থিত হলেন।

রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করে সম্মানের সঙ্গে বসতে বললেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ভূদেব বললেন, মহারাজ, আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন এ আমার পুত্রবধূ। একে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি গ্রামে ওলাওঠা দেখা দেওয়ায় আমার ব্রাহ্মণী ও ছেলে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। তাদের খুঁজতে দেশে দেশে ঘুরতে চাই। তাই আমার বিনীত অনুরোধ, আমার এই পুত্রবধূকে আপনি আশ্রয় দিয়ে আপনার কন্যার সাথে অন্তঃপুরে রাখুন। ফিরে এসে আমার বৌমাকে নিয়ে যাব।

রাজা এই প্রস্তাব শুনে মনে মনে ভাবলেন, পরের মেয়ে ঘরে রাখা সহজ কাজ নয়। কিন্তু অস্বীকার করলে ব্রাহ্মণ মনে কষ্ট পাবেন। তাই ঠিক করলেন কন্যা চন্দ্রপ্রভার সখী হিসেবে তাকে অন্তঃপুরে রাখা যেতে পারে।

তারপর বললেন, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম। রাজা হিসাবে এটা পালন করা অবশ্যকর্তব্য।

রাজকন্যা একজন সমবয়স্কা সঙ্গী পেয়ে খুশি হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনের খুব ভাব হলো।

একদিন রাজকন্যার মনের ভাব বুঝবার জন্য বউটি কথাপ্রসঙ্গে বললো, ভাই, তুমি সব সময় কি চিন্তা কর বল তো, চিন্তায় চিন্তায় তুমি ক্রমেই রোগা হয়ে যাচ্ছ।

তখন রাজকন্যা প্রাণের কথা খুলে বললেন, কিছুদিন আগে উপবনে বেড়াতে গিয়ে এক সুন্দর যুবকের সাথে আমার দেখা হয়। কিন্তু তার নাম ঠিকানা কিছুই জানি না। তাকে বিয়ে না করতে পারলে আমার কোন সুখ নেই।

মনস্বী রাজকন্যার কথা শুনে খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, আমি সেই ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিতে পারি।

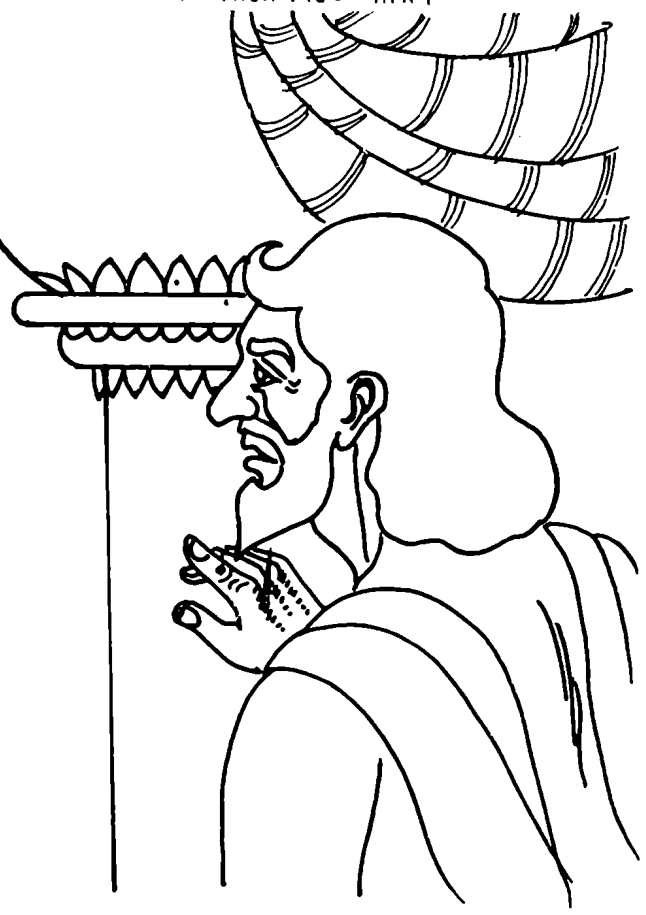

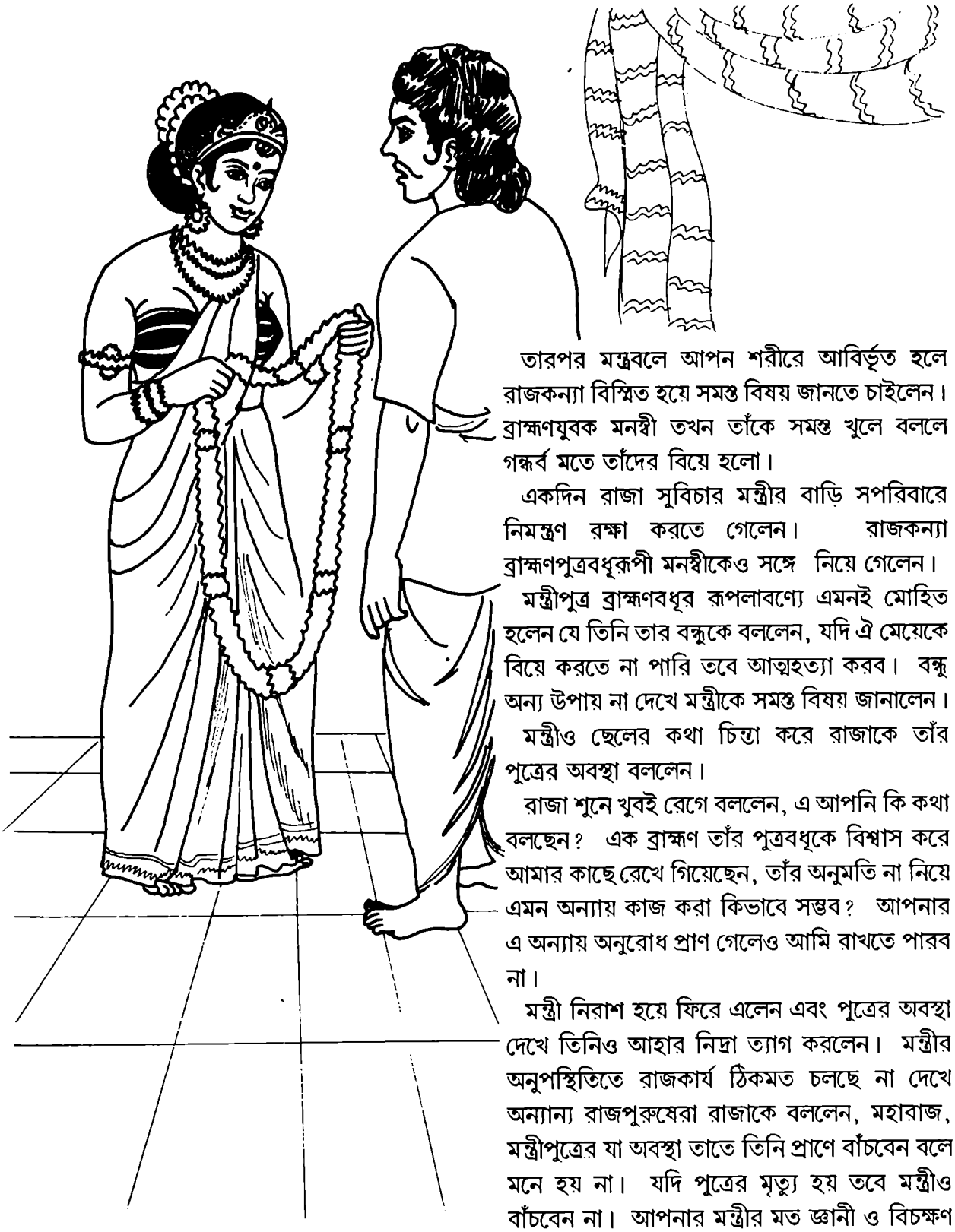

তারপর মন্ত্রবলে আপন শরীরে আবির্ভূত হলে রাজকন্যা বিস্মিত হয়ে সমস্ত বিষয় জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণযুবক মনস্বী তখন তাঁকে সমস্ত খুলে বললে গন্ধর্ব মতে তাঁদের বিয়ে হলো।

একদিন রাজা সুবিচার মন্ত্রীর বাড়ি সপরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। রাজকন্যা ব্রাহ্মণপুত্রবধূরূপী মনস্বীকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

মন্ত্রীপুত্র ব্রাহ্মণবধূর রূপলাবণ্যে এমনই মোহিত হলেন যে তিনি তার বন্ধুকে বললেন, যদি ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে না পারি তবে আত্মহত্যা করব। বন্ধু অন্য উপায় না দেখে মন্ত্রীকে সমস্ত বিষয় জানালেন।

মন্ত্রীও ছেলের কথা চিন্তা করে রাজাকে তাঁর পুত্রের অবস্থা বললেন।

রাজা শুনে খুবই রেগে বললেন, এ আপনি কি কথা বলছেন? এক ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রবধূকে বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গিয়েছেন, তাঁর অনুমতি না নিয়ে এমন অন্যায় কাজ করা কিভাবে সম্ভব? আপনার এ অন্যায় অনুরোধ প্রাণ গেলেও আমি রাখতে পারব না।

মন্ত্রী নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন এবং পুত্রের অবস্থা দেখে তিনিও আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য ঠিকমত চলছে না দেখে অন্যান্য রাজপুরুষেরা রাজাকে বললেন, মহারাজ, মন্ত্রীপুত্রের যা অবস্থা তাতে তিনি প্রাণে বাঁচবেন বলে মনে হয় না। যদি পুত্রের মৃত্যু হয় তবে মন্ত্রীও বাঁচবেন না। আপনার মন্ত্রীর মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ

দ্বিতীয় কেউ নেই, এই মন্ত্রী না থাকলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমাদের অনুরোধ, ব্রাহ্মণপুত্রবধূকে মন্ত্রীর ছেলের সাথে বিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ হয়তো আর না ফিরতেও পারেন। যদি ফিরে আসেন তখন যথেষ্ট অর্থের লোভ দেখালে তিনি আর আপত্তি করবেন না। যদি অর্থে কাজ না হয় তবে ব্রাহ্মণপুত্রের অন্য কোন কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

রাজা অনেক ভাবনা চিন্তা করে ব্রাহ্মণপুত্রবধূর কাছে গিয়ে সব বললেন।

ব্রাহ্মণপুত্রবধূরূপী মনস্বী বললেন, মহারাজ, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, আমার স্বামী এখনও বেঁচে আছেন। প্রাণ গেলেও আপনার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

মনমরা হয়ে রাজা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন। মনস্বী ভাবলেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। এই ভেবে মন্ত্রবলে পুরুষবেশে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে সোজা উপস্থিত হলেন ভূদেবের বাড়ি। সমস্ত শুনে ভূদেব খুব খুশি হলেন। মনে মনে ভাবলেন ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে।

বন্ধু শশীকে যুবক সাজিয়ে ভূদেব নিজে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজা আসন থেকে উঠে এসে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে ব্রাহ্মণকে বসতে অনুরোধ করে বললেন, আপনার ফিরতে এত দেরী হলো কেন?

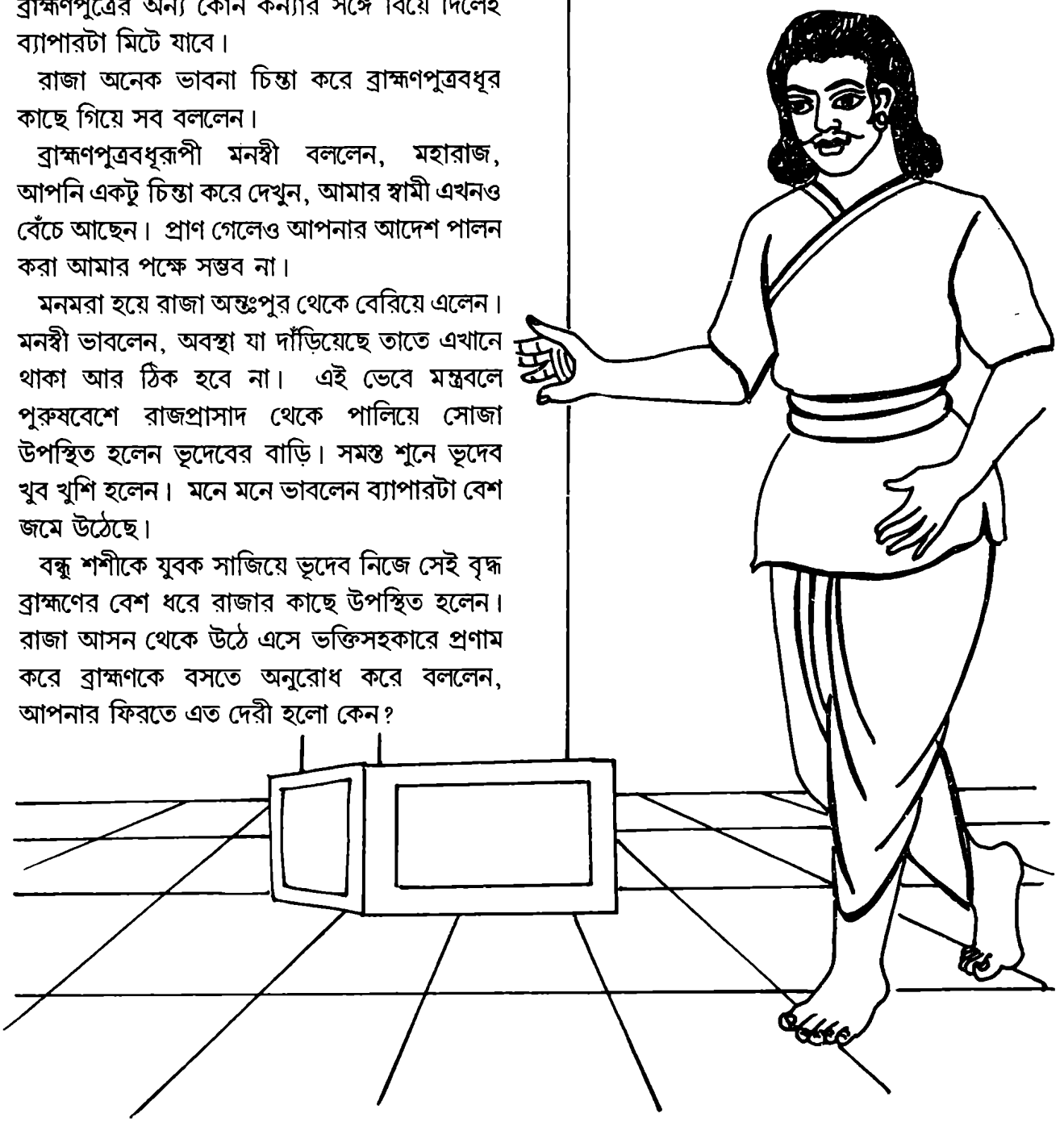

ভূদেব বললেন, অনেক কষ্টে পুত্রকে ফিরে পেয়েছি, এখন পুত্রবধূসহ নিজের বাড়ি ফিরে যাব।

রাজা তখন কোন কথা না লুকিয়ে সব কথা সবিস্তারে ব্রাহ্মণকে বললেন।

ব্রাহ্মণ শুনে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই কি রাজার কাজ হয়েছে? এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা কি কোন মানুষের উচিত কাজ ?

রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার যে ক্ষতি আমি করেছি তা যে কোন মূল্যে পরিশোধ করতে আমি প্রস্তুত।

ভূদেব বললেন, বেশ, আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের যদি বিয়ে দেন তবেই আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে।

রাজা নিরুপায় হয়ে এই প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং শুভদিনে বিয়ে হয়ে গেল।

ভূদেব রাজকন্যা নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলে শশী এবং মনস্বী দু'জনেই রাজকন্যাকে নিজ স্ত্রীরূপে দাবী করলেন এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লাগলেন।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, এখন বল মহারাজ, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কার স্ত্রী হওয়া উচিত এই রাজকন্যার?

বিক্রমাদিত্য বললেন, মনস্বীর স্ত্রী হবে এই রাজকন্যা।

বেতাল বললো, কিন্তু রাজা সকলের সামনে ধর্ম সাক্ষী রেখে শশীকে কন্যা দান করেছেন। মনস্বী কি ভাবে দাবী করতে পারে?

রাজা বললেন, তুমি যা বলছ তা আমি অস্বীকার করছি না ; কিন্তু মনস্বী এই কন্যাকে আগেই বিয়ে করেছে। সুতরাং তার অন্য কোথাও বিয়ে হতে পারে না।

বেতাল খুশি হয়ে রাজার কাঁধ থেকে নেমে সেই গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও আবার তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও তার পঞ্চদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

পঞ্চদশ গল্প

সেকালে ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে হিমালয়ের কোলে পুষ্পশর নামে এক নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। পরে কল্পবৃক্ষের আরাধনা করে তাঁর একটি সুন্দর ছেলে হলো। ছেলের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। জীমূতবাহন ধার্মিক, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সব শাস্ত্রে ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন পর জীমূতকেতু আবার কল্পবৃক্ষের আরাধনা করে রাজ্যের প্রজাদের জন্য সব রকম সুখ সম্পদ চেয়ে নিলেন। কিন্তু এতে রাজ্যের প্রকৃত মঙ্গল হলো না। প্রজারা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে কুঁড়ে ও অহঙ্কারী হয়ে উঠল। রাজাকেও মানতে চাইল না। রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিল।

তখন রাজার কয়েকজন জ্ঞাতি প্রজাদের বলতে লাগল, এই রাজা প্রজাদের মঙ্গলের কথা মোটেই চিন্তা করছেন না, এঁকে সরিয়ে অন্য কোন উপযুক্ত লোককে রাজা করতে হবে।

প্রজারা তাদের কথায় বিশ্বাস করে রাজদ্রোহী হয়ে প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেললো।

প্রজাদের এই স্পর্ধা দেখে জীমূতবাহন তাঁর বাবাকে বললেন, মহারাজ, জ্ঞাতিরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের রাজ্যচ্যুত করতে চাইছে, আপনি আজ্ঞা দিলে এদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করি।

জীমূতকেতু বললেন, ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের জন্য প্রাণী হত্যা করা মহাপাপ। বরং রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের শান্ত কোন জায়গায় কুঁড়েঘর তৈরি করে দেবতার আরাধনা করায় অনেক শান্তি পাওয়া যাবে।

এরপর তাঁরা প্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।

সেখানে এক ঋষিকুমারের সঙ্গে রাজকুমার জীমূতবাহনের খুব বন্ধুত্ব হলো। একদিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে কাত্যায়নীর মন্দিরের কাছে গেলে মন্দিরের ভিতর থেকে বীণার শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন এক পরমাসুন্দরী মেয়ে বীণা বাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর স্তবগান করছেন। মেয়েটি হলো মলয়রাজের কন্যা মলয়বতী।

কিছুক্ষণ পর গান শেষ করে জীমূতবাহনকে দেখে মলয়বতীর খুব ভাল লেগে যায়। মনে মনে তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়ে সখীদের দিয়ে তাঁর নাম ও পরিচয় জেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে যান।

এরপর বাড়ি ফিরে সখী রাণীমার কাছে সমস্ত বললে তিনি তাঁর স্বামী মলয়কেতুকে সব ঘটনা বলেন। মলয়কেতু তাঁর ছেলে মিত্রাবসুকে ডেকে বললেন, তোমার বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে। এবার একটা কিছু করতে হবে। শুনলাম গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ও তাঁর পুত্র রাজ্য ত্যাগ করে মলয় পর্বতে বাস করছেন। আমার খুব ইচ্ছা জীমূতবাহনের সঙ্গে মলয়বতীর বিয়ের ব্যবস্থা করি। তুমি জীমূতকেতুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বল।

মিত্রাবসু জীমূতকেতুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললে তিনি রাজি হয়ে জীমূতবাহনকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। মলয়কেতু শুভদিন দেখে কন্যা মলয়বতীর সঙ্গে জীমূতবাহনের বিয়ে দিলেন।

এর কিছুদিন পর একদিন মিত্রাবসুর সঙ্গে হিমালয়ের উত্তর দিকে বেড়াতে বেড়াতে জীমূতবাহন একটা প্রকাণ্ড সাদা ঢিবি দেখে কৌতূহলী হয়ে বললেন, ওটা কি?

মিত্রাবসু বললেন, একসময় গরুড়ের সঙ্গে নাগদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। নাগরা পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলে গরুড় বললেন, যদি তোমরা আমার আহারের জন্য প্রতিদিন একটা করে সাপ দিতে পার তবে তোমাদের অন্য কাউকে আমি খাব না।

উপায় না দেখে নাগরা গরুড়ের এই প্রস্তাবে রাজি হলো। তারপর থেকে প্রতিদিন একটি করে নাগ সেখানে উপস্থিত থাকে। গরুড় যথাসময় এসে ঐ নাগকে খেয়ে চলে যায়। দীর্ঘদিন ধরে নাগদের হাড় জমে জমে ঐ সাদা পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে।

জীমূতবাহন এই কথা শুনে মনে বড় ব্যথা পেলেন। মিত্রাবসুকে বিদায় দিয়ে তিনি সেইদিকে রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়েই কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন এবং তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক বুড়ি নাগিনী কপাল চাপড়ে কাঁদছে। জীমূতবাহন তাঁকে বললেন, মা, তুমি কাঁদছ কেন?

সে তখন সকল কথা বলে বললো, আজ আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুড় এসে তাকে আহার করবে।

জীমূতবাহন বললেন, মা, তুমি আর কেঁদ না, আমি নিজের প্রাণ দিয়ে তোমার ছেলেকে বাঁচাবো।

বুড়ি বললো, তুমি কেন পরের জন্য প্রাণ দেবে। তাহলে আমার পাপ হবে।

দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছে এমন সময় শঙ্খচূড় সেখানে এসে উপস্থিত হলো। জীমূতবাহনের পরিচয় জেনে সে বললো, মহারাজ, আমার মত সামান্য প্রাণীকে বাঁচাতে আপনার মত মহৎ প্রাণ বিনষ্ট হওয়া ঠিক নয়। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণীর উপকার হবে।

জীমূতবাহন বললেন, শোন শঙ্খচূর, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের জীবন দিয়ে তোমার প্রাণ বাঁচাব। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। তুমি এখান থেকে চলে যাও। এই বলে শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গরুড়ের আসার অপেক্ষায় রইলেন।

নিদারুণ দুঃখে শঙ্খচূড় দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, যাতে জীমূতবাহনের প্রাণ রক্ষা হয়।

যথাসময়ে গরুড় এসে জীমূতবাহনকে ঠোঁটে তুলে আকাশে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ পর জীমূতবাহনের ডান হাতের নাম লেখা মণিময় কেয়ুর রক্তে মাখামাখি হয়ে মলয়বতীর সামনে এসে পড়ল। তিনি সেটি দেখেই চিনতে পেরে কেঁদে উঠলেন। রাজবাড়ির সকলেই এই দৃশ্য দেখে হাহাকার করে উঠলো।

রাজা মলয়কেতু চারদিকে লোক পাঠিয়ে পুত্রসহ নিজেও জীমূতবাহনকে খুঁজতে বেরলেন। শঙ্খচূড়

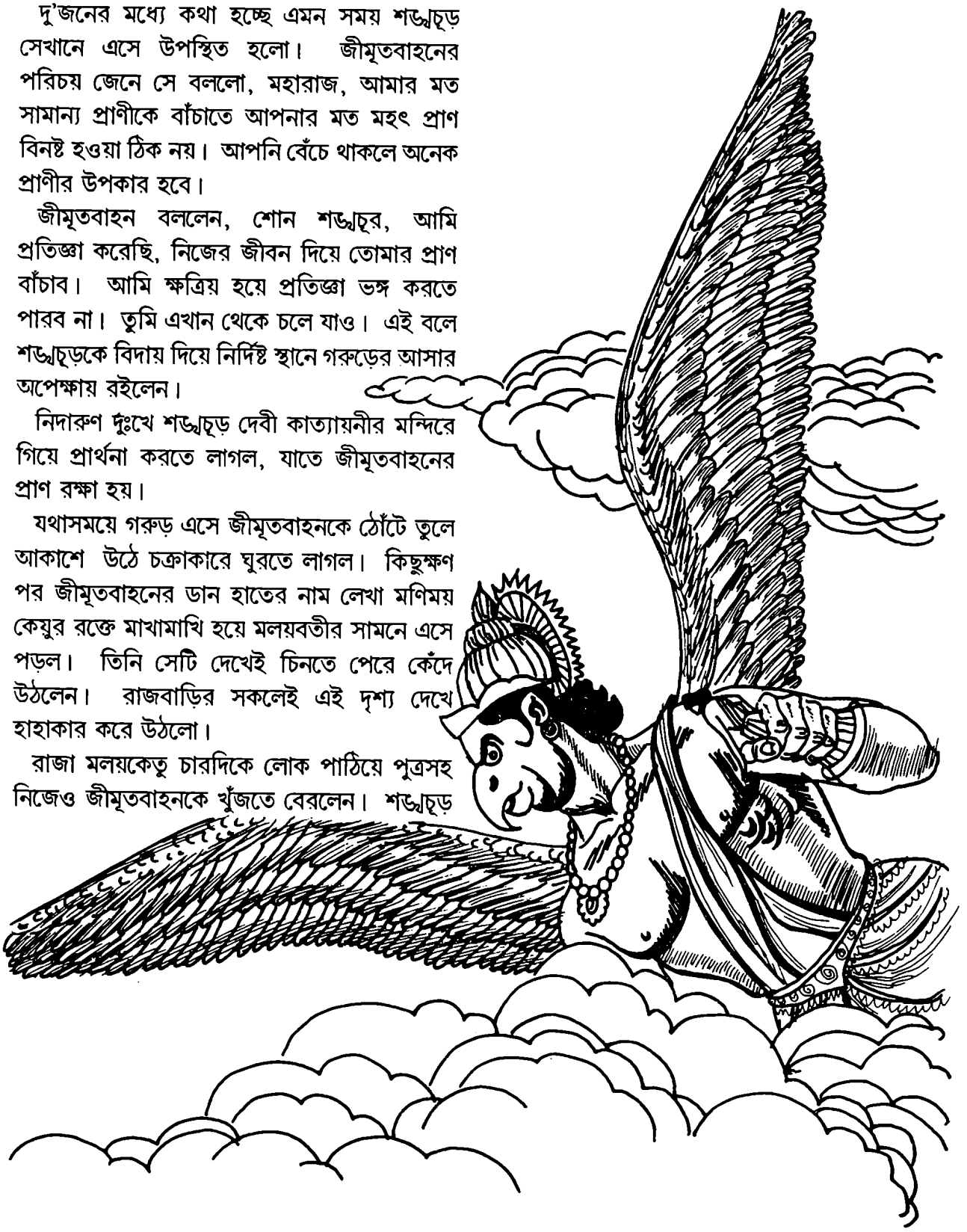

জীমূতবাহনের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনে দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, হে পক্ষিরাজ, তুমি যাঁকে খাবে বলে নিয়ে গিয়েছ, তিনি ধর্মপ্রাণ জীমূতবাহন। তুমি তাঁকে ত্যাগ করে আমাকে আহার করে তোমার ক্ষুধা মেটাও। যদি তুমি তাঁকে খাও তবে অধর্মের কাজ করবে।

এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গরুড় দেখলেন, তাই তো! এতো কোন নাগ নয়, এ আমি কাকে খাচ্ছি!

জীমূতবাহন তখন মৃতপ্রায়। গরুড় তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, সকলেই নিজের জীবন বাঁচাতে চায় আর তুমি পরের জীবন বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলে? তোমার মত আর একজন ধর্মপ্রাণ এই পৃথিবীতে আছেন কিনা সন্দেহ, তুমি বর প্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে আর কোন সাপকে খাবেন না আর যেসব সাপদের ইতিপূর্বে খেয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিন।

গরুড় রাজি হয়ে পাতালে গিয়ে অমৃত এনে সেই অমৃত জড়ো করা হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিতেই সমস্ত সাপরা বেঁচে উঠলো। তারপর জীমূতবাহনকে বললেন, রাজকুমার, আমার কৃপায় তুমি আবার তোমার রাজ্য ফিরে পাবে।

এই সুখবর শুনে মলয়রাজের প্রাসাদেও আনন্দের সীমা রইল না। প্রজারাও এসে রাজা জীমূতকেতুর কাছে ক্ষমা চাইল এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়, এই দু'জনের মধ্যে কে বেশী মহৎ।

বিক্রমাদিত্য বললেন, শঙ্খচূড়।

বেতাল বললো, কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, শঙ্খচূড় প্রথমে জীমূতবাহনের কথায় রাজি হয় নি। যখন কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করা গেল না তখন শঙ্খচূড় দেবী কাত্যায়নীর কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করল এবং পুনরায় গরুড়ের কাছে এসে নিজের প্রাণের বিনিময়ে জীমূতবাহনের জীবন বাঁচাতে চাইল।

বেতাল বললো, যে পরের জন্য জীবন দিতে গেল সে কেন মহৎ হলো না?

রাজা বললেন, জীমূতবাহন জাতিতে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়দের কাছে প্রাণ অতি তুচ্ছ জিনিস। তাই জীমূতবাহন যা করেছে তা যে কোন ক্ষত্রিয়ই করতে পারত।

উত্তর শুনে বেতাল আর কোন কথা না বলে রাজার কাঁধ থেকে নেমে গাছে গিয়ে উঠল আর রাজাও তাকে পুনরায় কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও ষোড়শ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

ষোড়শ গল্প

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বণিকের উন্মাদিনী নামে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। রত্নদত্ত মনে করতেন তাঁর মেয়ে রাজরাণী হবার উপযুক্ত। তাই মেয়ে বিবাহযোগ্যা হলে দেশের রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, মহারাজ, আমার এক মেয়ে আছে, আপনি তাকে একবার দেখুন। সে আপনার রাণী হবার উপযুক্ত।

মেয়েটিকে দেখতে রাজা কয়েকজন মন্ত্রীকে পাঠালেন।

মেয়েটির রূপ দেখে মন্ত্রীরা মুগ্ধ হলেন কিন্তু সকলে মিলে যুক্তি করলেন, এই মেয়ের সঙ্গে যদি রাজার বিয়ে হয় তবে রাজা রাজকার্য ত্যাগ করে রাণীকে নিয়ে অন্তঃপুরেই সময় কাটাবেন। রাজ্যের প্রজাদের এতে অমঙ্গল হবে। মন্ত্রীরা রাজাকে জানালেন এই মেয়ে মোটেই মহারাণী হবার মত সুন্দরী নয়।

রাজা এই বিয়েতে অসম্মত হলে রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর তারা সুখেই বাস করতে লাগল।

ক্রমে বসন্তকাল এলো। একদিন রাজা হাতীতে চড়ে নগরে বসন্তোৎসব দেখতে বেরুলেন, একদল লোক দামামা বাজাতে বাজাতে তাঁর আগে আগে চললো।

এই দামামার শব্দ শুনে উন্মাদিনী নিজের বাড়ির ছাদে উঠলো। হাতীটি উন্মাদিনীর বাড়ির সামনে এলেই রাজার নজর পড়ল উন্মাদিনীর দিকে, কি দেখলেন তিনি? দেখলেন পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সুন্দরী মেয়ে রাজা আগে কখনও দেখেন নি। খোঁজ খবর করে জানতে পারলেন, মেয়েটি হলো রত্নদত্তের কন্যা, যার সাথে তাঁর বিয়ে হবার কথা ছিল। সে এখন বলভদ্রের স্ত্রী। মন্ত্রীরা তাকে ইচ্ছা করে ঠকিয়েছেন।

তিনি মন্ত্রীদের অবশ্য কোন শাস্তি দিলেন না, কিন্তু

নিজে খুব মনমরা হয়ে গেলেন। কিছু খান না, রাজবাড়ি থেকে বের হন না—ক্রমে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। কথাটা বলভদ্রের কানে পৌঁছতে সে রাজার কাছে এসে হাত জোড় করে বললো, মহারাজ, আমার সব কিছু আপনার জন্য। আমি উন্মাদিনীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, আপনি তাকে দাসী করে রাখুন।

তাই শুনে রাজার কি রাগ! বললেন, ছিঃ বলভদ্র, তুমি তোমার স্ত্রীকে অন্যের বাড়িতে দাসীগিরি করতে পাঠাবে? আর আমাকে যদি তুমি ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাহলে আমি এটা মেনে নেব এমন ভাবলে কি করে? তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর তাহলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।

বলভদ্র মুখ নিচু করে সেখান থেকে চলে গেল।

কিন্তু রাজার শরীর আরও খারাপ হতে লাগল। শেষকালে তাঁর মৃত্যু হলো। আর রাজার মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে, বলভদ্রও আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল।

বেতাল রাজার কাঁধে থেকে তাঁকে এই অপূর্ব কাহিনী শোনাবার পর বললো, এখন বলো, রাজা এবং তাঁর সেনাপতি এই দু'জনের মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশী?

রাজা বললেন, সেনাপতি তাঁর প্রভু রাজার জন্য যা করেছেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে? ভৃত্যেরা নিজেদের জীবন দিয়েও প্রভুর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য, কিন্তু রাজা অধর্মের পথে পা না বাড়িয়ে বরং তিনি প্রাণ ত্যাগ শ্রেয় মনে করেছেন। তাই আমার মতে রাজার মহত্ত্বই বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

রাজার মুখে এই কথা শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ ছেড়ে আবার সেই গাছে চলে গেল, আর রাজাও আবার সেখানে তাকে আনতে চললেন। পুনরায় কাঁধে নিয়ে যখন রাজা চলতে আরম্ভ করলেন তখন বেতাল তার সপ্তদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

সপ্তদশ গল্প

হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর ছেলের নাম ছিল গুণাকর। ছেলেটি জুয়ো খেলে ব্রাহ্মণ যা কিছু সঞ্চয় করেছিলেন তা অল্প দিনের মধ্যেই শেষ করে, তারপর চুরি করতে আরম্ভ করল। বিষ্ণুশর্মা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

তখন গুণাকর অনেক দেশ ঘুরে এক শ্মশানে উপস্থিত হয়ে দেখল এক সন্ন্যাসী সেখানে যোগাভ্যাস করছেন। সে যোগীকে প্রণাম করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যোগী তাকে দেখেই বুঝলেন এই যুবক ক্ষুধায় কাতর। তাকে একটা মরার খুলিতে করে অনেককিছু খেতে দিলেন।

গুণাকর বললো, প্রভু, এ খাদ্য গ্রহণ করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

তখন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে চোখ বুজতেই এক যক্ষকন্যা সেখানে উপস্থিত হলো।

সন্ন্যাসী বললেন, এই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমার আশ্রমে এসেছে, তার উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা কর।

সন্ন্যাসীর আদেশ পাওয়া মাত্র যক্ষকন্যার মায়াবলে নিমেষের মধ্যে এক প্রাসাদ দেখা দিল। সে ব্রাহ্মণকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অনেকরকম আহারে তাকে সন্তুষ্ট করে, সুদৃশ্য এক পালঙ্কে শুতে দিল। গুণাকর পরম সুখে রাত কাটাল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখল গতকালের কিছুই নেই। সে তখন অবাক হয়ে সেই সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললো।

সন্ন্যাসী বললেন, যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে এসেছিল। যে লোকের যোগবিদ্যা জানা নেই যক্ষকন্যা তার কাছে থাকে না।

এই কথা শুনে গুণাকর সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বললো, প্রভু, আমাকে বলুন কিভাবে আমি সেই বিদ্যা শিখতে পারি।

সন্ন্যাসী তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, চল্লিশ দিন মাঝরাতে গলা অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবে থেকে একমনে এই মন্ত্রটি জপ করবে।

গুণাকর সন্ন্যাসীর নির্দেশমত চল্লিশদিন ঐ ভাবে

জপ করে তাঁর কাছে এসে বললো, প্রভু, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। এবার আদেশ করুন আর কি করতে হবে?

সন্ন্যাসী বললেন, আরও চল্লিশ দিন জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে ঐ মন্ত্র জপ করলেই তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

গুণাকর বললো, প্রভু, অনেকদিন হলো ঘর ছেড়ে এসেছি, বাবা-মাকে দেখতে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে। আগে বাবা-মাকে দেখে আসি, তারপর আপনার নির্দেশমত কাজ করব।

সন্ন্যাসীর অনুমতি নিয়ে গুণাকর বাড়ি গেল। অনেকদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে বাবা-মার আনন্দের সীমা নেই। তাঁরা জানতে চাইলেন এতদিন সে কোথায় ছিল?

তখন গুণাকর সমস্ত কথা খুলে বললো। শুনে মা বললেন, আমাদের এইভাবে দুঃখ দিয়ে তুই চলে যাস না, যোগাভ্যাস করবার বয়স এটা নয়। ঘরে থেকে

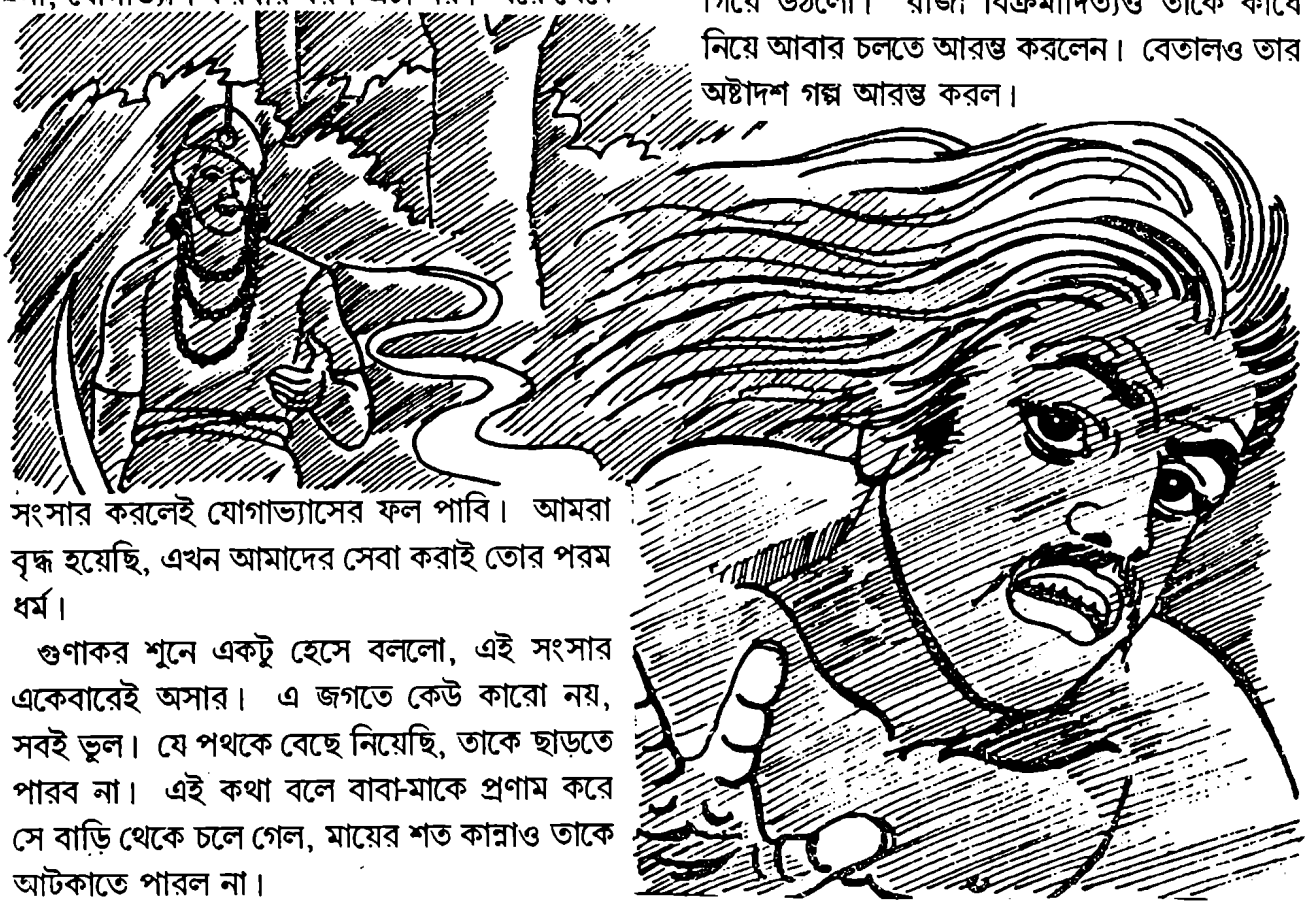

সংসার করলেই যোগাভ্যাসের ফল পাবি। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আমাদের সেবা করাই তোর পরম ধর্ম।

গুণাকর শুনে একটু হেসে বললো, এই সংসার একেবারেই অসার। এ জগতে কেউ কারো নয়, সবই ভুল। যে পথকে বেছে নিয়েছি, তাকে ছাড়তে পারব না। এই কথা বলে বাবা-মাকে প্রণাম করে সে বাড়ি থেকে চলে গেল, মায়ের শত কান্নাও তাকে আটকাতে পারল না।

সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে চল্লিশদিন আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জপ করেও কিন্তু কোন ফল হলো না।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, কেন ব্রাহ্মণ যুবক সবকিছু করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারল না?

বিক্রমাদিত্য বললেন, একাগ্রচিত্ত না হলে কোন ফল লাভ হয় না। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠার অভাব ছিল। নিষ্ঠাসহকারে কোন কাজ না করলে তা সফল হয় না।

বেতাল বললো, সে তো সন্ন্যাসীর আদেশমত কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করে নি? কিভাবে প্রমাণ হবে যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল?

বিক্রমাদিত্য বললেন, যদি সে একাগ্র হতো তবে বাবা-মাকে দেখবার জন্য অত ব্যস্ত হতো না।

এই কথা শুনে বেতাল মনে মনে রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠলো। রাজা বিক্রমাদিত্যও তাকে কাঁধে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও তার অষ্টাদশ গল্প আরম্ভ করল।

অষ্টাদশ গল্প

সেকালে কুবলয়পুরে ধনপতি নামে একজন ধনী বণিক ছিলেন। ধনবতী নামে তাঁর এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। অল্প বয়সেই গৌরীদত্ত নামে এক ধনী বণিক-পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হলো।

কয়েক বছর পর ধনবতীর একটি মেয়ে হলো। তার নাম মোহিনী। গৌরীদত্তের অকালে মৃত্যু হলে তাঁর জ্ঞাতিরা ধনবতীকে ঠকিয়ে তার সব সম্পত্তি নিয়ে নিল। অন্ধকার অমাবস্যার রাতে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি রওনা হলো ধনবতী।

অন্ধকার রাতে পথ ভুলে ধনবতী এক শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে এক চোর রাজার আদেশে তিনদিন শূলে বসে ছিল। তিনদিনেও তার প্রাণ যায় নি।

অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে ধনবতীর সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। চোর কাতর স্বরে বললো, আমার এই কষ্টের উপর আবার কষ্ট দিলে কে তুমি?

এই কথা শুনে ধনবতী বললো, জেনেশুনে তোমাকে কষ্ট দিই নি, অন্ধকারে তোমাকে দেখতে পাই নি। আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু তুমি এই অন্ধকার রাত্রে এখানে কেন কষ্ট ভোগ করছ?

চোর বললো, আমি জাতিতে বণিক। চুরির অপরাধে রাজা আমাকে শূলদণ্ড দিয়েছেন। জন্মকালে এক জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছিলেন বিয়ে না হলে আমার মৃত্যু নেই, তাই আজ তিনদিন চলে গেল তবু আমার মৃত্যু হচ্ছে না। কিন্তু এ যন্ত্রণা সহ্য করাও যাচ্ছে না। একমাত্র তুমি আমাকে এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে পার। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে আমি যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচি। আমার অনেক ধনসম্পত্তি আছে, আমি সে সব তোমায় দেব।

ধনসম্পত্তির কথা শুনে ধনবতীর আগ্রহ হলো। সে বললো, কিন্তু তুমি তো এখনই মারা যাবে।

আমার যে নাতির মুখ দেখবার বড়ই ইচ্ছা আছে, তাতো আর সম্ভব হবে না।

চোর ধনবতীর কথা শুনে বললো, তুমি কন্যাদান করে আমাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও, আমি অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি তোমার কন্যা বড় হলে আবার তার বিয়ে দিয়ে দেবে, তাহলেই নাতির মুখ দেখতে পাবে।

চোরের কাতর আবেদনে ধনবতী তার মেয়ের সঙ্গে চোরের বিয়ে দিল।

চোর বললো, সামনে ঐ যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ওখানে আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে একটা কূয়োর কাছে এক বটগাছের নীচে আমার সমস্ত ধনরত্ন মাটির নীচে আছে, তুমি সেগুলো নিও।

এই কথা বলার পরই চোরের মৃত্যু হলো।

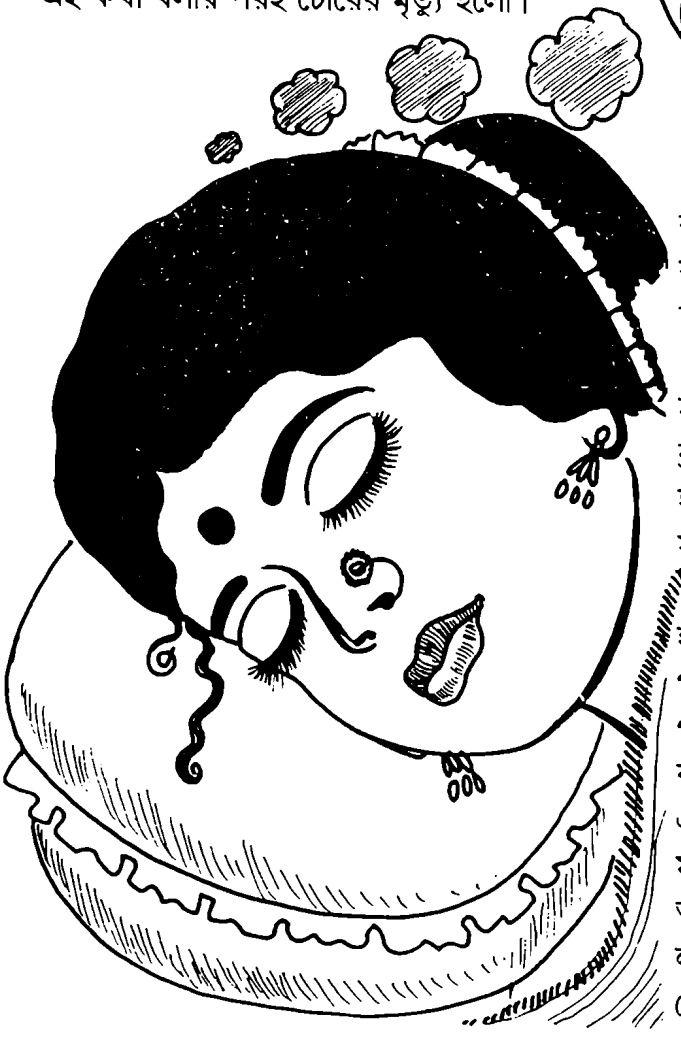

ধনবতী তখন চোরের কথামত সেই বটগাছের কাছে গিয়ে মাটি খুঁড়ে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। সব ঘটনা বাবাকে বলে সেখানেই দিন কাটাতে লাগল।

তারপর ধনবতীর মেয়ে মোহিনীর বিয়ের বয়স হয়েছে। একদিন জানালা দিয়ে রাস্তায় এক ব্রাহ্মণপুত্রকে দেখতে পেয়ে মোহিনী তার রূপে মুগ্ধ হলো। তারপর ধনবতীকে বলে সেই ব্রাহ্মণপুত্রের সাথে মোহিনীর বিয়ে হলো।

এর কিছুদিন পর মোহিনীর একটি সুন্দর ছেলে হলো। একদিন রাতে মোহিনী স্বপ্ন দেখলঃ বাঘ-ছাল পরা, তিনটি চোখ, কপালে বাঁকা চাঁদ, রূপোর মত গায়ের রং, ষাঁড়ের পিঠে বসা এক সুপুরুষ তাকে বলছেন, আগামীকাল মাঝরাতে তোমার ছেলেকে এক হাজার মোহরের সঙ্গে সুন্দর একটি প্যাটিরার মধ্যে ভরে রাজপ্রাসাদের সদর দরজার সামনে রেখে আসবে। অপুত্রক রাজা তাকে পুত্রের মত লালনপালন করে বড় করে তুলবে এবং ভবিষ্যতে সেই হবে রাজা।

মোহিনীর ঘুম ভেঙে গেলে সে এই স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগল। তারপর মাকে সব কথা খুলে বললো। স্বপ্নাদেশ মত ছেলেকে প্যাটিরায় ভরে মোহরসহ রাজার প্রাসাদের সদর দরজায় রেখে গেল তারা।

এদিকে রাজাও স্বপ্ন দেখলেন সেইরকম এক দিব্য পুরুষ তাঁকে বলছেন ঃ মহারাজ, আর ঘুমিয়ে থেক না, এক শিশু তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। তাকে নিজ পুত্রের মত প্রতিপালন কর। ভবিষ্যতে সেই রাজা হবে এবং তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে।

রাজার ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি সব কথা রাণীকে বললেন।

তখন দু'জনে কৌতূহলী হয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে দেখলেন রাজা যা স্বপ্নে দেখেছেন সেইমত একটা প্যাটিরা পড়ে আছে। প্যাটিরার মুখ খুলে দেখলেন এক শিশু তার মধ্যে শুয়ে আছে এবং তার গায়ের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে আছে। রাণী খুশি হয়ে সেই শিশুকে কোলে তুলে নিলেন এবং রাজা মোহরগুলো নিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন।

পরদিন পণ্ডিতরা সকলে একমত হয়ে বললেন, মহারাজ, এ ছেলে আপনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। এই শিশু যে একদিন পৃথিবীর অধীশ্বর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজা শুনে খুশি হয়ে পণ্ডিতদের যথেষ্ট উপহার দিলেন এবং গরিব দুঃখীদের পেট ভরে খাইয়ে নানা প্রকার উপহার দিলেন। ছেলের বয়স ছয় মাস হলে মুখেভাত দিয়ে তার নাম রাখলেন হরিদত্ত। তার বিদ্যাবুদ্ধি দেখে পণ্ডিতরা হরিদত্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যথাকালে হরিদত্ত সর্ববিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠল।

রাজা একদিন স্বর্গে গেলে হরিদত্ত রাজা হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপর তাঁর একাধিপত্য স্থাপন করলেন।

কিছুদিন পর হরিদত্ত তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে অনেক তীর্থ ঘুরে শেষে গয়ায় এসে ফল্গু নদীর তীরে শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদানে বসলেন।

হরিদত্ত যখন পিণ্ডদান করতে গেলেন তখন জল থেকে তিনখানা ডান হাত উঠে এল। একটি সেই চোরের, একটি সেই ব্রাহ্মণপুত্রের আর অন্যটি রাজার।

এই পর্যন্ত বলে বেতাল বললো, মহারাজ, আমাকে বল, এই তিনজনের মধ্যে কে হরিদত্তের পিণ্ড পাবার প্রকৃত অধিকারী, যুক্তি দিয়ে এর উত্তর দাও।

রাজা বললেন, চোরের। কারণ ব্রাহ্মণপুত্র তো টাকার জন্য মোহিনীর কাছে নিজেকে বিক্রি করেছিল। রাজাও প্রতিপালনের জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই চোর ছেলের জন্য তার সবকিছু দিয়ে গিয়েছিল এবং মোহিনীর মা তাকে কথা দিয়েছিল ছেলে তারই হবে।

বেতাল ঠিক উত্তর পেয়ে আবার সেই শিরীষ গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল আর রাজাও তাকে গাছ থেকে পেড়ে আবার রওনা হলেন। বেতাল তখন তার ঊনবিংশ গল্প আরম্ভ করল।

উনবিংশ গল্প

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। একদিন তিনি একা ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে বেরোলেন। হরিণের আশায় বনে বনে অনেক ঘুরলেন কিন্তু একটিও হরিণ না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে তিনি এক ঋষির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সেখানে সুন্দর একটি সরোবর ছিল। তিনি সরোবরের তীরে গিয়ে দেখলেন টলটল করছে নীল জল, তাতে অনেক পদ্মফুল ফুটে আছে। মৌমাছিরা গুনগুন করছে আর ফুলে ফুলে মধু খাচ্ছে। পাখিরা ডালে বসে গান করছে। রাজা মুগ্ধ হয়ে এই সব দেখতে লাগলেন।

এমন সময় অপূর্ব সুন্দরী এক ঋষিকন্যা আশ্রম থেকে বেরিয়ে সরোবরে নামল স্নান করতে। রাজা তার রূপে মুগ্ধ হলেন।

এমন সময় ঋষিও ফল, ফুল, সমিধ প্রভৃতি সংগ্রহ করে সেই পথ দিয়েই ফিরছিলেন। রাজা তাঁকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে ঋষি আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

রাজা হাতজোড় করে বললেন, আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন প্রভু।

ঋষি রাজার এই প্রস্তাবে মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু নিজের কথার সম্মান রক্ষার জন্য রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

রাজা নববধূকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। পথে রাত হয়ে গেল। রাজা ও তাঁর স্ত্রী ফলাহার করে গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে জাগিয়ে বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি তোমার স্ত্রীর নরম মাংস খাব।

রাজা বললেন, তুমি আমার স্ত্রীর মাংস না খেয়ে অন্য যা চাও তাই দেব।

রাক্ষস বললো, বেশ, যদি একটা বারো বছর বয়সের ব্রাহ্মণের ছেলের মাথা কেটে আমাকে দিতে পার তবে তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারি।

রাজা তখনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, সাত দিন পর আমার রাজধানীতে এলে তুমি তোমার জিনিস পাবে।

পরদিন রাজধানীতে গিয়ে মন্ত্রীকে সমস্ত বিষয় বললেন। মন্ত্রী সব শুনে বললেন, কিছু ভাববেন না মহারাজ, আমি ব্যবস্থা করছি।

তিনি স্যাকরাকে দিয়ে একটা মানুষের সমান সোনার মূর্তি তৈরি করে তাকে মূল্যবান গয়না পরিয়ে রাজধানীর চারদিকে ঘুরিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, যে ব্রাহ্মণ তাঁর বারো বছরের ছেলেকে বলিদান দেবেন তিনি এই মূল্যবান মূর্তিটি পাবেন।

এক ব্রাহ্মণের বারো বছরের একটি ছেলে ছিল। তাঁরা বড়ই গরিব। দু'বেলা খাবার জোটে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বললেন, দেখ, ছেলেকে বলি দিলে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হব আমরা। ছেলের জন্য ভাবনা কি, আবার হবে।

ব্রাহ্মণীও এ বিষয়ে একমত হলেন।

রাজা বারো বছরের ব্রাহ্মণপুত্রকে পেয়ে খুব খুশি। আর কোন ভয় নেই। নির্দিষ্ট দিনে রাক্ষসও এসে উপস্থিত। বলি দেবার আগে ব্রাহ্মণপুত্র একটু হেসেছিল। তারপর রাজা খড়্গ দিয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মাথাটি কেটে ফেললেন।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, মৃত্যুর সময় সকলেই ভয়ে কাঁদে কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্র না কেঁদে হেসেছিল কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, হাসবে না? বাল্যকালে বাবা-মার কাজ হচ্ছে সন্তানকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করা, কিন্তু তা না করে ঐ ব্রাহ্মণপুত্রের বাবা-মা সুখে জীবন কাটাবে বলে নিজের পুত্রকে বলি দিতে পাঠাল; আর রাজার কর্তব্য প্রজাপালন। কিন্তু নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য নিরপরাধ এক বালককে নিজ হাতে হত্যা করলেন।

বেতাল রাজার এই উত্তর শুনে আর বিলম্ব না করে সেই গাছে গিয়ে উঠল আর রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে এনে কাঁধে নিয়ে রওনা হলেন। বেতালও তার বিংশ গল্প আরম্ভ করল।

বিংশ গল্প

বিশালপুর নগরে অর্থদত্ত নামে এক ধনী বণিক বাস করতেন। তিনি কমলপুরবাসী মদনদাস বণিকের সঙ্গে মেয়ে অনঙ্গমঞ্জরীর বিয়ে দিলেন।

বিয়ের কিছুদিন পর মদনদাস তার স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরীকে তার বাবা মার কাছে রেখে বাণিজ্য করতে বিদেশে রওনা হলো।

একদিন অনঙ্গমঞ্জরী জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন চলাচল দেখছিল। এমন সময় কমলাকর নামে এক সুন্দর ব্রাহ্মণপুত্রকে দেখে সে মুগ্ধ হলো। কমলাকরও তাকে দেখে মুগ্ধ হলো।

দু'জনেই দু'জনের জন্য নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দিল।

অনঙ্গমঞ্জরীর সখী ঠিক করলো, এ অবস্থায় কমলাকরকে এখানে আনতে না পারলে অনঙ্গমঞ্জরীকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তাই সে কমলাকরের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে তাকে অনঙ্গমঞ্জরীর কাছে যেতে বললো।

কমলাকর সমস্ত শুনে তখনই অনঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটলো। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, অনঙ্গমঞ্জরী প্রাণত্যাগ করেছে।

কমলাকরও দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটিতে পড়ে গেল। সেই যে পড়ল, সে আর উঠল না।

দু'জনকেই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে একই চিতায় দাহ করা হলো। ঠিক সেই সময় মদনদাসও সেখানে উপস্থিত হলো। সব কথা শুনে সেও মনের দুঃখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

বেতাল বললো, বল মহারাজ, এই তিনজনের মধ্যে কার ভালবাসা সবচেয়ে বেশী ছিল?

রাজা বললেন, মদনদাস।

বেতাল বললো, কেন?

রাজা বললেন, অনঙ্গমঞ্জরী আর কমলাকর তারা একে অপরকে ভালবাসতো তাই মনের দুঃখে দু'জনেই মারা গেল। কিন্তু মদনদাসের কথাই চিন্তা কর, তার স্ত্রী তাকে ভালবাসে না জেনেও সে প্রাণ ত্যাগ করল। তার ভালবাসা অনেক বেশী ছিল।

উত্তর শুনে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলল আর রাজাও তাকে নামিয়ে রওনা দিলেন। বেতালও একবিংশ গল্প আরম্ভ করল।

একবিংশ গল্প

সেকালে জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর চার ছেলে চার অবতার, বাবার ঠিক উল্টো। বড়টি জুয়াড়ী, মেজটি চরিত্রহীন, সেজটি বেহায়া আর ছোটটি নাস্তিক।

এই সময় বাবা-মা দু'জনেই মারা গেলে চার ভাইয়ের অবস্থা খুবই শোচনীয় হলো। কোন অভিভাবক না থাকায় বিষয় আশয় যা কিছু ছিল আত্মীয়স্বজনেরা সব আত্মসাৎ করলো। তখন চার ভাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, কিছুই আর রইল না যখন তখন আর এখানে থেকে কি খেয়ে বাঁচব আমরা, এর চেয়ে চলো আমরা আমাদের মামাবাড়ি যজ্ঞস্থলে যাই।

এইরকম সব যুক্তি করে চার ভাই যজ্ঞস্থলে গিয়ে হাজির হলো। চার ভাই সেখানে থেকে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু সে আর কত দিন? নিঃস্ব কপর্দকহীন ভাগনেদের কতদিন আর মামারা পুষবেন? চার ভাইই লক্ষ্য করলো মামাবাড়িতে তাদের ক্রমেই যেন অবহেলা করা হচ্ছে, ঘৃণা করা হচ্ছে। এ ভাবটা যেন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তখন সবাই মিলে ঠিক করলো পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে দিব্য বিদ্যা অর্জন করে একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই এসে মিলিত হবে। এরপর ঐ বিদ্যা লাভের জন্য কেউ গেল পূবে, কেউ পশ্চিমে, কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিণে। সারা পৃথিবী ঘুরে বিদ্যা অর্জন করে একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে চার ভাইই আবার মিলিত হলো। এরপর কথা উঠলো কে কি বিদ্যা অর্জন করে এসেছে। একজন বললো, কোন মৃত জীবের হাড় পেলে আমি আমার বিদ্যাবলে তাতে মাংস বসিয়ে দিতে পারি। দ্বিতীয়জন বললো, আমি আবার তাতে চামড়া এবং লোম বসিয়ে দিতে পারি। তৃতীয় ভাই বললো, আমি তাতে ঐ জীবের অন্যান্য অঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিতে পারি। তৃতীয়ের কথা শেষ হলে চতুর্থ ভাই বললো, আমি শিখে এসেছি এইরকম মৃত জীবের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে।

সুরু হলো হাড় খোঁজা, খুঁজতে খুঁজতে পাওয়াও গেল বনের মাঝে কয়েকখানা হাড়, সিংহের হাড়।

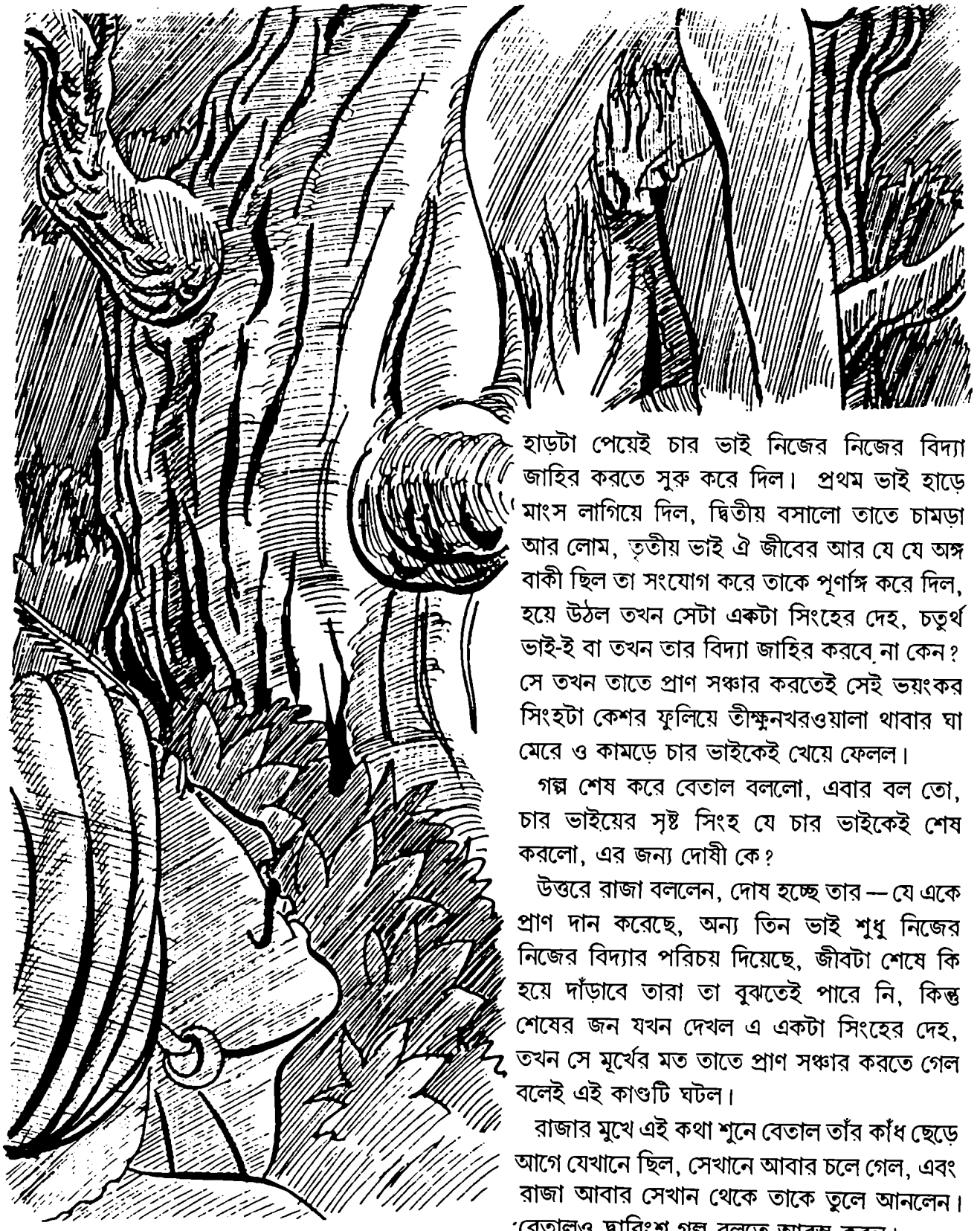

হাড়টা পেয়েই চার ভাই নিজের নিজের বিদ্যা জাহির করতে সুরু করে দিল। প্রথম ভাই হাড়ে মাংস লাগিয়ে দিল, দ্বিতীয় বসালো তাতে চামড়া আর লোম, তৃতীয় ভাই ঐ জীবের আর যে যে অঙ্গ বাকী ছিল তা সংযোগ করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিল, হয়ে উঠল তখন সেটা একটা সিংহের দেহ, চতুর্থ ভাই-ই বা তখন তার বিদ্যা জাহির করবে না কেন? সে তখন তাতে প্রাণ সঞ্চার করতেই সেই ভয়ংকর সিংহটা কেশর ফুলিয়ে তীক্ষ্ণনখরওয়ালা থাবার ঘা মেরে ও কামড়ে চার ভাইকেই খেয়ে ফেলল।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, এবার বল তো, চার ভাইয়ের সৃষ্ট সিংহ যে চার ভাইকেই শেষ করলো, এর জন্য দোষী কে?

উত্তরে রাজা বললেন, দোষ হচ্ছে তার — যে একে প্রাণ দান করেছে, অন্য তিন ভাই শুধু নিজের নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়েছে, জীবটা শেষে কি হয়ে দাঁড়াবে তারা তা বুঝতেই পারে নি, কিন্তু শেষের জন যখন দেখল এ একটা সিংহের দেহ, তখন সে মূর্খের মত তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে গেল বলেই এই কাণ্ডটি ঘটল।

রাজার মুখে এই কথা শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ ছেড়ে আগে যেখানে ছিল, সেখানে আবার চলে গেল, এবং রাজা আবার সেখান থেকে তাকে তুলে আনলেন। বেতালও দ্বাবিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

দ্বাবিংশ গল্প

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি একদিন ভাবলেন, বয়সের ভারে আমি এখন দুর্বল। আর কিছুদিনের মধ্যেই মরতে হবে। আমি পরদেহধারণবিদ্যা জানি। এই জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করে কোন যুবকের দেহ ধারণ করে ইচ্ছামত যতদিন খুশি বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু তার জন্য সংসার ত্যাগ করে বনে যেতে হবে।

মনে মনে এই কথা ভেবে নারায়ণ বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনে চলে গেলেন। স্ত্রী-পুত্রদের বলে গেলেন, জীবনের শেষ ক'টা দিন যোগাভ্যাস করে কাটাতে বনে চললাম।

বনে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে এক যুবকে পরিণত হলেন। কিন্তু মহারাজ, ব্রাহ্মণ নিজের জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করার আগে কেঁদে-ছিলেন এবং তারপর যখন অন্যের দেহ ধারণ করলেন তখন হাসলেন। ব্রাহ্মণ কেন প্রথমে কাঁদলেন এবং পরে হাসলেন?

রাজা বললেন, আগের দেহ ত্যাগ করা মানেই এতদিন যাঁরা আপনজন ছিল অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকল না তাই সেই দুঃখে কাঁদলেন, আর পরে যৌবনদেহ ধারণ করে অনেক ফূর্তি করতে পারবেন ভেবে হাসলেন।

বেতাল ঠিক উত্তর পেয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও তাকে পুনরায় গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন আর বেতালও ত্রয়োবিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।

ত্রয়োবিংশ গল্প

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণের দুটি পুত্র ছিল। বড়জন ভোজনবিলাসী, অর্থাৎ রান্না খারাপ হলে তা তার মুখে রুচতো না। ছোটজন শয্যাবিলাসী, আর যাই হোক তার বিছানাটি চাই আরামদায়ক। কোন খুঁৎ থাকলে তার ঘুম হবে না।

সেখানকার রাজার কানে কথাটা গেল। তিনি কৌতূহলবশত দুই ভাইকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন এবং জানতে চাইলেন তোমরা কে কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ?

তারা দু'জন নিজের নিজের পরিচয় দিলে প্রথমে ভোজনবিলাসীকে পরীক্ষা করার জন্য রাজা ভাল পাচক ডেকে যতরকমের ভাল খাবার হতে পারে সবরকম রান্নার আদেশ দিলেন। রাজার আদেশে পাচক খুব যত্ন করে নানারকম সুখাদ্য রান্না করলো।

রাজা তখন ভোজনবিলাসীকে সঙ্গে করে খাবার ঘরে উপস্থিত হলেন এবং তাকে আহার করতে বললেন; কিন্তু সে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার কাছে ফিরে এল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছ তো?

সে বললো, না মহারাজ, খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

সে বললো, মহারাজ, ভাতে মরার গন্ধ। আমার মনে হচ্ছে শ্মশানের কাছের কোন ক্ষেতের ধান থেকে ঐ চাল হয়েছে।

রাজা এই কথা শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। ভাবলেন পাগলের প্রলাপ ছাড়া এ আর কিছুই নয়। তিনি তখন কোন কথা না বলে গোপনে ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য ভাণ্ডারীকে আদেশ করলেন।

রাজার আদেশমত ভাণ্ডারী অনুসন্ধান করে রাজাকে জানালেন, মহারাজ, গ্রামের শেষ প্রান্তে যে শ্মশান আছে তার পাশের ক্ষেতের ধান থেকেই ঐ চাল হয়েছে।

রাজা শুনে অবাক হলেন এবং ভোজনবিলাসীকে বাহবা দিয়ে বললেন, তুমি যথার্থই ভোজনবিলাসী।

এরপর রাজা এক সুসজ্জিত শয়ন ঘরে ধবধবে সাদা এক শয্যায় শয্যাবিলাসীকে শুতে দিলেন।

সে অল্পক্ষণ পরেই রাজার কাছে এসে বললো, মহারাজ, শয্যায় আমার শোয়া হলো না।

রাজা বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয্যাবিলাসী বললো, মহারাজ, ঐ শয্যার সাতটি তোষকের নীচে একটি চুল আছে; তাতে আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই উঠে এসেছি।

রাজা হতবাক! এও কি সম্ভব? রাজা নিজে সেই শয়নঘরে ঢুকে বিছানার সাতটি তোষকের নীচে সত্যিই একটা চুল পেলেন।

রাজা খুশি হয়ে তার প্রশংসা করে বললেন, তুমি প্রকৃতই শয্যাবিলাসী।

এরপর রাজা সন্তুষ্ট হয়ে দুই ভাইকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য?

রাজা বললেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

রাজার উত্তর শুনে বেতাল আর একমুহূর্তও না থেকে গাছে গিয়ে ঝুলে পড়লো। কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্য কি তাকে ছেড়ে দেবেন? তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাঁধে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন। আর বেতালও চতুর্বিংশ গল্প আরম্ভ করল।

চতুর্বিংশ গল্প

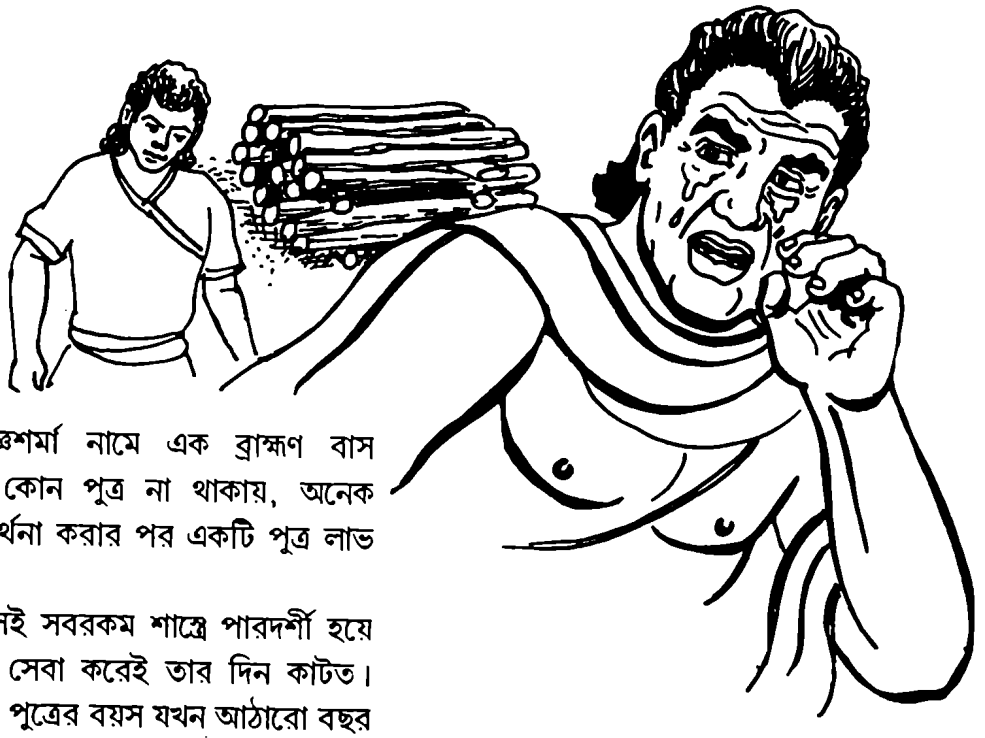

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কোন পুত্র না থাকায়, অনেক দেবতার কাছে প্রার্থনা করার পর একটি পুত্র লাভ করেন।

পুত্র অল্প বয়সেই সবরকম শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। বাবা-মার সেবা করেই তার দিন কাটত। কিন্তু এমন গুণবান পুত্রের বয়স যখন আঠারো বছর তখন তার মৃত্যু হলো।

বাবা-মার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। দু'জনে অনেক কান্নাকাটি করলেন। মৃতদেহ সৎকারের জন্য গ্রামের সীমানায় চিতা সাজালেন।

এক বৃদ্ধ যোগী বহুদিন ধরে ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করছিলেন। তিনি আঠার বছরের ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখে ভাবলেন আমার জীর্ণশীর্ণ দেহ দিয়ে আর কোন কাজই হচ্ছে না। আমি যদি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের দেহে প্রবেশ করি তবে অনেকদিন যোগাভ্যাস করতে পারব। মনে মনে এই সঙ্কল্প করে যোগবলে তিনি সেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ব্রাহ্মণকুমার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ফিরে পেল। যজ্ঞশর্মা পুত্রকে ফিরে পেয়ে আনন্দে হাসতে লাগলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

বেতাল এখানেই গল্প শেষ করে রাজাকে প্রশ্ন করল, মহারাজ, পুত্রকে ফিরে পেয়ে যজ্ঞশর্মা প্রথমে কেন হাসলেন আর পরে কেন কাঁদলেন?

রাজা বললেন, পুত্রকে ফিরে পেয়ে ব্রাহ্মণের আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক, সেই আনন্দে তিনি হেসেছিলেন। কিন্তু তিনি পরদেহপ্রবেশনী বিদ্যা জানতেন; ঐ বিদ্যার প্রভাবে পরক্ষণেই জানতে পারলেন পুত্র পুনর্জীবন লাভ করে নি; যোগী তার যোগ-সাধনার বলে এটা করেছে। এই জন্য পরে কাঁদলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল আর রাজাও তাকে পুনরায় কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও তার পঞ্চবিংশতি গল্প আরম্ভ করল।

পঞ্চবিংশতি গল্প

দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে মহাবল নামে এক ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। প্রতিপক্ষ রাজা প্রচুর সৈন্য নিয়ে রাজধানী অবরোধ করলে রাজা মহাবল তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন না থাকায় ক্রমে সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হলো। তখন নিরুপায় হয়ে মহাবল প্রাণ বাঁচাতে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে গভীর বনে ঢুকলেন।

অনেক পথ হাঁটায় তিনজনই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লেন। তখন রাজা স্ত্রী ও কন্যাকে একটি গাছের তলায় বসিয়ে খাদ্যের সন্ধানে বের হলেন। এদিকে দিনের আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার নেমে এল বনে। কিন্তু মহাবল আর ফিরলেন না। মা ও মেয়ে গুড়িসুরি মেরে কোনরকমে গাছতলায় বসে রইল।

ঐদিনই কুন্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে মৃগয়া করতে ঐ বনে ঢুকেছিলেন।

তাঁরা ঐ গভীর বনের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। এবং আরও বিস্মিত হলেন এই দেখে যে ঐ পায়ের চিহ্ন স্ত্রীলোকের।

পিতা-পুত্র দু'জনে খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যার মুখে দেখলেন দুটি পরমাসুন্দরী নারী গাছের নীচে বসে একে অপরের দিকে চেয়ে কাঁদছে।

এই অবস্থা দেখে তাঁদেরও খুব দুঃখ হলো। তাঁরা

অনেক করে তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং সসম্মানে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর রাজা চন্দ্রসেন বিয়ে করলেন সেই রাজকন্যাকে আর রাজপুত্র বিয়ে করলেন রাণীকে।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, বল রাজা, এদের যখন ছেলেপুলে হবে তখন তাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ হবে?

বেতালের প্রশ্ন শুনে বিক্রমাদিত্য অনেক ভাবলেন কিন্তু ঠিক উত্তরটা এল না তাঁর মনে, তাই তিনি নীরবেই পথ চলতে লাগলেন।

যেমন কথা হয়েছিল, তাতে উত্তর দিতে না পারলে রাজার বুক ফেটে মরে যাওয়া উচিত। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধি, সাহস আর ধৈর্য্য দেখে বেতাল খুব খুশি হয়েছিল। সে কোন ক্ষতি না করে বললো, রাজা, এবার আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোন। আমার কথামত কাজ করলে তোমার উপকার হবে।

শেষের কথা

যক্ষ তোমায় যে রাজা চন্দ্রভানুর কথা বলেছিল, এই মৃতদেহ, যেটা তুমি কাঁধে নিয়ে যাচ্ছ সেটা তারই। আর শ্মশানের সেই সাধু হলো কুমোর যোগী শান্তশীল। সে রাজা চন্দ্রভানুকে মেরে শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল আর এখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমায় খুন করা।

আমি এখনই এই শব ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি এটা ঐ সাধুর কাছে নিয়ে যাও। শবটা পেলেই সে পূজা শুরু করবে, তারপর পূজা শেষ হলে তোমায় বলবে, দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। তুমি যেই মাথা নীচু করে প্রণাম করতে যাবে অমনি সে খড়্গ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে। তাই সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি ও কাজ একদম করতে যাবে না। বলবে, আমি রাজা, কাউকে কোন দিন প্রণাম করি নি। কি ভাবে প্রণাম করতে হয় তা আপনি আমায় দেখিয়ে দিন। তোমার কথা শুনে সন্ন্যাসী যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে, অমনি তুমি খড়্গ দিয়ে এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেলবে। তারপর মৃতদেহটা নিয়ে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে দেবে, তাহলেই তার সমস্ত যোগফল তোমার হবে। তুমি অনেকদিন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারবে। আমি

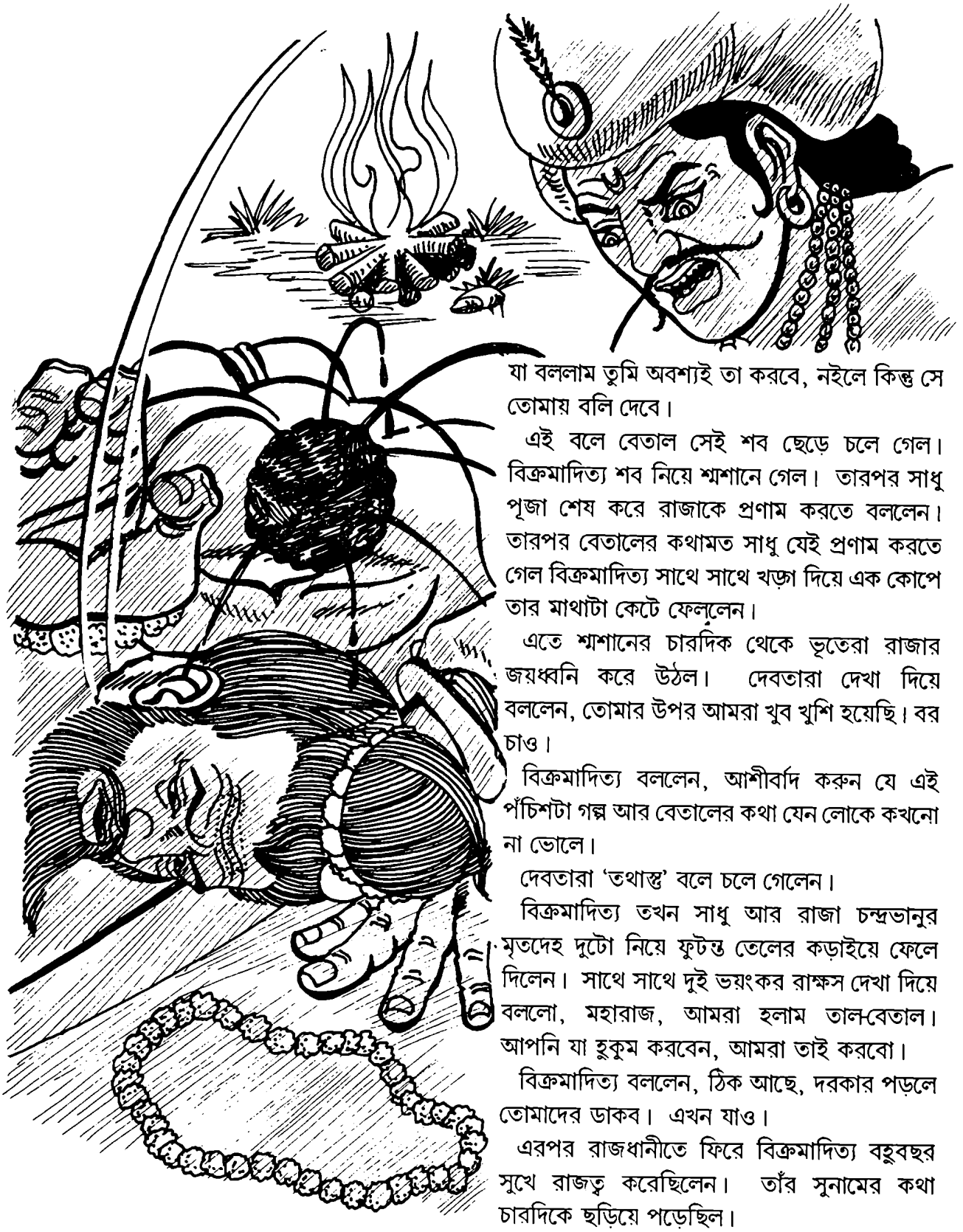

যা বললাম তুমি অবশ্যই তা করবে, নইলে কিন্তু সে তোমায় বলি দেবে।

এই বলে বেতাল সেই শব ছেড়ে চলে গেল। বিক্রমাদিত্য শব নিয়ে শ্মশানে গেল। তারপর সাধু পূজা শেষ করে রাজাকে প্রণাম করতে বললেন। তারপর বেতালের কথামত সাধু যেই প্রণাম করতে গেল বিক্রমাদিত্য সাথে সাথে খড়্গ দিয়ে এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

এতে শ্মশানের চারদিক থেকে ভূতেরা রাজার জয়ধ্বনি করে উঠল। দেবতারা দেখা দিয়ে বললেন, তোমার উপর আমরা খুব খুশি হয়েছি। বর চাও।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আশীর্বাদ করুন যে এই পঁচিশটা গল্প আর বেতালের কথা যেন লোকে কখনো না ভোলে।

দেবতারা 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন।

বিক্রমাদিত্য তখন সাধু আর রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ দুটো নিয়ে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে দিলেন। সাথে সাথে দুই ভয়ংকর রাক্ষস দেখা দিয়ে বললো, মহারাজ, আমরা হলাম তাল-বেতাল। আপনি যা হুকুম করবেন, আমরা তাই করবো।

বিক্রমাদিত্য বললেন, ঠিক আছে, দরকার পড়লে তোমাদের ডাকব। এখন যাও।

এরপর রাজধানীতে ফিরে বিক্রমাদিত্য বহুবছর সুখে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সুনামের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিক্রমাদিত্য ক্রমে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তাল-বেতাল সঙ্গে থাকায় কেউ আর তাঁর সমকক্ষ হতে পারল না। আস্তে আস্তে তিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজা হয়ে উঠলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি একবার কঠোর তপস্যা শুরু করেন। এই তপস্যা ভঙ্গের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র রম্ভা ও উর্বশীকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভাঙতে পারবে তাকে আমি অনেক পুরস্কার দেব।

রম্ভা ও উর্বশী দু'জনেই বললো, প্রভু, আমিই সবচেয়ে ভাল নাচি, আমাকেই পাঠান মুনির তপস্যা ভাঙাতে।

তখন ইন্দ্র পড়লেন মহা সমস্যায়। কারণ দু'জনেই নাচে গানে সমান, কাকে ছেড়ে কাকে পাঠাবেন। আর দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তাই বা কি করে বোঝা যাবে?

নারদ বললেন, মহারাজ, উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন। তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী—তিনিই পারবেন এর মীমাংসা করতে।

নারদের কথায় দেবরাজ তাঁর সারথি মাতলিকে পাঠালেন বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে আসার জন্য। বিক্রমাদিত্য তখনি তার সাথে এলেন। সভা খুব সুন্দর করে সাজানো হল। প্রথম দিন রম্ভা আর দ্বিতীয় দিন উর্বশী নাচ দেখাল।

বিক্রমাদিত্য উর্বশীকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। দেবরাজ এর কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, হাত ও পা যার সমানভাবে চলে সেই নাচে শ্রেষ্ঠ। উর্বশীর নাচে এই গুণগুলি ছিল।

বিক্রমাদিত্য নাচের সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিলেন তাতে দেবরাজ খুবই খুশি হয়ে তাঁকে অনেকরকম পোশাক আর অপূর্ব রত্নখচিত এক সিংহাসন উপহার দিলেন। সিংহাসনে বত্রিশটা পুতুল আছে, তাদের মাথায় পা রেখে সেই সিংহাসনে বসতে হয়।

বিক্রমাদিত্য সেই সিংহাসনটি নিয়ে উজ্জয়িনীতে

ফিরে এলেন। তারপর শুভ দিন দেখে সিংহাসনটি প্রতিষ্ঠিত করে তার উপর বসে রাজ্যপরিচালনা করতে লাগলেন।

এরপর বহুবছর কেটে গেছে। একদিন উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, দাবানল, ধূমকেতু—এই সব দেখা দিতে লাগল। পণ্ডিতরা বললেন, এর মানে রাজার খারাপ সময় এসেছে।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমি একবার তপস্যা করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করি। ভগবান আমায় বলেন, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি অমরত্ব বর চাও। আমি বললাম, ভগবান, যখন কোন আড়াই বছরের মেয়ের ছেলে হবে, তার হাতেই যেন আমি মরি। ভগবান আমাকে ঐ বর দিলেন। সুতরাং বুঝতে পারছেন এ জিনিস হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

কিন্তু পণ্ডিতরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন, মহারাজ, আপনি বরং একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন এমন কোন ছেলে আছে কিনা।

বিক্রমাদিত্য তখন বেতালকে ডেকে হুকুম দিলেন ঐ ধরনের কোন ছেলে আছে কিনা খোঁজার জন্য।

বেতাল ঘুরে এসে খবর দিল, মহারাজ, প্রতিষ্ঠান নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে এমন একটি অদ্ভুত

ছেলে দেখেছি। ছেলেটির নাম শালিবাহন, আর তার বাবার নাম শেষ নাগ। ব্রাহ্মণ বললো, তার মেয়ের বয়স যখন আড়াই বছর, তখন ঐ ছেলেটি জন্মেছিল।

বিক্রমাদিত্য অমনি তলোয়ার হাতে প্রতিষ্ঠান নগরের দিকে চললেন। সেখানে শালিবাহনকে দেখে তলোয়ার নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অমনি শালিবাহন তাঁকে এক লাঠির বাড়ি মারলো। সেই বাড়ির আঘাতে বিক্রমাদিত্য একেবারে উজ্জয়িনীতে এসে পড়লেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য, কারণ তাঁর কোন ছেলেপুলে ছিল না। সবাই হায় হায় করতে লাগল। জানা গেল দু'মাস পরে এক রাণীর ছেলে হবে। তখন মন্ত্রীরা রাজার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাতে লাগলেন। সিংহাসন খালিই রয়ে গেল।

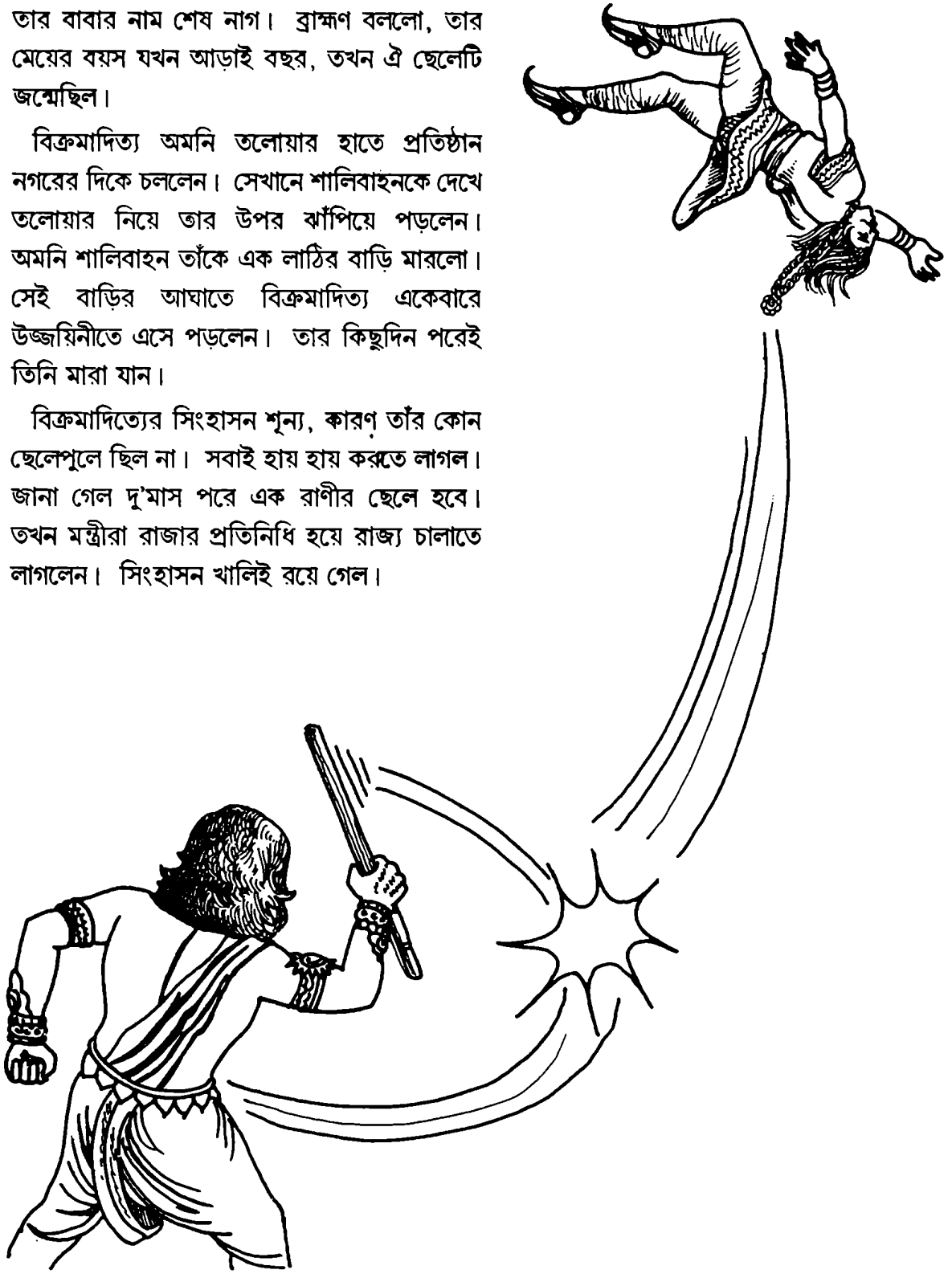

একদিন রাজসভায় দৈববাণী হলো, হে মন্ত্রীবৃন্দ, এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কোন রাজা পৃথিবীতে নেই, তাই এই সিংহাসন কোন পবিত্র জায়গায় রেখে দেওয়া হোক।

সেই মত কাজ করা হলো। মন্ত্রীরা সিংহাসনটি একটা পবিত্র জায়গায় রেখে দিলেন। ক্রমে তার উপর ধূলো বালি জমতে জমতে একেবারে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেল। সবাই তার কথা একেবারে ভুলে গেল।

এই ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে। উজ্জয়িনীতে তখন ভোজরাজ রাজত্ব করছিলেন। যেখানে সেই পবিত্র সিংহাসনটি রাখা হয়েছিল সেখানে এক ব্রাহ্মণ শস্যক্ষেত তৈরি করলেন। অনেক শস্য হলো। উঁচু জায়গায় একটি মাঁচা তৈরি করে পাখিদের তাড়িয়ে শস্য রক্ষা করতেন ব্রাহ্মণ।

একদিন ভোজরাজ রাজকুমারদের সঙ্গে নিয়ে সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ মাঁচার উপর থেকে বললেন, মহারাজ, এই ক্ষেতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়েছে, আপনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে যেমন খুশি গ্রহণ করুন, অশ্বগুলিকে শস্যদানা খেতে দিন। আপনি অতিথি হিসাবে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন বলে আমার জন্ম সার্থক।

রাজা ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে সৈন্যসহ ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেন। তখন ব্রাহ্মণ মাঁচা থেকে নেমে এলেন। তারপর রাজাকে বললেন, মহারাজ, কেন এমন অধার্মিকের মত কাজ করছেন? আপনি ব্রাহ্মণের এই ক্ষেতটি নষ্ট করলেন। কেউ অন্যায় করলে যেখানে আপনি তার বিচার করেন সেখানে আপনি নিজেই অন্যায় কাজ করছেন।

রাজা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে এই সব ভর্ৎসনা শোনার পর যেই ক্ষেতের বাইরে গেলেন অমনি ব্রাহ্মণ পাখি তাড়াবার জন্য সেই মাঁচার উপর গিয়ে উঠলেন। আবার রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, মহারাজ, যাচ্ছেন কেন? এই ক্ষেতে এবার প্রচুর শস্য হয়েছে, আপনার ঘোড়াগুলোকে যতখুশি খেতে দিন।

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজা আবার অনুচরসহ সেই ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেন। আর ব্রাহ্মণও সেই মাঁচা থেকে নেমে এসে আবার আগের মত কথা বলতে লাগলেন।

তখন রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, এই ব্রাহ্মণ যখন মাঁচাতে ওঠেন তখন এঁর শুভবুদ্ধির আবির্ভাব হয়, আবার যখন ঐ মাঁচা থেকে নেমে আসেন তখন এ অন্য মানুষ। একবার ঐ মাঁচাতে উঠে দেখি ব্যাপারটা কি।

রাজা মাঁচাতে উঠলেন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, জগতের দুঃখ দূর করা কর্তব্য, সকল ব্যক্তিরই দারিদ্র্য দূর করা কর্তব্য, আমার রাজ্যে একজনও দরিদ্র থাকবে না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অবশ্য কর্তব্য। রাজা বুঝলেন এই স্থানটি খুবই পবিত্র।

কি করে এই ক্ষেতের মাহাত্ম্য জানা যায় এই চিন্তা করে ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন, ওহে ব্রাহ্মণ, ক্ষেত থেকে তোমার কি পরিমাণ উপার্জন হয়?

ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ, আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আর কি বলব। আপনি যা ভাল মনে করবেন তাই ঠিক হবে।

তারপর রাজা সেই ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে ক্ষেত খোঁড়ার আদেশ দিয়ে গেলেন। এক মানুষ সমান খোঁড়া হলে একটি সুন্দর পাথর দেখা গেল। তার নীচে নানা রত্ন খচিত অতি সুন্দর দেখতে একটি সিংহাসন। সিংহাসনে বত্রিশটা পুতুল রয়েছে। সিংহাসন দেখে রাজা ভোজরাজ খুব খুশি। রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য সিংহাসনটিকে ওঠাতে গেলেন, কিন্তু কিছুতেই ওঠানো গেল না।

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, ব্যাপারটা কি, সিংহাসন তো উঠছে না?

মন্ত্রী বললেন, রাজন, এই সিংহাসন বলি, হোম ও পূজা না দিলে উঠবে না।

তাঁর কথা শুনে রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের বিধানমত সমস্ত অনুষ্ঠান করলেন। তখন সেই সিংহাসন হালকা হয়ে উঠে আসতে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, এই সিংহাসনকে কিছুতেই তোলা যেত না, কিন্তু আপনার বুদ্ধিবলেই এটা সম্ভব হলো। সত্যি বুদ্ধিমানদের কাছে থাকাও পরম সৌভাগ্য।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, যে নিজে বুদ্ধিমান নয়, আবার অন্যের বুদ্ধিও নেয় না, তার সর্বনাশ হয়। আপনি বুদ্ধিমান হয়েও অন্যের কথা শোনেন, সুতরাং আপনার কোনদিনই কোন অসুবিধা হবে না।

মন্ত্রীর কাজই হল রাজাকে সুবুদ্ধি দিয়ে সৎপথে চালনা করা। রাজা যদি কোন অন্যায় কাজ করতে যান, তাকে বাধা দেওয়াও মন্ত্রীর কর্তব্য। যেমন নন্দরাজমন্ত্রী বহুশ্রুত রাজার ব্রহ্মহত্যা বন্ধ করেছিলেন।

ভোজরাজ বললেন, কেমন করে?

মন্ত্রী বললেন, তবে শুনুন সেই কাহিনী।

বিশালা নগরীতে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। সমস্ত বিরোধী রাজাকে তিনি নিজের অধীন করে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই রাজার পুত্রের নাম ছিল জয়পাল। মন্ত্রীর নাম বহুশ্রুত ও স্ত্রীর নাম ভানুমতী।

ভানুমতীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। যখন তিনি সিংহাসনে বসতেন ভানুমতীকে বসাতেন তাঁর পাশে।

মন্ত্রী একদিন রাজাকে বললেন, মহারাজ, আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।

রাজা বললেন, বল।

মন্ত্রী বললেন, মহারাণী ভানুমতী সভায় আপনার পাশে বসেন; শাস্ত্রকারেরা কিন্তু বলেন এটা অনুচিত।

রাজা বললেন, সবই জানি, কিন্তু কি করব, ভানুমতীর প্রতি আমার অনুরাগ প্রবল, একে পরিত্যাগ করে ক্ষণকালও আমার পক্ষে থাকা সম্ভব না।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে এক কাজ করুন। চিত্রকরকে ডাকিয়ে এনে তাকে দিয়ে মহারাণীর একটা ছবি আঁকিয়ে নিন। সেই ছবি সব সময় চোখের সামনে রাখুন।

মন্ত্রীর কথা রাজারও মনে ধরল।

তখনই চিত্রকরকে ডাকা হল। চিত্রকর এলে তাকে বললেন, তুমি ভানুমতীর একটা ছবি এঁকে দাও। ঠিক যেন তাঁর মত হয়।

চিত্রকর বললো, মহারাজ, আমি তাঁকে একবার সামনাসামনি দেখতে পেলেই হুবহু এঁকে দিতে পারব।

চিত্রকরের কথামত রাজা ভানুমতীকে এনে চিত্রকরকে দেখালেন। চিত্রকরও রাণীকে দেখে ভালকরে একটা ছবি এঁকে এনে রাজাকে দেখালেন।

রাজা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে চিত্রকরকে উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন।

একদিন রাজগুরু শারদানন্দ এসে ভানুমতীর ছবি দেখে চিত্রকরকে বললেন, ওহে চিত্রকর, ভানুমতীর সব লক্ষণগুলিই এঁকেছ কিন্তু একটি ভুল থেকে গিয়েছে।

চিত্রকর বললো, কি ভুল হয়েছে বলুন।

শারদানন্দ বললেন, ভানুমতীর বাম পায়ে তিলের মত একটি চিহ্ন আছে, তুমি সেটিকে বাদ দিয়েছ। বাস্তবিকই রাণীর পায়ে ঐ রকম একটা তিল আছে।

রাজা কিন্তু এই কথা শুনে খুব রেগে গেলেন। মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রী, শারদানন্দ রাণীকে অপমান করেছেন। কারণ রাণীর পায়ে কেমন তিল আছে সেটা চিত্রকরকে বলা তাঁর উচিত হয় নি। আমি ওঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলাম। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

মন্ত্রী আর কি করেন! রাজআদেশে তিনি শারদানন্দকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলেন। তখন শারদানন্দ নিজের মনে বললো, মানুষের পূর্বের কোন পুণ্য থাকলে বিপদে তাকে রক্ষা করে।

মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করলেন, এ সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমি কেন ব্রহ্মহত্যা করে পাপের ভাগী হই? এটা করা ঠিক হবে না। এই কথা ভেবে তিনি শারদানন্দকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাটির তলার একটি ঘরে লুকিয়ে রেখে এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ যথাযথ পালন করা হয়েছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রাজকুমার মৃগয়া করার জন্য বনে যাত্রা করলেন। যাত্রার সময় নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। অকালবৃষ্টি, বজ্রপাত, উল্কাপাত। মন্ত্রীর পুত্রের নাম বুদ্ধিসাগর। তিনি বললেন, কুমার জয়পাল, আজ আর মৃগয়ায় যেয়ে কাজ নেই, অনেক অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কুমার জয়পাল বললেন, এইসব কুসংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই।

মন্ত্রীপুত্র বললেন, বুদ্ধিমানরা কিন্তু এগুলোকে মেনে চলেন। শাস্ত্রে আছে— যিনি বুদ্ধিমান তিনি বিষ সেবন, সাপের সঙ্গে খেলা, সাধুদের নিন্দা ও ব্রাহ্মণদের কখনও হিংসা করবেন না।

মন্ত্রীপুত্র এত করে বোঝালেও রাজকুমার তার কথা না শুনে মৃগয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যাইহোক, রাজকুমার বনে গিয়ে অনেক হিংস্র পশু বধ করলেন। একটি কৃষ্ণকায় হরিণ দেখতে পেয়ে তার পিছু ধাওয়া করলেন এবং গভীর বনে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ খেয়াল হল তিনি একা, সঙ্গে কোন সৈন্য নেই। যাকে ধাওয়া করে গভীর বনে প্রবেশ করেছিলেন সেই হরিণও অদৃশ্য। রাজকুমার একা ঘোড়ায় চড়ে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে একটি সরোবর দেখতে পেলেন। সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সেই

গাছের নীচে সবে বসেছেন এমন সময় ভীষণাকৃতি এক বাঘ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সেই ভীষণাকৃতি বাঘকে দেখে ঘোড়া তার সর্বশক্তি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে নগরের পথে ছুটল। রাজপুত্রও দারুণ ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঐ গাছে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু সেই গাছে ছিল একটা ভালুক। ভালুককে দেখে রাজপুত্র আরও ভয় পেয়ে গেলেন।

ভালুক বললো, তোমার কোন ভয় নেই, আমি এই গাছে বাস করি, তুমি আমার অতিথি। তুমি আমার শরণ নিয়েছ, সুতরাং আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। এই বাঘও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ভালুকের আশ্বাস পেয়ে রাজপুত্র খুশি হলেন। বাঘ কিন্তু সেখান থেকে চলে না গিয়ে ঐ গাছের নীচেই বসে রইল।

সূর্য গেল অস্তাচলে। অন্ধকার নেমে এল ঐ বনে। সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত রাজপুত্রের দু'চোখে নেমে এল ঘুম। আর বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না তাঁর পক্ষে। ভালুক তখন তাঁকে বললো, নিদ্রাঘোরে গাছ থেকে পড়ে গেলে তোমার বিপদ হবে, তুমি বরং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও।

অগত্যা রাজপুত্র ভালুকের কোলে মাথা রেখে বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাঘ তখন ভালুককে সম্বোধন করে বললো, ওহে ভালুক, এই ব্যক্তি আবার কোনদিন শিকার করতে এসে আমাদের বধ করবে। এ আমাদের শত্রু, একে কেন রক্ষা করছ? একে তুমি নীচে ফেলে দাও। একে খেয়ে আমি এখান থেকে চলে যাই।

ভালুক বললো, এ যে চরিত্রের লোকই হোক, আজ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই একে রক্ষা করা আমার পবিত্র কর্তব্য। শরণাগতকে বধ করলে মহাপাপ হবে।

একসময় রাজপুত্রের ঘুম ভাঙল। তখন ভালুক রাজপুত্রকে বললো, আশা করি তোমার ক্লান্তি দূর হয়েছে। এখন আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, তুমি সাবধানে থেক। এই কথা বলে ভালুক নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়ল।

এই সময় বাঘ রাজপুত্রকে সম্বোধন করে বললো, রাজকুমার, এই ভালুককে বিশ্বাস করো না। নখই এর অস্ত্র। শাস্ত্রে বলেছে, তীক্ষ্ণ নখ যাদের, তাদের বিশ্বাস করতে নেই, এদের বিশ্বাস করলে বিপদে পড়তে হয়। এই ভালুক আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করে ও নিজেই তোমাকে খাওয়ার মতলব করেছে—সেই কারণেই তোমার সঙ্গে এমন ভাল ব্যবহার করে তোমার মন জয় করার চেষ্টা করছে। সুতরাং এই সুযোগে তুমিই বরং ওকে নীচে ফেলে দাও, ওকে খেয়ে আমি চলে যাই।

রাজপুত্র ভেবে দেখলেন বাঘ ঠিকই বলেছে, তাই তিনি ভালুককে যেই ঠেলে ফেলে দিয়েছেন অমনি পড়তে পড়তে গাছের ডাল ধরে ফেলে নিজেকে রক্ষা করল ভালুক।

এবার রাজপুত্র ভয় পেয়ে গেলেন। ভালুক বললো, ওরে পাপিষ্ঠ, ভয় পাচ্ছ কেন? যেরূপ কর্ম

করেছ তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। এখন থেকে তুমি 'সসেমিরা' বলতে থাক আর পিশাচ হয়ে এই বনে ঘুরে বেড়াও।

সসেমিরা মানে সংকট অবস্থা।

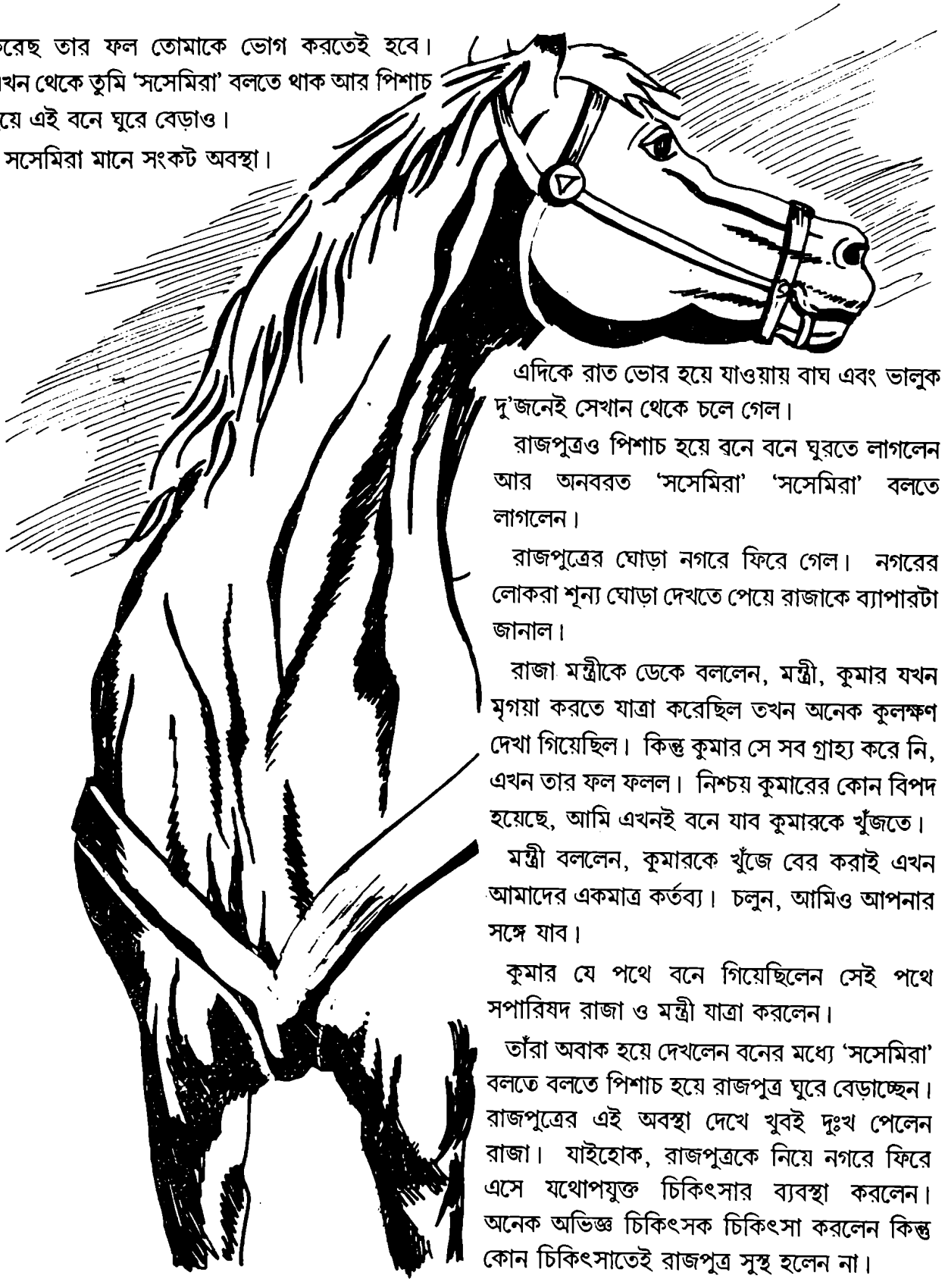

এদিকে রাত ভোর হয়ে যাওয়ায় বাঘ এবং ভালুক দু'জনেই সেখান থেকে চলে গেল।

রাজপুত্রও পিশাচ হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন আর অনবরত 'সসেমিরা' 'সসেমিরা' বলতে লাগলেন।

রাজপুত্রের ঘোড়া নগরে ফিরে গেল। নগরের লোকরা শূন্য ঘোড়া দেখতে পেয়ে রাজাকে ব্যাপারটা জানাল।

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রী, কুমার যখন মৃগয়া করতে যাত্রা করেছিল তখন অনেক কুলক্ষণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কুমার সে সব গ্রাহ্য করে নি, এখন তার ফল ফলল। নিশ্চয় কুমারের কোন বিপদ হয়েছে, আমি এখনই বনে যাব কুমারকে খুঁজতে।

মন্ত্রী বললেন, কুমারকে খুঁজে বের করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

কুমার যে পথে বনে গিয়েছিলেন সেই পথে সপারিষদ রাজা ও মন্ত্রী যাত্রা করলেন।

তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন বনের মধ্যে 'সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচ হয়ে রাজপুত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজপুত্রের এই অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেলেন রাজা। যাইহোক, রাজপুত্রকে নিয়ে নগরে ফিরে এসে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা করলেন কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই রাজপুত্র সুস্থ হলেন না।

রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, এ সময় যদি শারদানন্দ জীবিত থাকতেন তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাজপুত্রকে সুস্থ করে তুলতেন। হায়! তাঁকে বধ করে কি অপরাধই না আমি করেছি। কোন কাজ করার আগে ভেবে চিন্তে না করলে পরে দুঃখ পেতে হয়।

বাড়িতে এসে মন্ত্রী শারদানন্দকে সব কথা বললেন। সব শুনে শারদানন্দ বললেন, মন্ত্রীবর, আপনি রাজার কাছে গিয়ে বলুন, আমার একটি কন্যা আছে, রাজপুত্র যদি তার সঙ্গে দেখা করেন তবে সেই কন্যা রাজপুত্রের আরোগ্যের উপায় বের করবে।

রাজা তখন ঘোষণা করে দিলেন, যে আমার কুমারকে সুস্থ করতে পারবে তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেব।

রাজা সপারিষদ মন্ত্রীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। রাজপুত্রও 'সসেমিরা' বলতে বলতে তাঁদের সঙ্গে এলেন।

শারদানন্দ তখন পর্দার পেছন থেকে বললেন, যে বিশ্বস্ত তাকে বঞ্চনা করার মধ্যে কি নৈপুণ্য আছে? কোলের মধ্যে যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তাকে হত্যা করার মধ্যে কি পৌরুষ আছে?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসেমিরা'-র 'স' বাদ দিয়ে কেবল 'সেমিরা' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন রাজপুত্র।

তখন শারদানন্দ বললেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগরে গেলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, কোথাও তার মুক্তির সম্ভাবনা নেই।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'সসে' পরিত্যাগ করে কেবল 'মিরা' শব্দ বলতে লাগলেন রাজপুত্র।

শারদানন্দ তখন বললেন, যতদিন না মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে ততদিন নরকে থাকতে হয়।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুমার 'সসেমি' পরিত্যাগ করে কেবল 'রা' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

শারদানন্দ তখন বললেন, মহারাজ, কুমারকে যদি সুস্থ করে তুলতে চান তবে ব্রাহ্মণদের দান করুন আর দেবতাদের আরাধনা করুন।

একথা শোনার পর আবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন কুমার। ভালুকের সঙ্গে তিনি যে ব্যবহার করেছেন — সব খুলে বললেন।

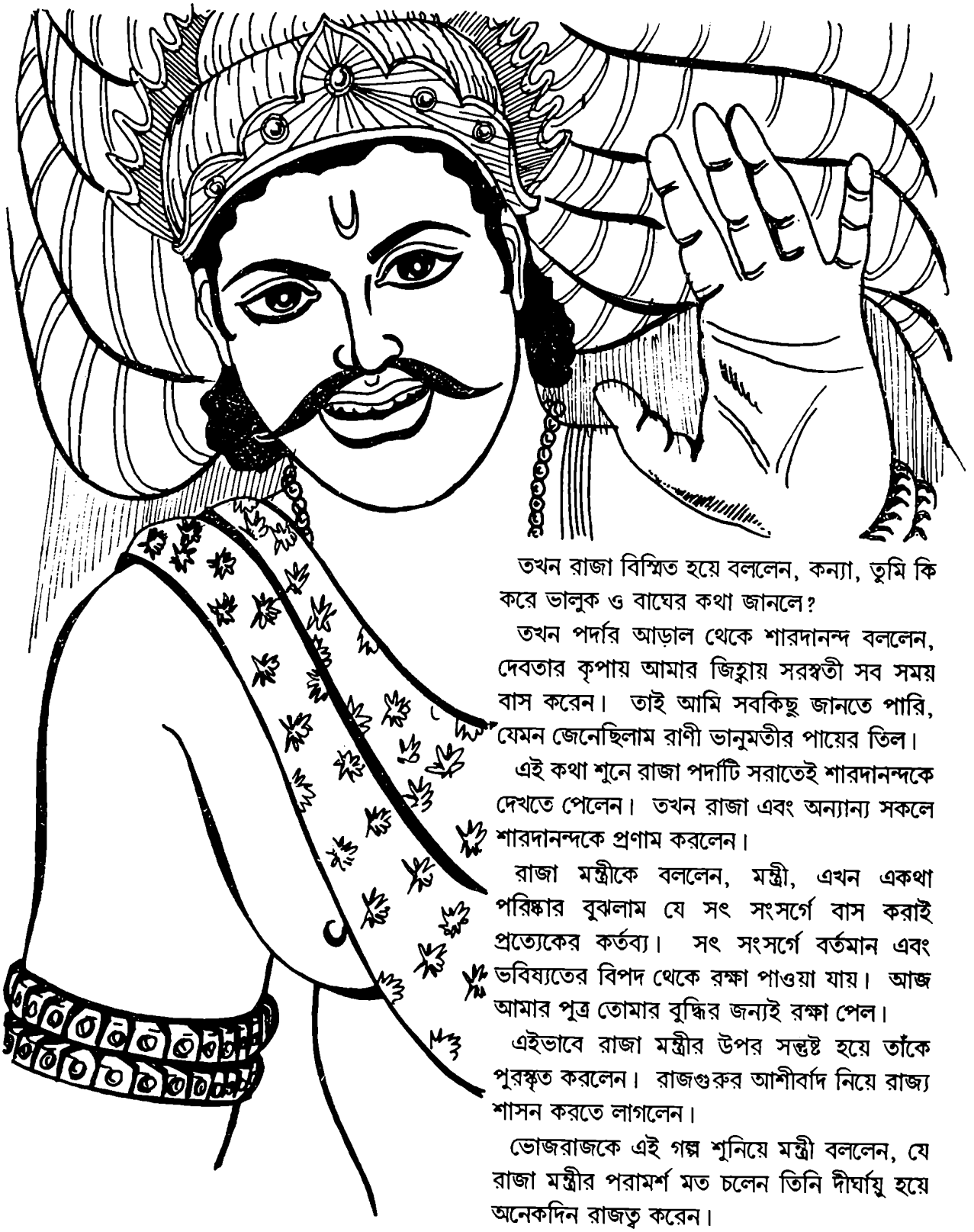

তখন রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, কন্যা, তুমি কি করে ভালুক ও বাঘের কথা জানলে?

তখন পর্দার আড়াল থেকে শারদানন্দ বললেন, দেবতার কৃপায় আমার জিহ্বায় সরস্বতী সব সময় বাস করেন। তাই আমি সবকিছু জানতে পারি, যেমন জেনেছিলাম রাণী ভানুমতীর পায়ের তিল।

এই কথা শুনে রাজা পর্দাটি সরাতেই শারদানন্দকে দেখতে পেলেন। তখন রাজা এবং অন্যান্য সকলে শারদানন্দকে প্রণাম করলেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রী, এখন একথা পরিষ্কার বুঝলাম যে সৎ সংসর্গে বাস করাই প্রত্যেকের কর্তব্য। সৎ সংসর্গে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আজ আমার পুত্র তোমার বুদ্ধির জন্যই রক্ষা পেল।

এইভাবে রাজা মন্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। রাজগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

ভোজরাজকে এই গল্প শুনিয়ে মন্ত্রী বললেন, যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ মত চলেন তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে অনেকদিন রাজত্ব করেন।

প্রথম উপাখ্যান

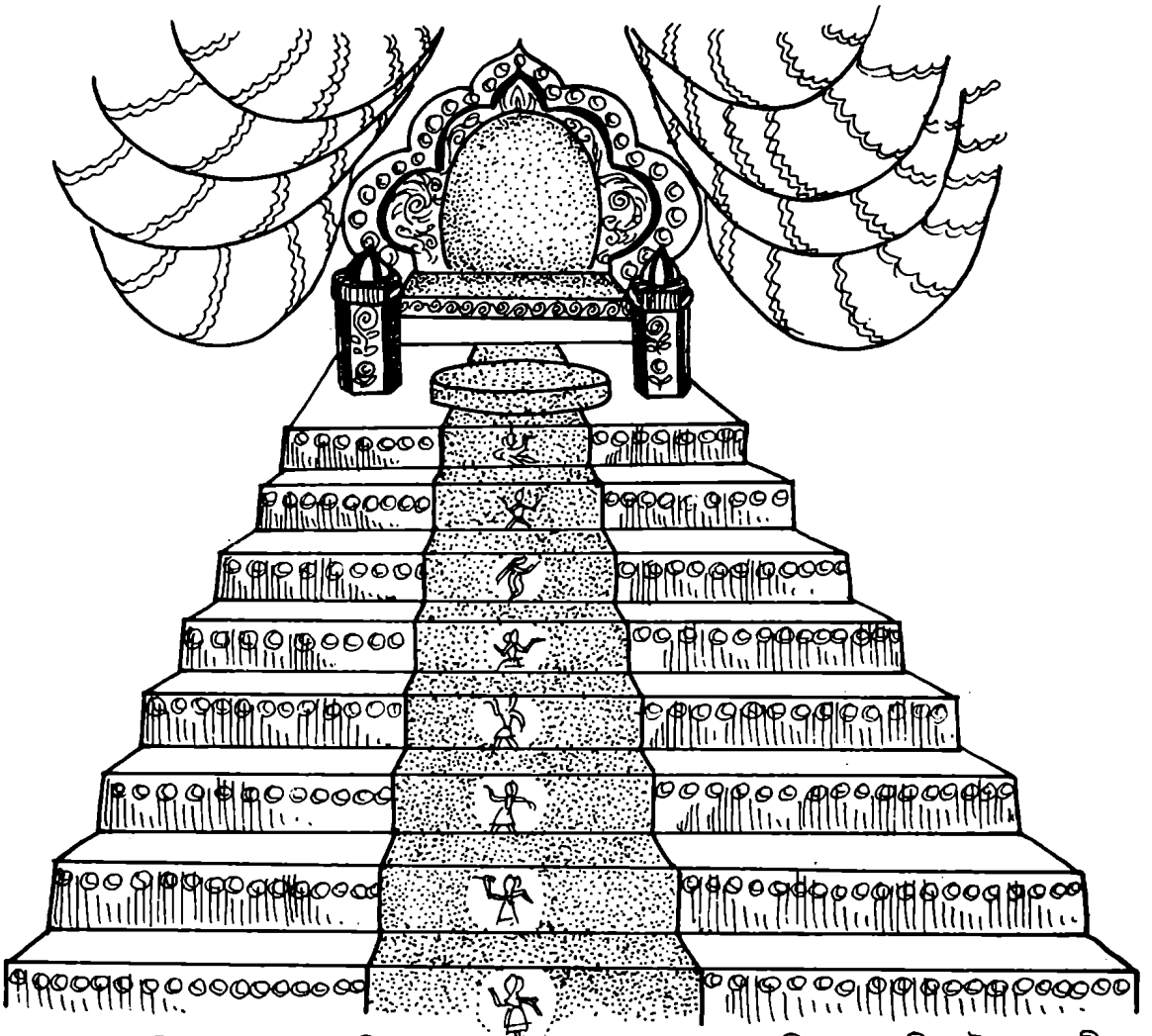

তখন ভোজরাজ মন্ত্রীকে বস্ত্র ও রত্ন দিয়ে সম্মান দেখিয়ে সেই সিংহাসন নগরের মধ্যে আনালেন। এক হাজার থাম বিশিষ্ট একটি মন্দির তৈরি করে তার মধ্যে সেই সিংহাসনটি বসান হল। শুভদিনে রাজা মন্ত্রীদের সাথে সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। পাঠকগণ স্তব পাঠ করে রাজার প্রশংসা করলেন। রাজা গরিব দুঃখী প্রজা ইত্যাদি সবাইকে প্রচুর অর্থ দান করলেন।

তারপর তিনি যখন সিংহাসনে ওঠার জন্য প্রথম পুতুলের মাথায় পা দিলেন অমনি সেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বললো, মহারাজ, আমার নাম মিশ্রকেশী, বিক্রমাদিত্যের মত আপনার যদি সাহস, বীরত্ব, ঔদার্য ইত্যাদি গুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

রাজা বললেন, তুমি যেসব গুণের কথা বললে তার সব গুণই আমার আছে। আমিও সবাইকে দান করেছি।

পুতুল বললো, আপনি নিজের মুখে নিজের

প্রশংসা করেছেন এটা করা উচিৎ নয়। শাস্ত্রে বলে, দুর্জন ব্যক্তিকেই নিজ গুণ ও পরদোষ কীর্তন করতে দেখা যায়, কিন্তু সজ্জন ব্যক্তি পরদোষ কীর্তন করে না। আয়ু, ধন, মন্ত্র, দান, মান ইত্যাদি গোপন রাখা উচিৎ। অতএব নিজে নিজের গুণ কীর্তন বা পরের নিন্দা কখনও করবেন না।

পুতুলের মুখে এই কথা শুনে ভোজরাজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি পুতুলকে বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক, যে নিজ গুণ কীর্তন করে সে প্রকৃতই মূর্খ। যাহোক, এই সিংহাসন যাঁর তাঁর উদারতার কথা বল।

পুতুল বললো, মহারাজ, এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। তিনি সন্তুষ্ট হলে কোটি কোটি সোনার মোহর দান করতেন। কেউ টাকার আশায় এলে তাকে এক হাজার সোনার মোহর দিতেন। কেউ তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করলে তাকে দশ হাজার, মহৎ ব্যক্তিকে এক লক্ষ এবং যার উপর সন্তুষ্ট হতেন তাকে এক কোটি সোনার মোহর দান করতেন। আপনার যদি সেরকম উদারতা গুণ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।

পুতুলের এই কথা শুনে রাজা চুপ করে রইলেন। কিছু বলতে পারলেন না, কারণ তিনি দান করার জন্য অত মোহরই বা পাবেন কোথায়?

সেদিন আর তাঁর সিংহাসনে বসা হল না।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

পরদিন আবার যখন ভোজরাজ সিংহাসনে বসার জন্য দ্বিতীয় পুতুলের মাথায় পা দিয়েছেন, অমনি সেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বললো, মহারাজ, আমার নাম প্রভাবতী, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মত ধৈর্য গুণ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, সেই বিক্রমাদিত্যের কি রকম ধৈর্যগুণ ছিল তা আমায় বল।

পুতুল বললো, মহারাজ, একবার রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যপালন করতে করতে চরদের বললেন, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণে বের হও, এবং যেখানে যত আশ্চর্য জিনিস দেখবে আমার কাছে এসে বলবে। আমি তখনি সেখানে যাব।

চররা চারদিকে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদিন পর এক চর এসে বললো, মহারাজ, চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে এক তপোবনে একটি দেবালয় আছে। সেখানে পাহাড় থেকে পরিষ্কার জলের ধারা নেমে আসছে। এই জলে স্নান করলে সব পাপ দূর হয়ে যায়। আর সেখানে একজন ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি রোজ হোমকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছেন। কত বছর যে তিনি এ কাজ করছেন কেউ জানে না। রোজ কুণ্ডের ধারে ছাইয়ের ঢিপি হয়ে থাকে। তিনি কারো সাথে কথা বলেন না। এরকম আশ্চর্য জিনিস আমি কোথাও দেখি নি।

ব্যাপারটা শুনে রাজার খুব কৌতূহল হল। তিনি চরের সাথে সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি বললেন, এই

স্থানটি অতি পবিত্র। এ রকম স্থানেই দেবী জগদম্বা থাকেন। এ রকম স্থান দেখলেও পুণ্য হয়।

তারপর রাজা সেই আকাশ থেকে নেমে আসা জলে স্নান করে দেবীকে প্রণাম করলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি কত বছর এই পুণ্য কাজ করছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, যে সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল রেবতী নক্ষত্রে ছিল, সেই সময় থেকে আমি এই হোম করছি। এখন সপ্তর্ষিমণ্ডল অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিত। এই কাজে আমার একশ' বছর পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু তবুও দেবতা আমার প্রতি খুশি হলেন না।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে স্বয়ং দেবতাকে স্মরণ করে সেই হোমকুণ্ডে নিজে আহুতি দিলেন। তাতেও দেবতা প্রসন্ন হলেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বললেন, দেবী, তোমায় প্রসন্ন করার জন্য আমি আমার এই মাথা তোমায় নিবেদন করলাম। এই বলে তিনি যখন নিজের গলায় খড়্গ বসাতে যাবেন অমনি দেবী তাঁর হাতটি ধরে বললেন, রাজা, আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর চাও।

রাজা বললেন, দেবী, এই ব্রাহ্মণ বহুকাল ধরে এখানে হোম করছেন তবু তুমি কেন এঁর প্রতি প্রসন্ন হচ্ছ না? আমার উপরই বা এত শীঘ্র প্রসন্ন হলে কেন?

দেবী বললেন, রাজা, এই ব্রাহ্মণ হোম করছে ঠিকই কিন্তু এর তেমন কোন একাগ্রতা নেই, সেইজন্য আমি প্রসন্ন হতে পারি নি। শাস্ত্রে আছে— আঙ্গুলের ডগা দিয়ে যে জপ করা হয় বা যে জপ ব্যস্তভাবে করা হয় সে সবই বিফল হয়। দেখ, কাঠে, পাথরে বা মাটির পুতুলে দেবতা বাস করেন না, মনের ভাবেই দেবতা থাকেন।

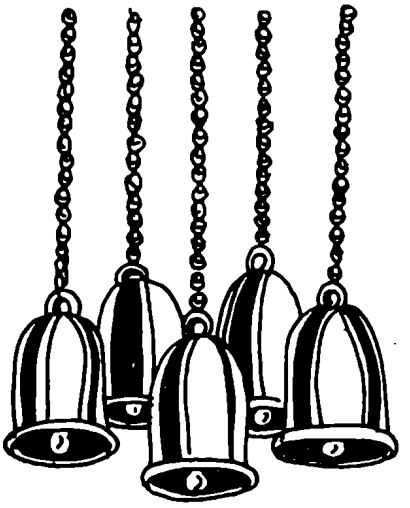

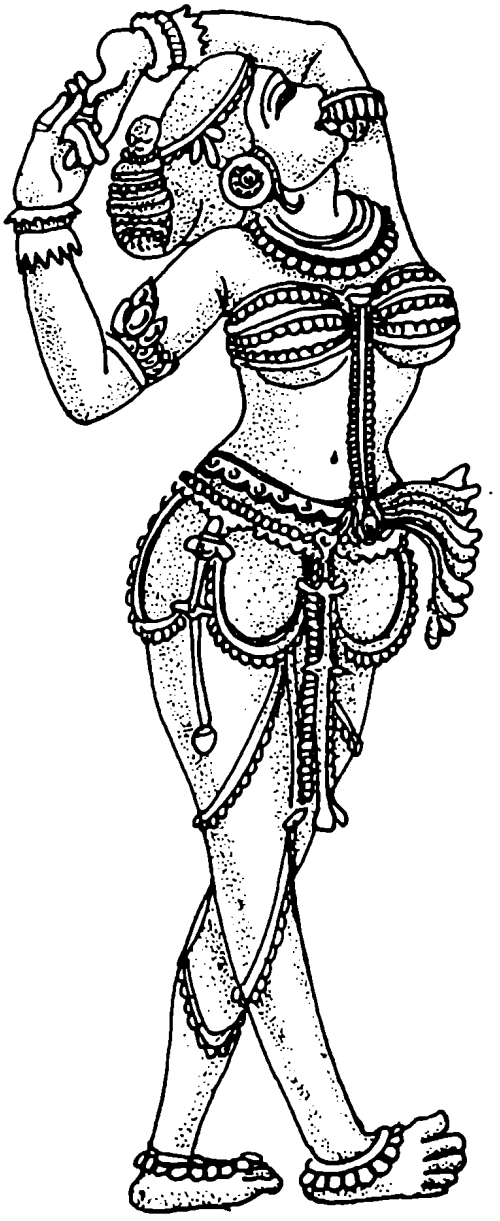

রাজা বললেন, দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তাহলে এই ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

দেবী বললেন, রাজা, তুমি পরোপকারী গাছের মত নিজে কষ্ট সহ্য করে অন্যের পরিশ্রমের ফল পূর্ণ করছ। শাস্ত্রে আছে, গাছ কঠিন রৌদ্রতাপ সহ্য করে পরকে ছায়া দেয়, পরের উপকারের জন্য ফল দান করে। পরের উপকারের জন্য নদী বয়ে যায়, পরের উপকারের জন্য গাভীরা দুধ দেয়। সুতরাং পরের উপকারের জন্যই এ জীবন। যে পরোপকার করে তার জীবন সার্থক হয়।

এইভাবে রাজার প্রশংসা করে দেবী ব্রাহ্মণের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। রাজাও নিজের নগরে ফিরে এলেন।

এই বলে পুতুল ভোজরাজকে বললো, মহারাজ, আপনার যদি এমন ধৈর্য আর একাগ্রতা থাকে তবে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।

রাজা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তৃতীয় উপাখ্যান

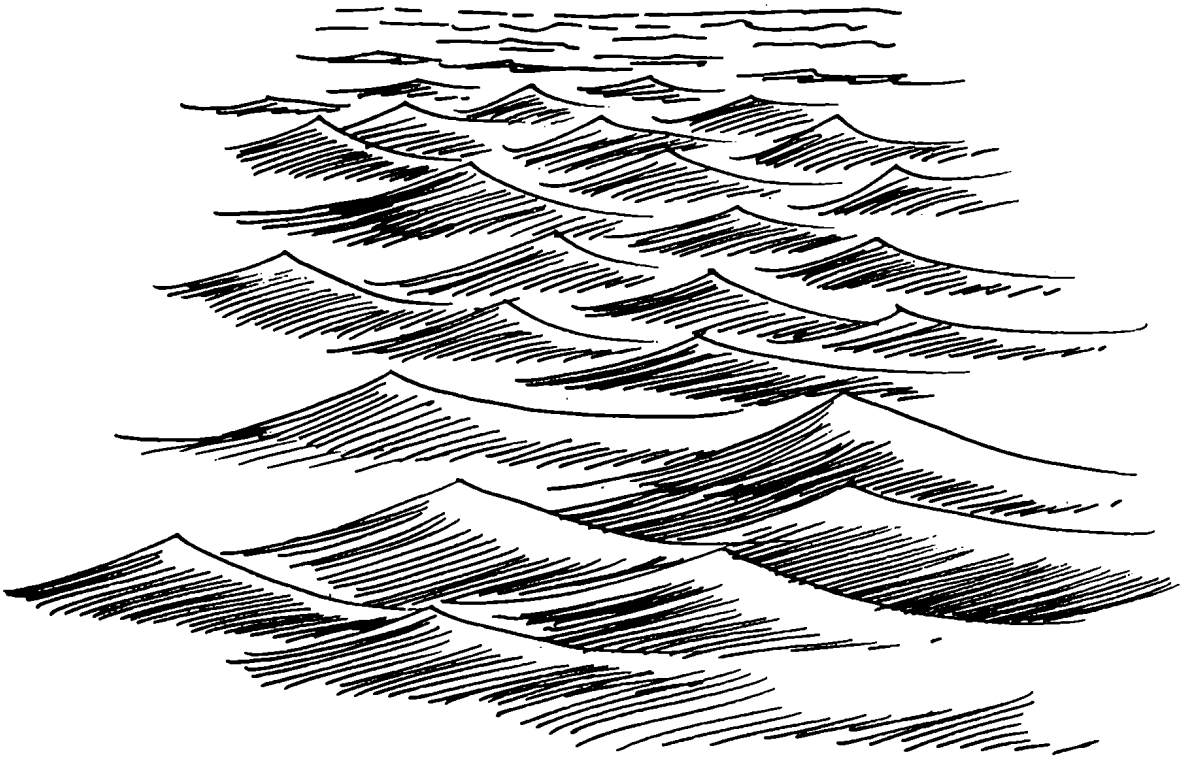

পরদিন রাজা আবার যখন সিংহাসনে ওঠার জন্য তৃতীয় পুতুলের মাথায় পা দিলেন, তখন সেই পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম সুপ্রভা, আপনি কি রাজা বিক্রমাদিত্যের মত আপন-পর ভেদ ত্যাগ করেছেন? করে থাকলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ বললেন, সেই রাজার আপন-পর ভেদের কথা বল।

পুতুল বললো, একদিন বিক্রমাদিত্য চিন্তা করলেন, এই সংসার অসার, কবে কার কি ঘটে তার ঠিক নেই। সুতরাং যদি উপার্জিত অর্থ দান বা ভোগ না করা যায় তাহলে সেই উপার্জন বিফল। অতএব সৎপাত্রে দানই একমাত্র উপায়। শাস্ত্রে আছে— অর্থ হয় ভোগ করতে হয়, নয় দান করতে হয়, আর কোনটাই না করলে বিনাশ হয়। জলাশয়ে যে জল সঞ্চিত থাকে তা পরকে দান করার জন্য, তেমনি উপার্জিত অর্থও দানের জন্য।

এই ভেবে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। শিল্পীরা সুন্দর মন্দির তৈরি করল, যজ্ঞের সব রকম সামগ্রী প্রস্তুত করা হল। দেবতা, মুনি, যক্ষ ইত্যাদি সকলে নিমন্ত্রিত হলেন।

সমুদ্রকে নিমন্ত্রণের জন্য এক ব্রাহ্মণ গেলেন সাগরতীরে। সেই ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে গিয়ে ষোড়শ

উপাচারে সমুদ্রেব পূজো করে বললেন, হে সমুদ্র, বিক্রমাদিত্যর হয়ে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। এই বলে সাগরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলেন। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না।

অবশেষে হতাশ হয়ে ব্রাহ্মণ যখন ফেরার জন্য সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি সমুদ্র এক সাধুর বেশে তাঁর সামনে এসে বললেন, বিক্রমাদিত্য আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন। এতে আমি সম্মানিত হলাম। দূরে থাকলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং কাছে থাকলে বন্ধুত্ব আবার হয়, এ ভুল। বন্ধু দূরে থাকলেও তার প্রতি ভালবাসা কম হয় না। এখানে আমার কতকগুলি কাজের জন্য যেতে পারছি না আমি, এই যজ্ঞে ব্যয়ের জন্য বিক্রমাদিত্যকে চারটি রত্ন দিলাম। প্রথমটির সাহায্যে ধনরত্ন পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তৃতীয়টির সাহায্যে ঘোড়া ও সৈন্য পাওয়া যায় আর চতুর্থটির সাহায্যে অলঙ্কার পাওয়া যায়।

তারপর ব্রাহ্মণ সেই চারটি রত্ন নিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন। তখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য তাঁর সব ধনরত্ন দান করে দিয়েছেন। কিছুই বাকী নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণকে কী দেবেন? তখন তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, এই চারটির মধ্যে তোমার যেটা পছন্দ, সেটা নাও।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি বাড়ি গিয়ে একবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

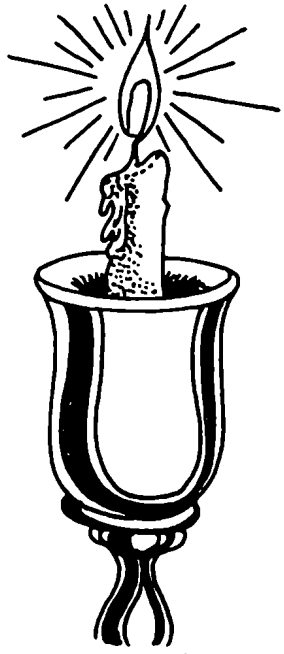

রাজা বললেন, তবে তাই কর।

ব্রাহ্মণ তখন বাড়ি গিয়ে সব কথা বললেন। শুনে তাঁর ছেলে বললেন, যে রত্নের সাহায্যে সৈন্য পাওয়া যায় সেটাই নিন। কারণ তাহলে সুখে রাজত্ব করা যাবে।

তাঁর স্ত্রী বললেন, যে রত্নের সাহায্যে খাদ্য পাওয়া যায় সেটাই নাও। কারণ খাবারের জন্যই সবাই বেঁচে আছে।

পুত্রবধূ বললেন, যে রত্নের সাহায্যে অলঙ্কার পাওয়া যায় সেটাই নিন। কারণ অলঙ্কারের সাহায্যে দেবতাদেরও প্রীতি লাভ করা যায়।

ব্রাহ্মণ নিজে বললেন, যে রত্নের সাহায্যে ধন পাওয়া যায়, সেটাই নেওয়া উচিৎ। কারণ ধন দিয়ে সব হয়।

ব্রাহ্মণ তখন রাজার কাছে এসে চারজনের মতের কথা বললেন। রাজা তখন তাঁকে চারটি রত্নই দান করলেন।

পুতুল গল্প শেষ করে ভোজরাজকে বললো, মহারাজ, আপনি যদি এমন দাতা হন তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্থ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ চতুর্থ পুতুলের মাথায় পা দিতেই সেই পুতুল জীবন্ত হয়ে বললো, মহারাজ, আমার নাম ইন্দ্রসেনা, প্রথমে আমার গল্পটা শুনুন।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সকল গুণ ও জ্ঞান তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর কোন ছেলে ছিল না। মনের দুঃখে তাঁদের দিন কাটে। একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন, মাথায় জটা ও ষাঁড়ের পিঠে চড়ে মহাদেব তাঁকে বলছেন, তুমি প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহলে ছেলে পাবে।

সকালে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধদের স্বপ্নের কথা বললেন। বৃদ্ধরা বললেন, এ স্বপ্ন সত্য। অতএব তুমি যদি এই অনুষ্ঠান কর তাহলে তোমার ছেলে হবে।

তাঁদের কথা শুনে ব্রাহ্মণ বেশ ঘটা করে প্রদোষ ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। মহাদেবও সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি সুন্দর পুত্র দিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের নাম রাখলেন দেবদত্ত।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ছেলের মুখে ভাত দিলেন। তারপর সেই ছেলে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল।

দেবদত্তের বয়স যখন ষোল বছর, তার বাবা তার বিয়ে দিলেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থে যাবার সময় দেবদত্তকে বলে গেলেন, কখনও নিজধর্ম পরিত্যাগ করবে না, কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না, সবাইকে দয়া করবে, ভগবানের প্রতি ভক্তি রাখবে, নিজ সম্পত্তি অনুসারে ব্যয় করবে, সাধুদের সেবা করবে এবং খারাপের সঙ্গে মিশবে না। এইভাবে থাকলে তুমি জীবনে শান্তি পাবে।

এই বলে ব্রাহ্মণ তীর্থে বেরিয়ে গেলেন। দেবদত্ত তাঁর পিতার উপদেশ মত দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন তিনি হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গেলেন। তিনি যখন কাঠ কাটছিলেন তখন রাজা বিক্রমাদিত্য শিকারে বেরিয়েছিলেন। তিনি শিকার করতে একটি শুয়োরের পেছন পেছন ছুটে সেই

গভীর বনে এসে পড়লেন, আর বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন দেবদত্তের সঙ্গে রাজার দেখা হয়। রাজা দেবদত্তকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করায় দেবদত্ত তাঁকে সযত্নে নগরে পৌঁছে দিলেন। রাজা এতে খুশি হয়ে দেবদত্তকে রাজকার্যের মর্যাদাপূর্ণ কাজ দিলেন।

এই ঠিক করে দেবদত্ত একদিন রাজার ছেলেকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে তার গায়ের কয়েকটি গয়না চাকরকে দিয়ে স্যাকরার কাছে বিক্রী করতে পাঠালেন।

এদিকে রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, রাজার ছেলেকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সারা নগরে এই কথা রটে গেল। রাজাও ছেলের খোঁজ করতে রাজপুরুষদের চারপাশে পাঠালেন।

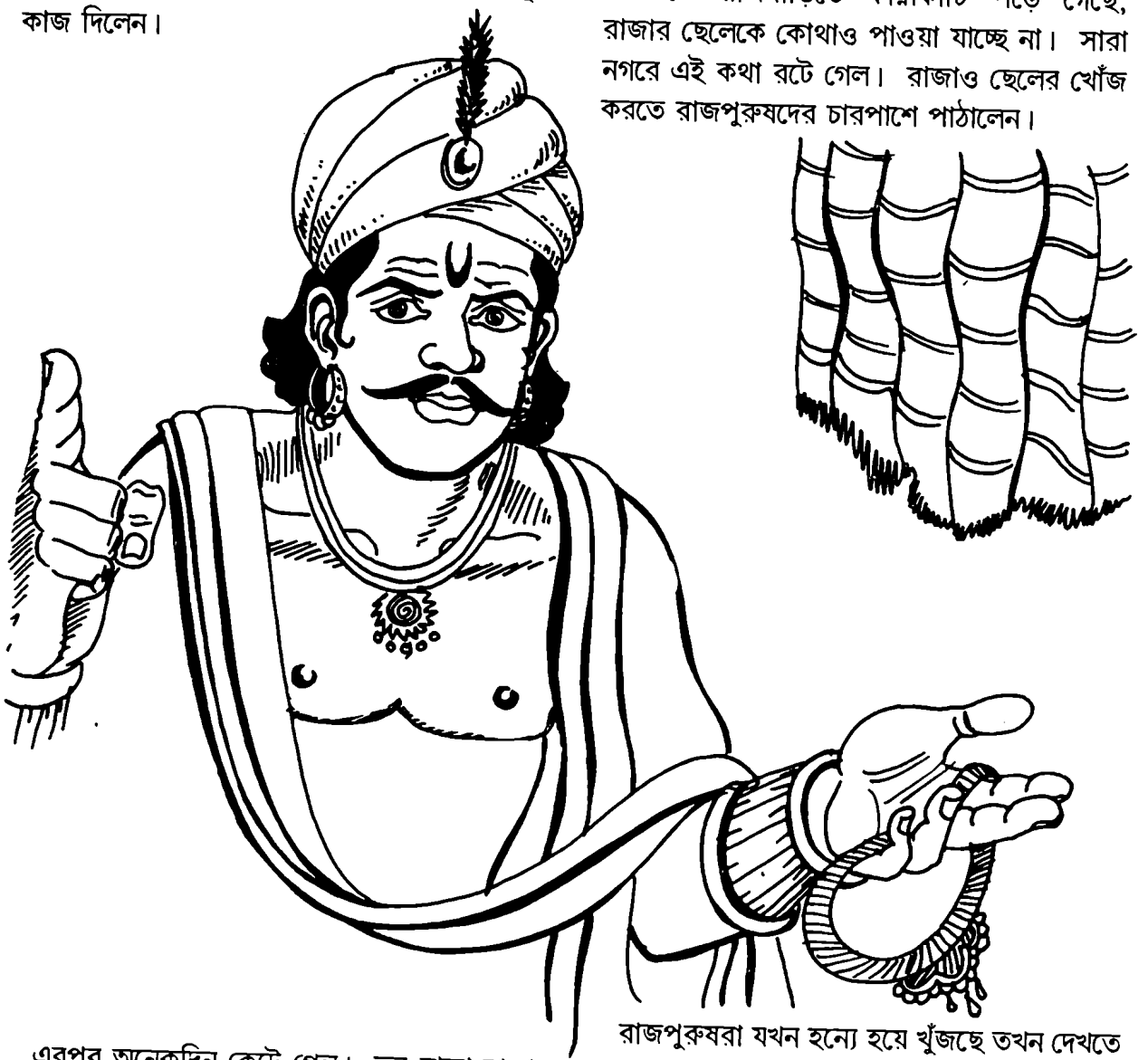

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। তবু রাজা মাঝে মাঝে বলতেন, কী করে আমি দেবদত্তের ঋণ শোধ করব। এই বলে তিনি দুঃখ করতেন। দেবদত্ত এই কথা শুনে ভাবলেন রাজার এই দুঃখটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

রাজপুরুষরা যখন হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন দেখতে পেল দেবদত্তের চাকরের হাতে রাজকুমারের গয়না। তারা সেই চাকরকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে এল।

জেরা করতে চাকরটি বললো, আমি দেবদত্তের চাকর, তিনি আমায় এগুলো বেচতে বলেছেন। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।

রাজা তখন দেবদত্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবদত্ত, এই গয়না আপনার হাতে কে দিল?

দেবদত্ত বললেন, কেউ দেয় নি, আমি নিজেই টাকার লোভে কুমারকে বধ করে সমস্ত গয়না নিয়ে এই চাকরের হাত দিয়ে বিক্রির জন্য পাঠিয়েছিলাম। এখন আপনার যা খুশি তাই করুন।

এই শুনে সভার কেউ বললো, এই লোকটা সর্বশাস্ত্রবিদ হয়েও এমন পাপ কাজ করল! কেউ বললো, মানুষ লোভে পড়ে কি না করতে পারে।

তখন রাজপুরুষরা বললো, মহারাজ, এ শিশুহত্যা করেছে, আবার সোনাচোর। অতএব একে একশত খণ্ড করে চিলকে দিয়ে খাওয়ানোর হুকুম দিন।

তাদের একথা শুনে বিক্রমাদিত্য বললেন, ইনি আমার আশ্রয়ে আছেন, একদিন আমায় বনের মধ্যে পথ দেখিয়ে মহা উপকার করেছেন, আশ্রিতের দোষ গুণ বিচার করা সৎ ব্যক্তির কর্তব্য নয়। আমার পূর্বের কর্মফলের জন্যই আমি ছেলেকে হারিয়েছি। আমি বুঝলাম, উপকারী একবার উপকার করলে তার ঋণ কোনদিনও শোধ করা যায় না।

বিক্রমাদিত্য দেবত্তকে টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি উপহার দিয়ে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

দেবদত্ত তখন রাজকুমারকে নিয়ে এসে রাজাকে দিলেন। এই দেখে সভার সকলে স্তম্ভিত। রাজা অবাক হয়ে বললেন, এ কি ব্যাপার?

দেবদত্ত বললেন, আপনি আগে বলেছিলেন, আমার উপকার থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। সে কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য আমি এ কাজ করেছিলাম। এখন আপনার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মাল। মহারাজ, আপনার মত মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর একজনও নেই।

পুতুল এই গল্প শেষ করে বললো, মহারাজ, যদি আপনার এমন পরোপকার ও ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম সুদতী. বিক্রমাদিত্য যখন রাজত্ব করতেন তখন এক রত্নবণিক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে একটি মহামূল্যবান রত্ন উপহার দিলেন। রাজা সেই রত্নটি দেখে তা পরীক্ষা করার জন্য জহুরীদের ডেকে বললেন, এই রত্নটির মূল্য কত তা আমাকে জানাও।

তারা সেই রত্ন পরীক্ষা করে বললো, মহারাজ, এ অমূল্য রত্ন, যদি এর সঠিক মূল্য না জেনে ক্রয় করেন তবে মহা অনিষ্ট ঘটবে।

তাদের কথা শুনে রত্নবণিকের কাছে জানতে চাইলেন এ রকম রত্ন আর আছে কিনা।

রত্নবণিক বললেন, মহারাজ, এমন রত্ন এখন আমার সঙ্গে নেই বটে তবে বাড়িতে আরো দশটি আছে। যদি আপনার প্রয়োজন হয় তবে দাম ঠিক করে নিয়ে নিতে পারেন।

রাজার আদেশে পরীক্ষকরা পরীক্ষা করে দাম ঠিক করলো—এক একটি রত্নের দাম ছয় কোটি সোনার মোহর।

রাজা সেই পরিমাণ টাকা সঙ্গে দিয়ে বিশ্বাসী একজন মণিকারকে পাঠালেন রত্নবণিকের বাড়িতে। বলে দিলেন আট দিনের মধ্যে রত্নসহ ফিরে এলে

তোমাকে উপযুক্ত উপহার দেওয়া হবে।

সে বললো, মহারাজ, আট দিনের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। যদি ফিরে না আসতে পারি তবে আপনি আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

এই কথা বলে সে রত্নবণিকের সঙ্গে তাঁর বাড়ির পথে রওনা হল।

বণিক তাকে দশটি রত্ন দিলে সে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন পথে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। প্রবল বৃষ্টিতে নদীর জল দুই পাড় উপচে বইতে লাগল। তাই সে নদী পার হতে না পেরে একজন নাবিককে বললো, তুমি আমাকে নদী পার করিয়ে দাও।

নাবিক বললো, এখন জলস্রোত খুব জোরে বইছে, এ অবস্থায় নদী পার হওয়া বিপজ্জনক। পূর্ণ নদীর জল, রাজার আদর ও বণিকের স্নেহ এর কোনটাকেই বিশ্বাস করা উচিত কাজ নয়।

মণিকার বললো, তোমার সব কথাই ঠিক, কিন্তু আমার এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যে এসব কথা মানলে চলবে না।

নাবিক বললো, কি তোমার এমন বিশেষ কাজ?

মণিকার বললো, আমার কাছে দশটি রত্ন আছে, যদি ঐ রত্ন নিয়ে আজ রাজার কাছে উপস্থিত না হতে পারি তবে মহারাজ খুব রাগ করবেন।

নাবিক বললো, আমি তোমাকে এই বিপজ্জনক নদী পার করে দিতে পারি যদি তুমি ঐ থেকে পাঁচটি রত্ন আমাকে দাও।

অন্য উপায় না দেখে মণিকার তাকে পাঁচটি রত্ন দিয়ে নদী পার হল এবং রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে অন্য পাঁচটি রত্ন দিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পাঁচটি রত্ন এনেছ কেন? অবশিষ্ট পাঁচটি রত্ন কি করলে?

মণিকার তখন সব কথা খুলে বললো। তারপর বললো, আপনার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম আট দিনের মধ্যে আপনাকে রত্ন এনে দেব। এই অবস্থায় বাধ্য হলাম নাবিককে পাঁচটি রত্ন দিতে।

রাজা মণিকারের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ঐ পাঁচটি রত্নও তাকে দান করলেন।

গল্প শেষ করে পুতুল ভোজরাজকে বললো, এমন উদারতা যদি আপনার মধ্যে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

পরদিন রাজা আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম অনঙ্গনয়না। আগে আমার কথা শুনুন। একবার চৈত্র মাসে বসন্ত উৎসব কালে বিক্রমাদিত্য রাণীদের নিয়ে প্রমোদবনে গেলেন সেখানে কয়েকদিন উৎসব করতে। সেই বনে ছিল নানা সুন্দর সুন্দর গাছ। গাছের ডালে ডালে ফুল। সমগ্র বনটা সুন্দর কারুকার্য করা পাথর দিয়ে বাঁধানো।

বনের কাছে চণ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির ছিল। সেখানে একজন ব্রহ্মচারী বাস করতেন। একদিন তিনি মনে মনে ভাবলেন, তপস্যা করে করে এই মানব জীবনটা বৃথাই কাটালাম। একবার স্বপ্নেও জানলাম না বিষয়সুখ কি জিনিস। আমার পরম সৌভাগ্য যে ঠিক এই সময়েই রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁর কাছে একখণ্ড ভূমি দান হিসাবে চেয়ে নিয়ে কোন সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে পরম সুখে দিন কাটাব।

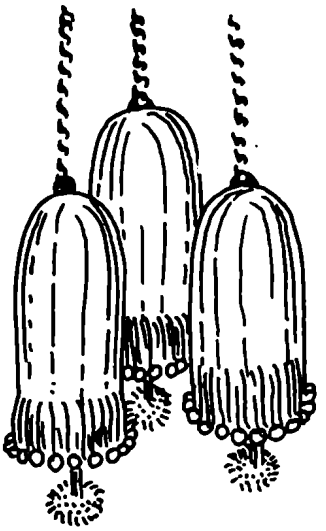

মনে মনে এই চিন্তা করে ব্রহ্মচারী রাজাকে গিয়ে বললেন, আমি এখানেই চণ্ডিকার পূজা করে থাকি। আজ পঞ্চাশ বছর তাঁর সেবা করছি। আমি এতদিন ব্রহ্মচারী হয়েই ছিলাম। আজ রাত্রিশেষে দেবী এসে আমায় বললেন, হে ব্রহ্মচারী, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি এখন বিয়ে করে সংসারী হও। তুমি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে তোমার ইচ্ছা প্রকাশ কর, তিনি তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রহ্মচারীর সব কথা শুনে বুঝলেন এই ব্রহ্মচারী মিথ্যা কথা বলছেন, কিন্তু তবু এই ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছেন। এঁর ইচ্ছা পূরণ করতে হবে।

তখন রাজা সেখানে একটা নগর তৈরি করে সেই ব্রহ্মচারীকে তা দান করলেন। সেই সঙ্গে একশো জন রাণী, পঞ্চাশটি হাতি, পাঁচশত ঘোড়া, চার হাজার সৈনিক দিলেন। সেই নগরের নাম রাখলেন চণ্ডিকাপুর। প্রার্থীকে মিথ্যাবাদী জেনেও তিনি তার ইচ্ছা পূরণ করেন।

গল্প শেষ করে পুতুল রাজাকে বললো, হে মহারাজ, আপনার মধ্যে যদি এই উদারতা ও গুণ থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সপ্তম উপাখ্যান

পরের দিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম কুরঙ্গনয়না, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রজারা সুখে বাস করত। রাজ্যে দুর্জন লোক কেউ ছিল না। সকলেই পরোপকার করতে চাইত। পরের উপর অপবাদ দেওয়াকে ঘৃণা করত। সব সময় সত্য কথা বলত। জীবের প্রতি দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, সকলেরই এই সব গুণ ছিল। রাজার অনুগ্রহে সকলেই সুখে বাস করত।

সেই নগরে ধনদ নামে এক বণিক বাস করত। তার অতুল ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু এত ঐশ্বর্য থাকলেও ধনদের সবকিছুর উপর বিতৃষ্ণা দেখা দিল। বণিক ভাবতে লাগল, সংসার অসার। আশ্রিত বা অনাশ্রিত, বন্ধু-বান্ধব মাত্রেই বন্ধনের কারণ। তাই সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে পবিত্র ধর্মপথে চলতে হবে। শাস্ত্রেও আছে ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্ম তাকে রক্ষা করে। সুতরাং ধর্মই মানুষের প্রকৃত বন্ধু এবং ধার্মিক অপেক্ষা সুখী ও বিদ্যান আর কেউ হয়

না। অতএব ধর্ম সংগ্রহের জন্য উপার্জিত ধন সৎপাত্রে দান করা উচিৎ। সৎপাত্রে দান করলে সেই ধন বহুগুণ হয়।

এমনিভাবে বিচার বিবেচনা করে ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে গোদান, কন্যাদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান ও জলদান প্রভৃতির বিধি ও মাহাত্ম্য জেনে সৎপাত্রে ঐ সমস্ত দান করতে আরম্ভ করল। এই সব করার পর তার মনে হল, আমার এই দান তখনই সফল হবে যখন দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করব। মনে মনে এই কথা ভেবে বণিক দ্বারকার পথে রওনা হল।

সমুদ্রতীরে গিয়ে নাবিককে ডেকে তাকে প্রচুর অর্থ দান করে ভিক্ষু, যোগী, বিদেশী, অনাথ ও দীনদরিদ্রদের সঙ্গে নৌকোয় চড়ে তাদের সঙ্গে মধুর আলাপ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল।

একদিন সে দেখল সমুদ্রের মধ্যে একটি ছোট দ্বীপে একটি দেবমন্দির রয়েছে। তখন সেই মন্দিরে গিয়ে দেবী ভুবনেশ্বরীকে পূজা করে যেই বাঁদিকে তাকিয়েছে অমনি দেখল একটি পুরুষ ও একটি

নারীর মুণ্ডকাটা দেহ পড়ে আছে এবং সামনের দেওয়ালে লেখা আছে, যদি কোন পরোপকারী পুরুষ তার নিজের গলা কেটে দেবী ভুবনেশ্বরীকে উৎসর্গ করে তবেই এই পুরুষ ও নারী আবার বেঁচে উঠবে।

দেওয়ালের লেখা পড়ে বণিক ধনদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। যাইহোক, নৌকোয় উঠে দ্বারকায় গেল এবং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও পূজা করে পুনরায় নিজ নগরের দিকে যাত্রা করল।

নগরে ফিরে গিয়ে ধনদ আত্মীয়-বন্ধুদের কৃষ্ণের প্রসাদ বিতরণ করে রাজদর্শনে গেল।

রাজা তার কুশল জিজ্ঞাসা করলে বণিক সাগরের মধ্যে মন্দিরে অবস্থিত দেবীর বিষয়ে সব খুলে বললো।

শুনে রাজা বিস্মিত হলেন এবং ধনদের সঙ্গে সেই স্থানে গিয়ে মন্দিরে দেবীর বাঁ পাশে থাকা ছিন্নমস্তক নর ও নারীর দেহ দুটি দেখলেন। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীর নাম স্মরণ করে যেই নিজের গলায় খড়্গ বসাতে যাবেন অমনি সেই মৃতদেহ দুটি জীবন ফিরে পেল।

এদিকে দেবীও রাজার হাত থেকে খড়্গখানা নিয়ে বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েছি, বর চাও আমার কাছে।

রাজা বললেন, হে দেবী! যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তবে এই দু'জনকে রাজ্য দান কর।

দেবী তথাস্তু বলে সেই দম্পতিকে রাজ্য দান করলে রাজা ধনদের সঙ্গে নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল গল্পটি শেষ করে বললো, মহারাজ, আপনার এমন পরোপকার করার যদি শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন। সেদিনও তাঁর সিংহাসনে বসা হল না।

অষ্টম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে অষ্টম পুতুল তাঁকে বললো, মহারাজ, আমার নাম লাবণ্যবতী, আমার কথা আগে শুনুন, তারপর সিংহাসনে বসবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য নানা কারণে প্রসিদ্ধ ও নানা ঔদার্যগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি চরদের কাছ থেকে নানা কৌতুকপ্রদ ঘটনা জানতে পারতেন। এ কথা সকলেই জানে—পশুরা গন্ধের মাধ্যমে, ব্রাহ্মণেরা বেদের মাধ্যমে, রাজারা চরের মাধ্যমে এবং সাধারণ মানুষ তাদের দুটি চোখের মাধ্যমে সবকিছু জানতে পারে।

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্যশাসন করছিলেন। একবার চরেরা রাজ্য পরিভ্রমণ শেষ করে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, মহারাজ, কাশ্মীর রাজ্যে এক ধনবান বণিক বাস করে। সে পাঁচ ক্রোশ লম্বা একটি পুকুর কাটিয়েছে। সেই পুকুরের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নগৃহ নির্মাণ করিয়েছে। কিন্তু জল উঠছে না, পুকুরে একবিন্দু জল নেই। তখন সেই বণিক জলের জন্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে জপ, পূজা, হোম প্রভৃতি অনেক কিছু করাল, কিন্তু কিছুতেই জল উঠল না। তখন বণিক দুঃখে ভেঙে পড়ে পুকুরের পাড়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল—হায়, এত চেষ্টাতেও জল উঠল না, আমার সমস্ত শ্রম বিফল হল।

বণিক খুবই চিন্তিত মনে বসে থাকে। একদিন দৈববাণী হল—হে বণিকপুত্র, বত্রিশটি শুভ লক্ষণ-ধারী কোন পুরুষের রক্তে যেদিন পুকুরের মাটি ভিজবে সেইদিন নির্মল জলে পুকুর ভরে যাবে। এ ছাড়া জল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই দৈববাণী শুনে বণিক সেই পুকুরের পাড়ে অন্নছত্র খুললেন। প্রতিদিন বহু লোক সেই ছত্রে এসে আহার করতে লাগল। এই ছত্রের কাজের জন্য যারা নিযুক্ত হয়েছিল তারা ঐ সব উপস্থিত লোকদের সম্মুখে বলত, যে তার নিজের রক্ত দিয়ে এই পুকুরের মাটি ভেজাবে তাকে একশত কলস সুবর্ণ মুদ্রা দেওয়া হবে। সকলেই এই ঘোষণা মনযোগ দিয়ে শুনত কিন্তু কেউ রাজি হত না।

এই ঘোষণার কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তারপর বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে ভক্তিসহকারে পূজা করে বললেন, হে জলদেবতা, তুমি যে বত্রিশ লক্ষণযুক্ত পুরুষের রক্ত চেয়েছ, আমিই সেই, আমার রক্ত পান করে এই পুকুর জলে পরিপূর্ণ কর। এই কথা বলে রাজা খড়্গ তুলে নিয়ে যেমনি কণ্ঠচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছেন অমনি দেবতা খড়্গখানা ধরে ফেলে বললেন, হে বীর, তোমার বীরত্ব এবং পরোপকারব্রত দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছ তবে এই পুকুর জলে পরিপূর্ণ করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

রাজা খুশি হয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

পুতুল ভোজরাজকে বললো, হে রাজন, আপনার মধ্যে যদি এই রকম ঔদার্য ও পরোপকারিতা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

নবম উপাখ্যান

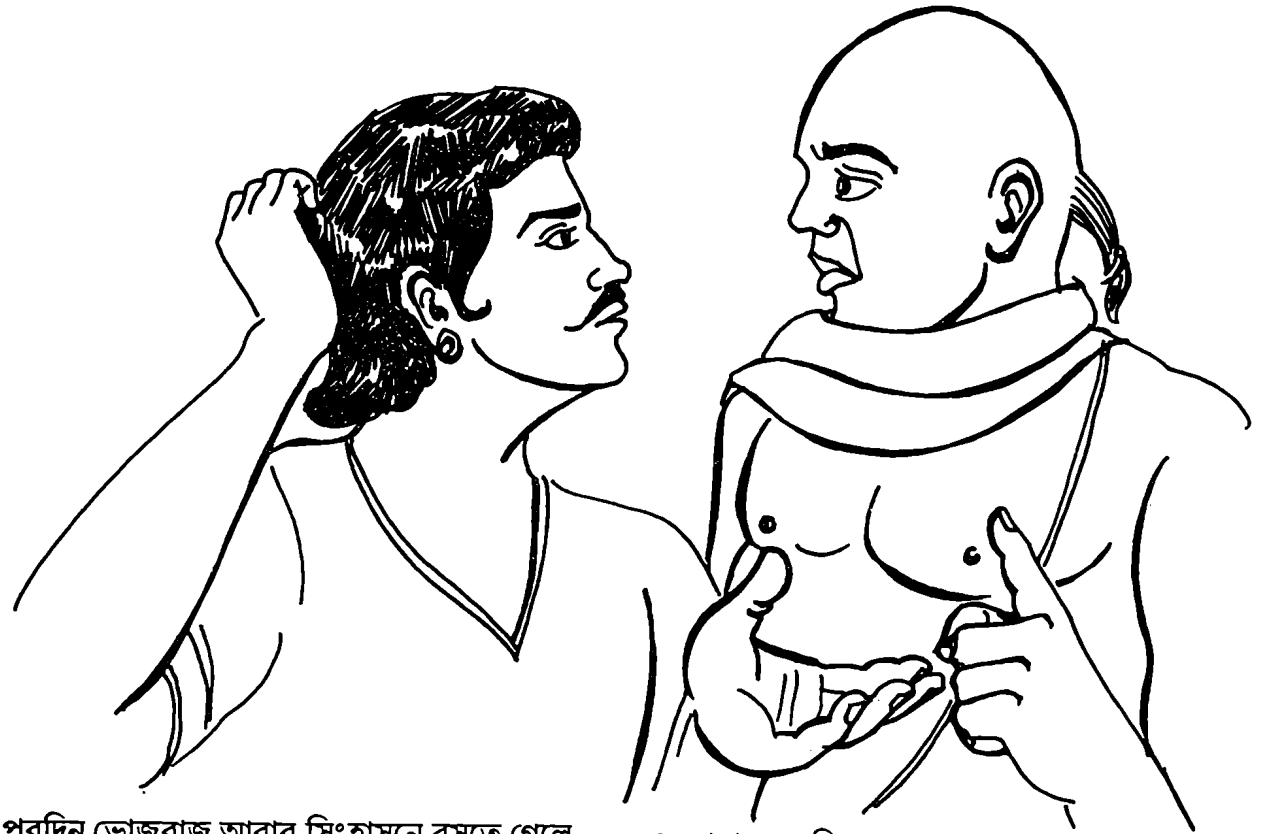

পরদিন ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসতে গেলে নবম পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম কামকলিকা, আমার কথা শুনে তারপর সিংহাসনে বসবেন।

বিক্রমাদিত্যের প্রধান মন্ত্রীর নাম ছিল ভট্টি, উপমন্ত্রী গোবিন্দ, সেনাপতি চন্দ্রশেখর এবং পুরোহিত ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম ছিল কমলাকর। তিনি পিতার দৌলতে সুখাদ্য ভোজন ও বহুমূল্য বস্ত্রে শরীরকে তোয়াজ করে মনের আনন্দে দিন কাটাতেন।

পিতা একদিন পুত্রকে ডেকে বললেন, পূর্বজন্মের মহাপুণ্যের ফলেই তুমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। সেই ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও তুমি দুরাচারী হয়েছ। সব সময় বাইরে বাইরে কাটাও। কেবল মাত্র খাওয়ার সময় তোমার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক। এ তোমার অনুচিত কাজ হচ্ছে। তোমার এখন বিদ্যা অর্জনের সময়। এসময় যদি বিদ্যাভ্যাস না কর তবে পরে ভীষণ দুঃখে পড়বে। বিদ্যাই প্রকৃত বন্ধু। বিদ্যাই পরম দেবতা। বিদ্যা রাজাদের কাছেও পূজনীয়। তাই বলছি পুত্র, আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তোমাকে বিদ্যাভ্যাস করতেই হবে।

পিতার মুখে এই কথা শুনে কমলাকর অনুতপ্ত হলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি আমি সর্বগুণে ভূষিত হতে পারি তবেই পিতাকে এ মুখ দেখাব।

এরপর কমলাকর কাশ্মীরদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে চন্দ্রমৌলি ভট্টের কাছে গিয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বললেন, প্রভু, আমি মূর্খ, আপনার যশ শুনে বিদ্যালাভের জন্য এসেছি।

উপাধ্যায় খুশি হয়ে স্বীকৃত হলেন বিদ্যাদানে।

কমলাকরও দিবারাত্র তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

এইভাবে গুরুসেবা করতে করতে অনেক দিন কেটে গেল। তারপর কমলাকর সর্বজ্ঞ হয়ে উপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

যেতে যেতে পথে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হলেন। ঐ নগরের রাজা ছিলেন নরেন্দ্রসেন। সেখানে নরমোহিনী নামে পরমা সুন্দরী এক মহিলা থাকত। তার বাড়িতে রাত্রে কেউ অতিথি হলে, বিন্ধ্যাচলের এক রাক্ষস এসে তার রক্ত চুষে খেত। এতেই সে বেচারার মৃত্যু ঘটত।

কমলাকর এই অদ্ভুত গল্প শুনে নিজের বাড়ি পৌঁছলেন। অনেক দিন পর তাঁকে দেখে পিতামাতা খুব খুশি হলেন।

পরদিন পিতার সাথে রাজভবনে গেলেন রাজার সাথে দেখা করতে।

রাজা বিক্রমাদিত্য মূল্যবান জিনিস উপহার দিয়ে তাঁকে বললেন, ওহে কমলাকর, তুমি যে-দেশে গিয়েছিলে সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখে থাকলে তা বর্ণনা কর, আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।

কমলাকর বিনীতভাবে বললেন, রাজন, সে-দেশে বলবার মত উল্লেখযোগ্য কিছু দেখি নি, তবে ফিরে আসবার পথে কাঞ্চীনগরে এক অদ্ভুত গল্প শুনলাম।

কমলাকর তখন কাঞ্চীনগরের রাক্ষসের কথা বললেন।

রাজা শুনে বললেন, ঐ নগরে আমরা দু'জনে যাব।

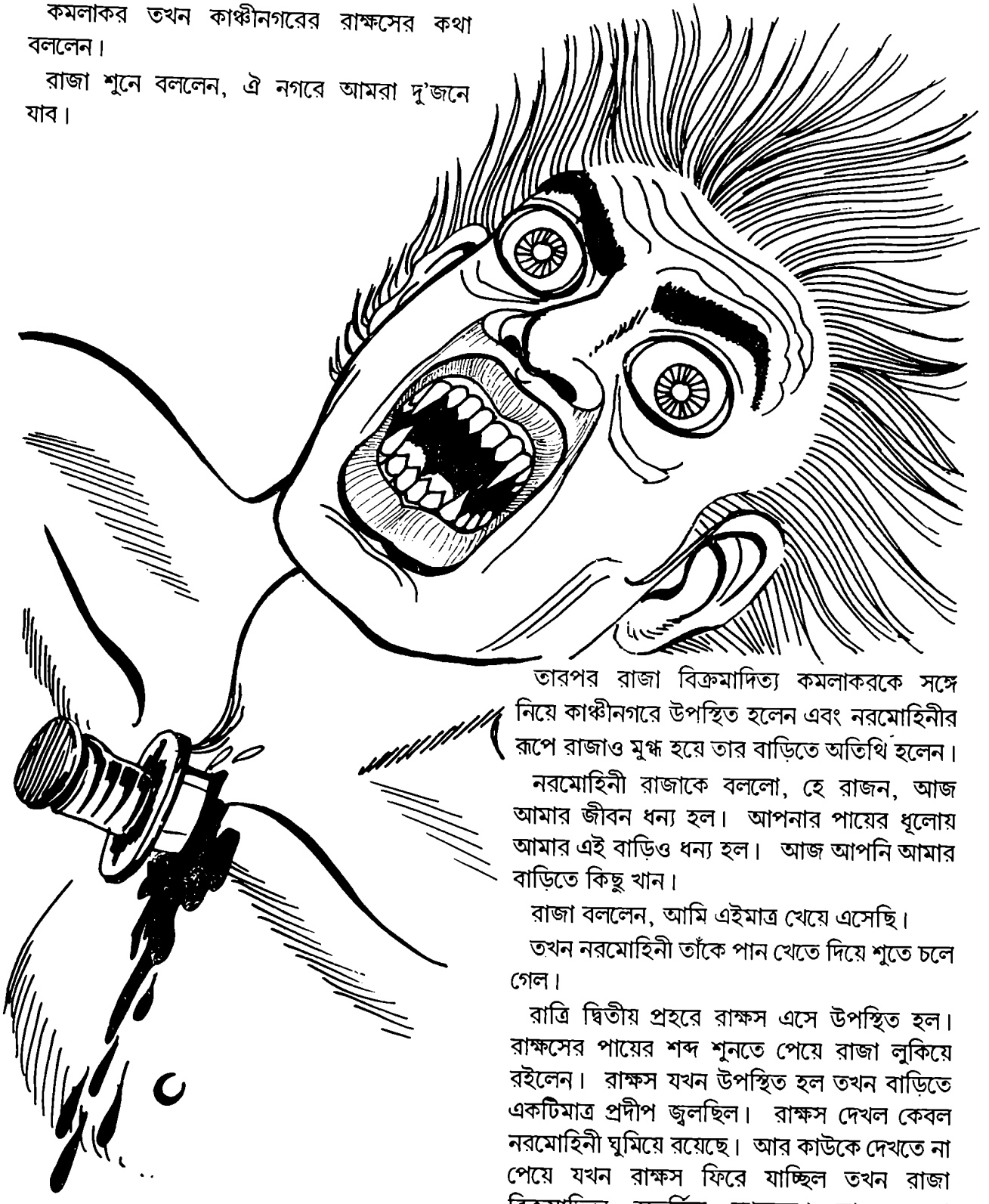

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য কমলাকরকে সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হলেন এবং নরমোহিনীর রূপে রাজাও মুগ্ধ হয়ে তার বাড়িতে অতিথি হলেন।

নরমোহিনী রাজাকে বললো, হে রাজন, আজ আমার জীবন ধন্য হল। আপনার পায়ের ধূলোয় আমার এই বাড়িও ধন্য হল। আজ আপনি আমার বাড়িতে কিছু খান।

রাজা বললেন, আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি।

তখন নরমোহিনী তাঁকে পান খেতে দিয়ে শুতে চলে গেল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে রাক্ষস এসে উপস্থিত হল। রাক্ষসের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে রাজা লুকিয়ে রইলেন। রাক্ষস যখন উপস্থিত হল তখন বাড়িতে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল। রাক্ষস দেখল কেবল নরমোহিনী ঘুমিয়ে রয়েছে। আর কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন রাক্ষস ফিরে যাচ্ছিল তখন রাজা বিক্রমাদিত্য অতর্কিত আক্রমণে তাকে হত্যা

করলেন।

কোলাহল শুনে নরমোহিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাক্ষসকে মৃত অবস্থায় দেখে সে বললো, রাজন, আপনার কৃপায় আজ থেকে রাক্ষসের উপদ্রব দূর হল। আপনার এই উপকারের প্রতিদান আমি কিভাবে দিতে পারি? আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, তবে এই কমলাকরকে বিয়ে করে তাকে সুখী কর।

নরমোহিনী রাজার নির্দেশমত কমলাকরকে বিয়ে করল।

রাজা বিক্রমাদিত্য খুশিমনে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

পুতুল ভোজরাজকে বললো, মহারাজ, আপনার মধ্যে যদি এই মহৎ গুণ থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

সেদিনও রাজা কিছু বললেন না।

দশম উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে দশম পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম চণ্ডিকা, আমার কথা আগে শুনুন, তারপর সিংহাসনে বসবেন।

বিক্রমাদিত্য যখন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন তখন এক যোগী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। শোনা গেল এমন কোন বিদ্যা নেই যা তিনি জানেন না। বেদ; চিকিৎসা, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীত— সকল বিষয়ে পারদর্শী তিনি। এককথায় তিনি সর্বজ্ঞ।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই যোগীর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে ডেকে আনবার জন্য একজন পুরোহিত পাঠালেন।

যোগী রাজার সামনে এসে বললেন, রাজন, আপনি যদি মন্ত্রসাধনা করেন তবে জরা-মরণ-রহিত হবেন। অর্থাৎ কখনও মরবেন না।

রাজা বললেন, সে মন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দিন, আমি তার সাধনা করব।

যোগী তখন রাজাকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, ব্রহ্মচারী হয়ে এক বৎসর এই মন্ত্র জপ এবং দুর্বা-ঘাস দিয়ে মন্ত্র জপের পর দশ ভাগের এক ভাগ হোমের আগুনে দেবেন। এক বছর পর হোমকুণ্ড থেকে একজন দিব্য পুরুষ ফল হাতে এসে

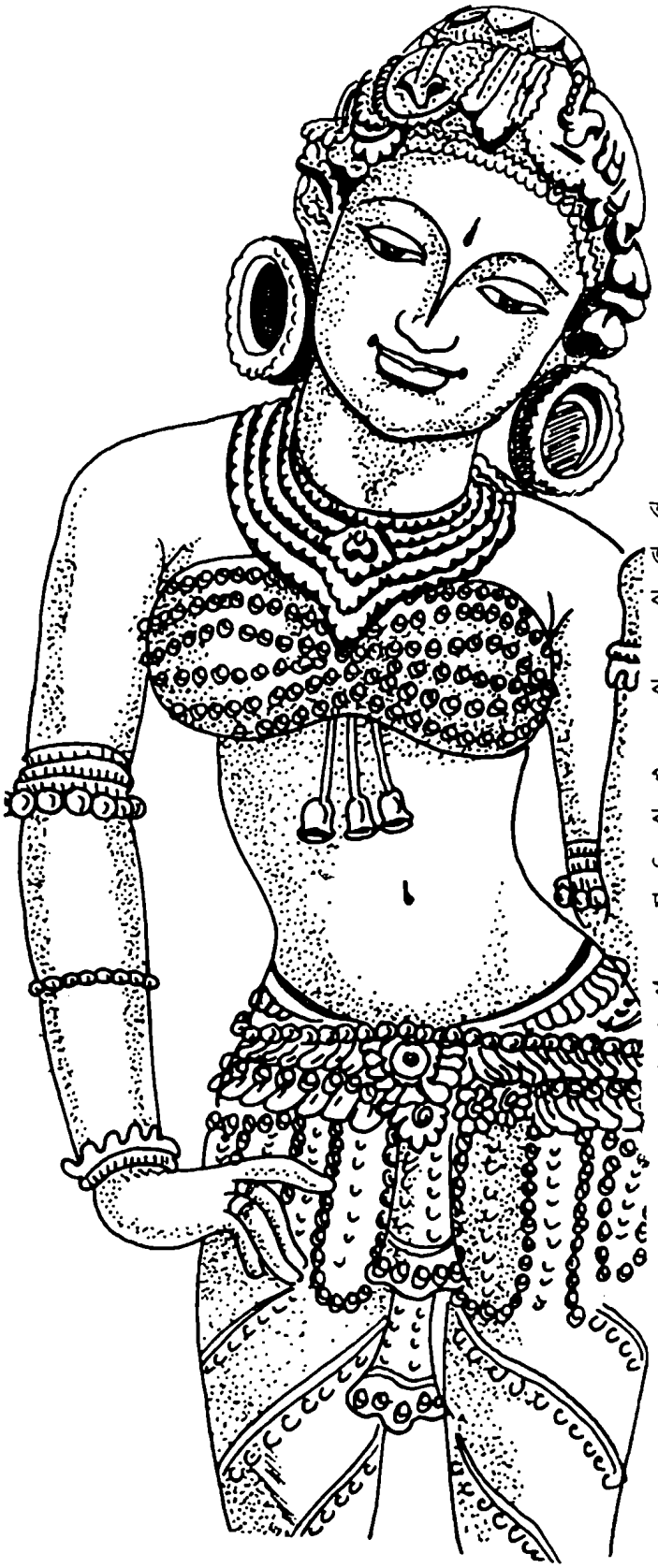

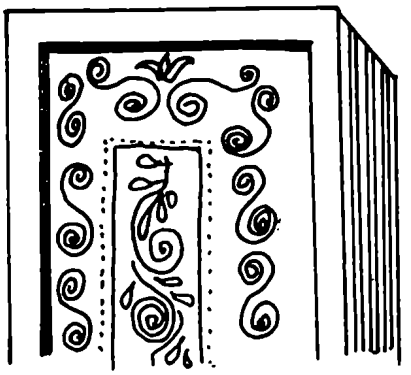

আপনাকে সেই ফল দেবে। সেই ফল খেলেই আপনি জরা-মরণ-রহিত হবেন। আপনার দেহও বজ্রের মত কঠিন হবে।

যোগী মন্ত্র ও উপদেশ দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

রাজা লোকালয়ের বাইরে এক বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করে মন্ত্র জপ করে দুর্বা-ঘাস দিয়ে হোম করলেন। তারপর হোমকুণ্ড থেকে এক দিব্যপুরুষ একটি ফল হাতে আবির্ভূত হয়ে রাজাকে সেই ফল দান করলেন।

রাজা সেই ফল হাতে নিয়ে নগরে প্রবেশ করে যখন প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রাজন, রাজা প্রজাদের কাছে পিতৃতুল্য। আপনিও সকলের দুঃখ দূর করেন। আমারও দুঃখ দূর করুন। এই কুষ্ঠব্যাধি আমার দেহকে নষ্ট করছে, শরীর নষ্ট হলে কোন কাজই করা যায় না। সুতরাং এই দেহ যাতে নিরাময় হয় তাই আপনি করুন।

ফলটি ব্রাহ্মণকে দান করলেন রাজা। তারপর খুশিমনে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পুতুলটি ভোজরাজকে বললো, এ রকম ঔদার্য গুণ যদি আপনার থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

পুতুলের এই কথা শুনে রাজা চুপ করে রইলেন।

একাদশ উপাখ্যান

পরদিন ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে একাদশ পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম বিদ্যাধরী, আমার কথা আগে শুনুন, তারপর সিংহাসনে বসুন।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে কোথাও কোন অন্যায় কাজ হত না। মন্দ লোকেরা সাজা পেত এবং সৎ লোকেরা রাজার কাছ থেকে পুরস্কার পেত।

একবার বিক্রমাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণের ইচ্ছা হল। তিনি রাজ্যভার মন্ত্রীর উপর দিয়ে যোগীর বেশে বেরিয়ে পড়লেন। যেখানে কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখেন সেখানে কিছুদিন থেকে যান।

এমনিভাবে তিনি বেড়াচ্ছেন। একবার পথ চলতে চলতে বনের মধ্যে সূর্য অস্ত গেল। কাছেকোলে কোন বাড়ি বা গুহা না দেখে রাজা একটা গাছের

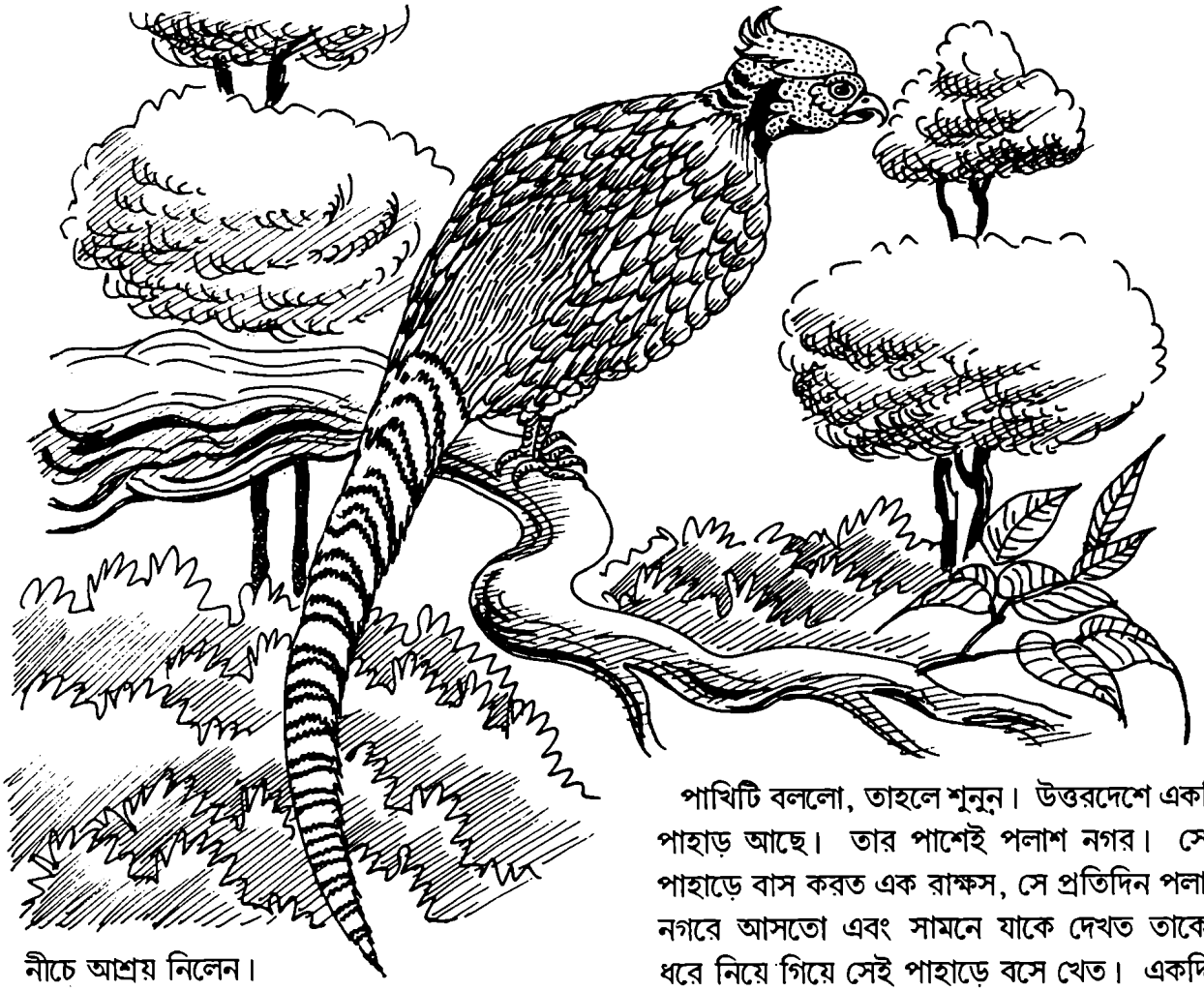

নীচে আশ্রয় নিলেন।

সেই গাছে চিরঞ্জীব নামে এক বৃদ্ধ পাখি বাস করত। তার পুত্র-পৌত্রেরা প্রতিদিন দেশের নানাস্থানে গিয়ে নিজেরা খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় চিরঞ্জীবের জন্য প্রত্যেকে একটি করে ফল এনে দিত। চিরঞ্জীব সেই ফল খেয়ে সুখে জীবনধারণ করত।

সেইদিন রাতে চিরঞ্জীব তার পুত্র-পৌত্রের দেওয়া ফল খেয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করল, বাছারা, তোমরা এই যে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াও কোথাও কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখেছ কি?

একটি পাখি বললো, আমি আজ যদিও আশ্চর্য কিছু দেখি নি, তবুও আমার মন আজ খুব খারাপ।

চিরঞ্জীব বললো, কি জন্য তোমার এই দুঃখ?

পাখিটি বললো, তাহলে শুনুন। উত্তরদেশে একটি পাহাড় আছে। তার পাশেই পলাশ নগর। সেই পাহাড়ে বাস করত এক রাক্ষস, সে প্রতিদিন পলাশ নগরে আসতো এবং সামনে যাকে দেখত তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ে বসে খেত। একদিন নগরের সকলে মিলিত হয়ে রাক্ষসকে বললো, হে বকাসুর, তুমি যাকে পাও তাকেই এমনভাবে খেও না, আমরা তোমার খাবারের জন্য রোজ একজনকে পাঠিয়ে দেব। তুমি তাকেই খেও।

রাক্ষস সেই প্রস্তাব শুনে রাজি হল।

তারপর পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন রাক্ষসের আহারের জন্য এক এক বাড়ি হতে এক এক জনকে পাঠান হতে লাগল। এইভাবে বহুদিন কেটে গেছে।

কাল যে ব্রাহ্মণের পালা, সে আমার পূর্বজন্মে বন্ধু ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে। ছেলেকে দিলে বংশনাশ হয়। নিজে গেলে স্ত্রী বিধবা হয়, আর স্ত্রী গেলে বাড়ি খালি হয়ে যায়। তাদের এই দুঃখে আমি দুঃখিত হয়েছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য গাছতলায় বসে পাখিদের এই সব কথা শুনলেন। তিনি আর দেরী না করে পলাশ নগরের দিকে রওনা হলেন।

সেখানে পৌঁছে সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করে তাকে অভয় দিয়ে সকালবেলা স্নান করে সেই বধ্যশিলার উপর গিয়ে হাসিমুখে বসলেন।

রাক্ষস এসে হাসিমুখে বধ্যশিলার উপর একজনকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললো, মৃত্যুকে তুমি ভয় পাও না? এই শিলায় যে বসে আমার আসার আগেই সে মরে থাকে, তুমি কে?

রাজা বললেন, তা দিয়ে তোমার কী হবে? আমি আমার এই শরীর পরের জন্য দান করছি, তুমি তোমার কাজ কর।

রাক্ষস চিন্তা করল, আহা, লোকটা সাধু পুরুষ, এ নিজের জীবন পরের জন্য ত্যাগ করছে, একে মারলে পাপ হবে।

মনে মনে এই কথা চিন্তা করে সে রাজাকে বললো, তুমি পরের জন্য এই শরীর দান করছ, তুমি পুণ্যবান। তোমায় মারলে পাপ হবে। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। বর চাও।

রাজা বললেন, হে রাক্ষস, তুমি যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তবে আজ থেকে মানুষ বধ করা বন্ধ করো। তোমার কাছে যেমন নিজের প্রাণ প্রিয়, সকলের কাছেও তেমনি নিজের প্রাণ প্রিয়। নিজের প্রাণের মত অন্যের প্রাণও রক্ষা করা উচিত।

রাক্ষস সেদিন হতে মানুষ বধ করা বন্ধ করল, রাজাও নিজের রাজধানীতে ফিরে এলো।

গল্প শেষ করে পুতুলটি ভোজরাজকে বললো, মহারাজ, আপনার যদি এমন পরোপকারিতা গুণ থাকে তবে আপনি সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বাদশ উপাখ্যান

পরদিন দ্বাদশ পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম প্রজ্ঞাবতী। আমিও বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প বলব।

সেকালে বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্য শাসন করতেন, উজ্জয়িনী নগরে ভদ্রসেন নামে এক বণিক ছিলেন। তাঁর অগাধ ধনসম্পদ ছিল অথচ তিনি তাঁর টাকা পয়সা ব্যয় করতেন না। কালক্রমে ভদ্রসেন মারা গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পুরন্দর বন্ধুদের নিয়ে ভোগ বিলাসে সমস্ত উড়িয়ে দিতে লাগল।

ধনদ নামে তার এক প্রিয় বন্ধু ছিল। সে একদিন পুরন্দরকে ডেকে বললো, ওহে পুরন্দর, তুমি বণিকপুত্র হয়ে ক্ষত্রিয়পুত্রের মত অর্থব্যয় করছ। যে কোন উপায়ে ধনসম্পদ উপার্জনই বণিকপুত্রের কর্তব্য।

কিন্তু ধনদের এই কথা পুরন্দর কানে তুললো না। ফলে সে কিছুদিনের মধ্যেই দেউলে হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরা আর তার সঙ্গে মেলামেশা করে না, তাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তখন পুরন্দর চিন্তা করল, যতদিন আমার হাতে অর্থ ছিল ততদিন বন্ধুরা আমায় খাতির করত। এখন আমার হাতে অর্থ নেই বলে তারা আর আমার সঙ্গে মেলামেশা করছে না।

মনে মনে এই চিন্তা করে পুরন্দর দেশের বাইরে চলে গেল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন হিমাচলের পাদদেশে একটি নগরে উপস্থিত হল। সেই নগরের পাশে একটি বাঁশবন ছিল। পুরন্দর গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ির চাতালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে শুনল বাঁশবন থেকে একটি মেয়ে— আমাকে রক্ষা করুন। এক রাক্ষস আমায় প্রহার করছে—এই বলে আর্তনাদ করছে। পুরন্দর মাঝরাতে সেখানে একা যেতে সাহস করল না।

গ্রামবাসীরা বললো, রোজ রাত্রে ঐ বাঁশবন হতে এরকম আর্তনাদ শোনা যায়। কেউ ভয়ে রাত্রে ওখানে যায় না।

পুরন্দর তখন নিজ নগরে ফিরে এসে বিক্রমাদিত্যকে সব ঘটনা বললো। রাজা এই আশ্চর্য ঘটনা শুনে কৌতূহলী হয়ে পুরন্দরের সঙ্গে সেই নগরে গেলেন।

তারপর রাত্রে বাঁশবন থেকে আর্তনাদ উঠলে রাজা তরোয়াল নিয়ে সেই বাঁশবনের দিকে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস একটি অনাথা মেয়েকে প্রচণ্ডভাবে মারছে আর সেই মেয়েটি আর্তনাদ করছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য তখন চেঁচিয়ে বললেন, ও কি! এই অনাথা মেয়েটিকে মারছ কেন?

রাক্ষস বললো, তা দিয়ে তোমার কি দরকার? যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে যাও, নইলে তুমিও আমার হাতে নিহত হবে।

তখন শুরু হল দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা তাঁর তরোয়াল দিয়ে ঐ রাক্ষসটিকে বধ করলেন। সেই মেয়েটি রাজার পায়ে কেঁদে পড়ল, হে প্রভু, আপনি আমায় শাপমুক্ত করলেন। আমায় অসহ্য দুঃখ থেকে আজ উদ্ধার করলেন।

রাজা বললেন, কে তুমি?

মেয়েটি বললো, এই নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আমি তাঁর স্ত্রী। আমি আমার রূপের গর্ব করে তাঁকে অশেষ দুঃখ দিতাম। মারা যাবার সময় তিনি আমায় শাপ দিলেন যে তুই যেমন সারা জীবন আমায় দুঃখ দিয়েছিস বাঁশবনে তুই তেমনি দুঃখ পাবি। তোকে রোজ রাত্রে এক বিকটাকার রাক্ষস এসে প্রহার করবে। এইভাবে আমার স্বামী আমায় শাপ দিলেন। তখন আমি এই শাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, যদি কোন বীরপুরুষ এখানে এসে সেই রাক্ষসকে বধ করেন, তুই তখন তাঁর চরণতলে প্রণাম করলেই শাপমুক্ত হবি আর আমার সব ধন-সম্পত্তি তাঁকে দিবি। এই কথা বলে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। অতএব এখন এই ধনপূর্ণ কলসটি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা সেই ধনপূর্ণ কলসটি ও মেয়েটিকে পুরন্দর বণিকের হাতে দিয়ে নিজ নগরে ফিরে এলেন। পুরুন্দর সেই মেয়েটিকে বিবাহ করে সুখে দিন

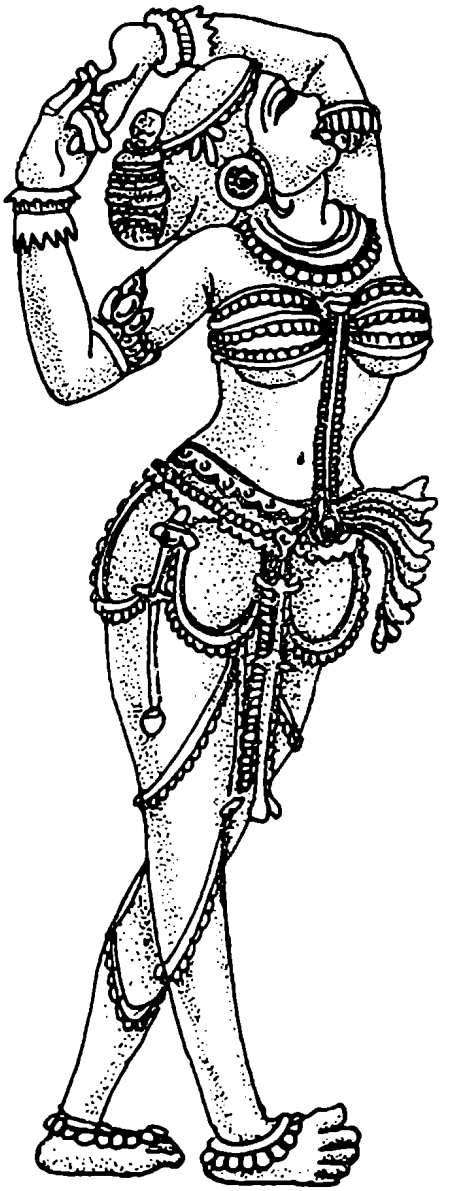

কাটাতে লাগল।

পুতুল ভোজরাজকে বললো, মহারাজ, আপনার যদি এমন সাহস ও বীরত্ব থাকে তাহলে সিংহাসনে বসুন।

রাজা নিরুত্তর রইলেন।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

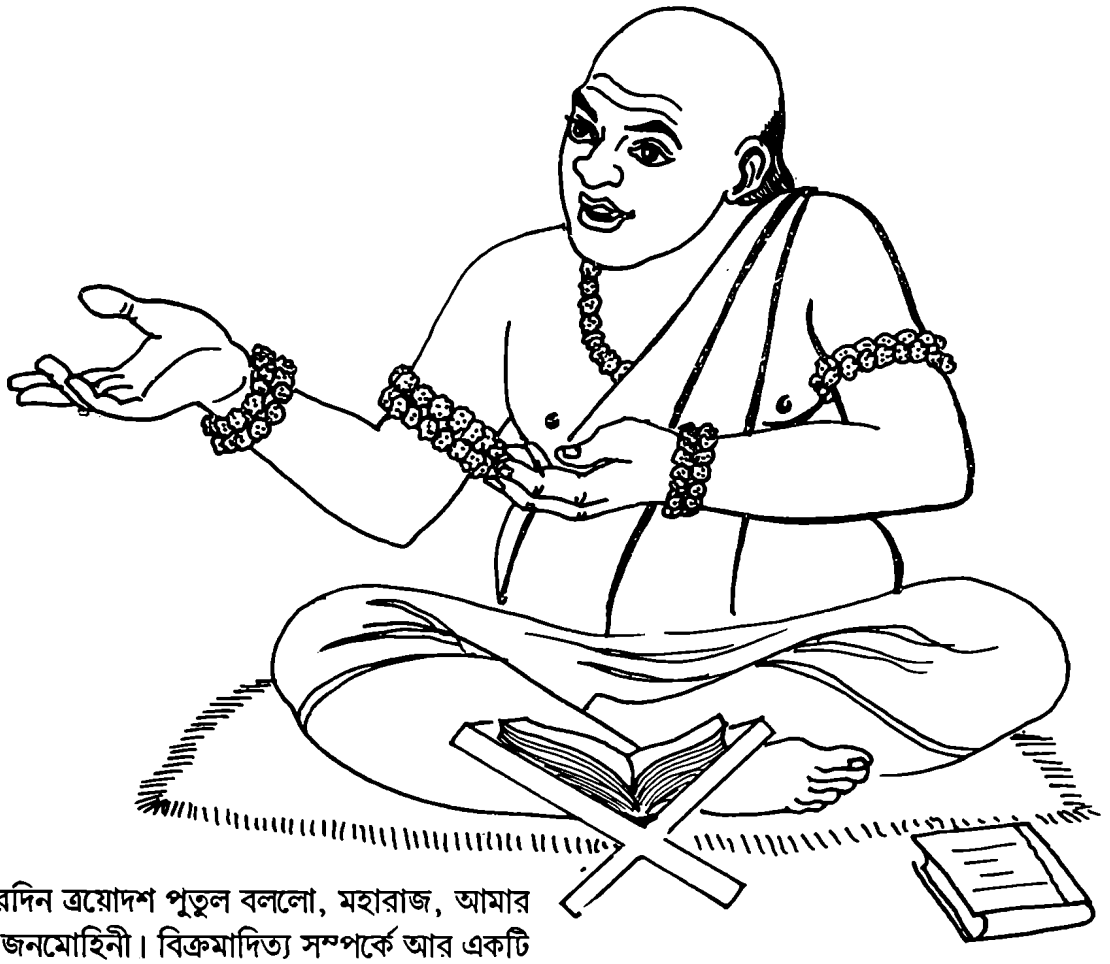

পরদিন ত্রয়োদশ পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম জনমোহিনী। বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে আর একটি গল্প শুনুন।

বিক্রমাদিত্য একবার যোগীবেশে দেশ পরিভ্রমণে বেরোলেন। গ্রামে এক রাত ও শহরে পাঁচ রাত এইভাবে তিনি কাটাতে লাগলেন।

একদিন তিনি এক নগরে এসে পৌঁছলেন। সেই নগরের কাছে নদীতীরে একটি মন্দির আছে। মন্দিরের চাতালে বসে মহাজনরা প্রাচীন পুরাণ পৌরণিকদের মুখে শোনেন। রাজাও স্নান করে সেই চাতালে বসে পুরাণ শুনতে লাগলেন।

পৌরণিকরা পরোপকারের কথা বলছিলেন— ধন, ঐশ্বর্য, এ সবই চিরদিনের জন্য স্থায়ী নয়। একমাত্র ধর্ম-কর্ম চিরদিনের, কোটি কোটি গ্রন্থে লেখা আছে, যে পরোপকার করে সেই পুণ্যবান এবং পরকে যে দুঃখ দেয় সেই পাপী। যে দুঃখিতকে দেখে নিজে দুঃখ পায় এবং সুখীকে দেখে নিজে সুখী হয় সেই প্রকৃত ধার্মিক।

যাঁরা শুনছিলেন তাঁরা সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নদী

পার হতে গিয়ে প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেন। ভাসতে ভাসতে বেচারি আকুলভাবে ডাকতে লাগলেন, মহাজনরা, শীঘ্র আসুন, আমরা জলে ডুবে মারা গেলাম। আপনারা আমাদের এ বিপদ থেকে শীঘ্র উদ্ধার করুন।

সকলেই জলে ভাসমান ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে রইল, কেউ এক পা নড়ল না তাঁদের বাঁচানোর জন্য। একমাত্র বিক্রমাদিত্য নদীতে লাফ দিয়ে পড়ে প্রবল স্রোত হতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ সুস্থ হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বললেন, হে মহাপুরুষ, আপনি আমায় প্রাণদান করে যে পরোপকার করলেন আমি তার প্রতিদানে আপনার কিছু উপকার করতে চাই। এই গোদাবরীর জলের মধ্যে বার বছর ধরে মন্ত্র জপ করে যে পুণ্যফল পেয়েছি তা আপনাকে দান করলাম। আর চান্দ্রয়ানি কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার যা পুণ্য হয়েছে তাও আপনাকে দিলাম। এই বলে ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

এমন সময় এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

—আমি এক ব্রাহ্মণ, এই নগরেই আমার বাস। আমি দুষ্কৃতি করে সারা জীবন কাটিয়েছি। সব সময় গুরু, সাধু ও মহাজনদের নিন্দা করতাম, সেই পাপের ফলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে আজ এই গাছে দশ হাজার বছর অতি কষ্টে আছি। আপনি যদি আজ দয়া করেন, তবে আমি উদ্ধার হব।

রাজা এ কথা শুনে আগে পাওয়া সমস্ত পুণ্য ব্রহ্মরাক্ষসকে দান করলেন। ব্রহ্মরাক্ষস সেই পুণ্যফলে দিব্যরূপ লাভ করে রাজার প্রশংসা করে স্বর্গে চলে গেল। রাজাও তাঁর রাজধানী উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

গল্প শেষ করে পুতুল রাজাকে বললো, মহারাজ, আপনার যদি এমন পরোপকার গুণ থাকে এবং যদি এমন দাতা হয়ে থাকেন তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্দশ উপাখ্যান

পরদিন সকালে চতুর্দশ পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম বিদ্যাবতী, বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে।

বিক্রমাদিত্যের দেশ ভ্রমণের অভ্যাস ছিল। একবার তিনি ঠিক করলেন পৃথিবীতে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস আছে, কোথায় কোন তীর্থে কোন দেবতা আছেন দেখবেন। এই ভেবে তিনি যোগীর বেশে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন।

একসময় তিনি এক নগরে এসে পৌঁছলেন। সেই নগরের কাছে এক তপোবনে জগদম্বার এক বিরাট মন্দির ছিল। তার কাছে একটি নদী ছিল। রাজা নদীতে স্নান করে দেবতার প্রণাম সেরে মন্দিরে বসে সমস্ত দেখতে লাগলেন। এমন সময় এক যোগী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

যোগী রাজাকে বললেন, আপনি কোথা হতে আসছেন?

রাজা বললেন, আমি তীর্থযাত্রী, তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি।

যোগী বললেন, না, আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য, একসময় আমি উজ্জয়িনীতে আপনাকে দেখেছি। তা এখানে আসার কারণ কি?

রাজা বললেন, আমার মনোবাসনা এই যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে কোথায় কি আশ্চর্য জিনিস আছে দেখব।

যোগী বললেন, আপনি বিজ্ঞ হয়েও মূর্খের মত কাজ করছেন। রাজ্যে যদি বিদ্রোহ হয় তখন আপনি কি করবেন?

—মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়ে এসেছি।

যোগী বললেন, রাজা, আপনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। রাজ্য বা কোন অমূল্য রত্ন নিজের হাতেই রাখা উচিত। বিপদের কথা কি বলা যায়। এইভাবে রাজ্য পরিত্যাগ করে দেশভ্রমণ করা আপনার উচিৎ নয়।

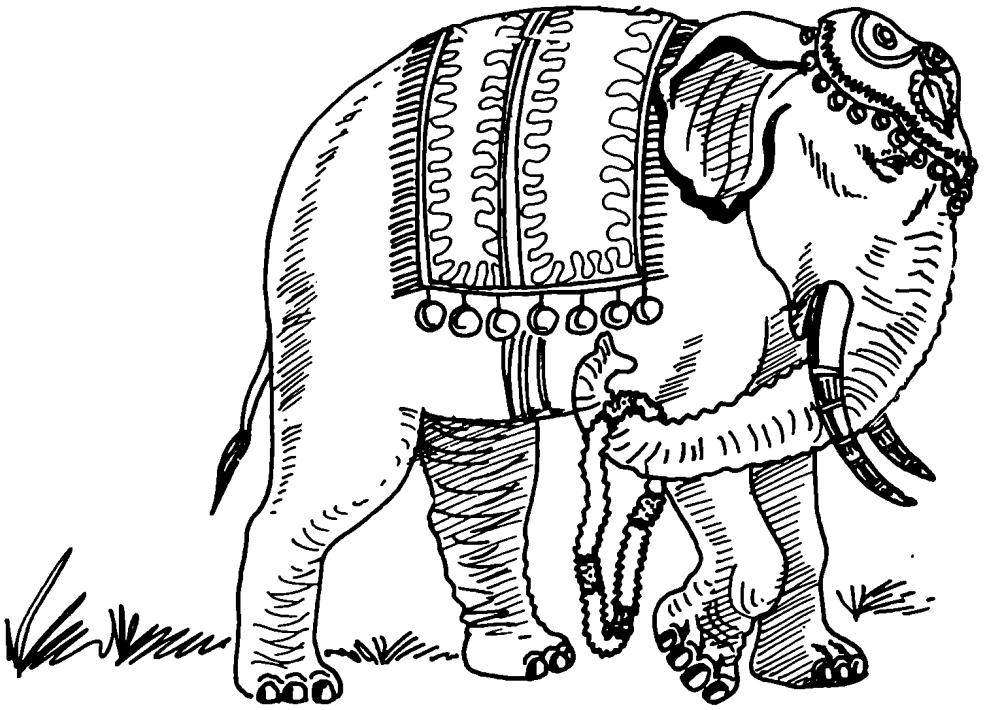

যোগীর এই কথা শুনে রাজা বললেন, দেবতারা যা বিধান করেন তা হবেই। মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে কতটুকু করতে পারে। বজ্র যাঁর অস্ত্র, দেবতারা যাঁর সেনা, অমরপুরী যাঁর দুর্গ, আর হাতী যাঁর বাহন সেই বলসম্পন্ন ইন্দ্রও মাঝে মাঝে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসেন। অতএব দেবতারাও দৈবের হাতের পুতুল। যা হবার তা হবেই। এবিষয়ে একটি গল্প শুনুন—

উত্তরদেশে নদীপর্বতবন্ধন নামক একটি নগর আছে। সেখানে রাজশেখর নামে এক ধর্মশীল রাজা রাজত্ব করতেন। একসময় তাঁর জ্ঞাতিরা একজোট হয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে নির্বাসিত করল। রাজশেখর মনের দুঃখে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এদেশ থেকে ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একসময় রাজা স্ত্রীপুত্র সহ একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। সূর্য অস্ত গেল। সেই গাছে পাঁচটি পাখি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে নানা কথোপকথন করতে লাগলো। একটি পাখি বললো, এই নগরের রাজা মারা গেছেন, তাঁর কোন সন্তান নেই। সুতরাং কে রাজা হবেন?

অপর পাখি বললো, এই গাছের নীচে যে রাজা বসে আছেন তিনিই হবেন এই রাজ্যের রাজা।

তৃতীয় পাখি বললো, তাই হোক।

সকাল হতেই পাখিরা যে যার নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। রাজাও আহ্নিক সেরে সূর্যকে প্রণাম করে নগরের রাজপথে এলেন।

ঐ রাজ্যের অমাত্যরা এদিকে রাজা ঠিক করার জন্য একটি হাতীকে সুন্দর সাজ পরিয়ে মালা দিয়ে পাঠিয়েছিল। হাতীটি রাজশেখরকে দেখতে পেয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে নিজের পিঠে করে রাজপুরীতে নিয়ে এল। তখন অমাত্যরা মিলিত হয়ে রাজশেখরকে সিংহাসনে বসালেন।

একসময় তাঁর রাজ্যের বিরোধী পক্ষের রাজারা একজোট হয়ে রাজশেখরকে নির্মূল করার জন্য সেই নগরে উপস্থিত হলেন। রাজা সেই সময় রাণীর সাথে পাশা খেলছিলেন।

রাণী বললেন, মহারাজ, আপনি পাশা খেলছেন আর এদিকে আপনার জ্ঞাতিশত্রুরা আপনাকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে।

রাজা বললেন, রাণী, দৈব অনুকূল না হলে কিছুই হবে না। আমি যখন গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমাকে যিনি এই রাজ্যের অধীশ্বর করেছেন তাঁর উপরই আমার এবং এই রাজ্যের সকল ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। তিনি যা করবেন তাই হবে।

রাজার এই কথা শুনে দৈব চিন্তা করলেন, আমিই একে রাজা করেছি, যদি এখন আমি সচেষ্ট না হই তবে এর অনিষ্ট হবে। এই চিন্তা করে দৈব ভীষণ মূর্তি ধারণ করে সমস্ত শত্রুর সামনে এসে রুখে দাঁড়ালেন। তারা পরাজিত হল। রাজশেখর মনের আনন্দে রাজ্য সুখ ভোগ করতে লাগলেন।

বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকে এই গল্প শুনে যোগী সন্তুষ্ট হলেন এবং রাজাকে একটি শিবলিঙ্গ দান করে আশীর্বাদ করে বললেন, এইটি চিন্তামণির মত। মনে মনে যা চিন্তা করবেন তাই পাবেন এর কাছ থেকে। প্রতিদিন ভক্তিচিত্তে এর পূজা করবেন।

রাজা হৃষ্টচিত্তে যোগীকে প্রণাম করে সেই নগরের পথে চলেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, প্রতিদিন শিবলিঙ্গের পূজা না করে আমি জলগ্রহণ করি না, কিন্তু আজ তিন দিন হল আমার শিবলিঙ্গটি হারিয়ে গিয়েছে, তাই আমি তিন দিন উপবাসী। আপনার হাতের ঐ শিবলিঙ্গটি আমাকে দিলে আমার অশেষ উপকার হয়। রাজা ব্রাহ্মণকে শিবলিঙ্গটি দান করে নিজ নগরে ফিরে গেলেন।

ভোজরাজ পুতুলের কথা শুনে চুপ করে রইলেন।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

এবার পঞ্চদশ পুতুল বললো, রাজন, আমার নাম নিরুপমা, বিক্রমাদিত্যের পুরোহিতের নাম বসুমিত্র। তিনি দেখতে ছিলেন অত্যন্ত রূপবান আর গুণে ছিলেন সকল বিদ্যায় পারদর্শী। সেই কারণে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি রাজ্যের সকল লোকের উপকার করতেন।

শাস্ত্রে আছে, গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে পবিত্র হওয়া যায় না। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ বা দানের দ্বারা সদগতি লাভ না হতে পারে, কিন্তু গঙ্গাস্নান করলে ফল পাওয়া যায়।

বসুমিত্র এই সব চিন্তা করে বারাণসীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করে ও পরে প্রয়াগে মাঘী পূর্ণিমায় স্নান করে দেশে ফেরার জন্য যাত্রা করলেন।

পথে এক নগর পড়ল। সেই নগরে সুরবালা নামে এক অপ্সরা রাজত্ব করতেন। তাঁর স্বামী ছিল না। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের এক বিরাট মন্দির ছিল। তার মধ্যে একটি বিবাহ-মণ্ডপ ছিল। মন্দির-দ্বারে একটি বিরাট লৌহপাত্রে তেল গরম হচ্ছে। সেখানে

নিযুক্ত লোকরা যে সব বিদেশী ভ্রমণকারী সেখানে আসছেন তাঁদের বলছিল—যে এই গরম তেলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করবে সুরবালা তাঁরই কণ্ঠে মালা দেবেন।

বসুমিত্র সবকিছু দেখে শুনে নিজ নগরে ফিরলেন।

রাজা নিয়মমত জিজ্ঞাসা করলেন, বসুমিত্র, দেশের বাইরে গিয়ে বলার মত আশ্চর্য কিছু দেখে থাকলে তা আমাকে বলুন।

বসুমিত্র তখন সুরবালা ও সেই গরম তেলপাত্রের কথা বললেন।

রাজা কৌতূহলী হয়ে বসুমিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। স্নান করে ভক্তিচিত্তে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করে সেই গরম তেলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলে হাহাকার করে উঠল। ঐ গরম তেলে পড়ে রাজার শরীর একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হল।

এই সংবাদ শুনে সুরবালা অমৃত এনে সেই মাংসপিণ্ডের উপর ছিঁটিয়ে দিলে দেখতে দেখতে রাজা আবার তার আগের রূপ ফিরে পেলেন।

এরপর সুরবালা রাজার গলায় মালা দিতে এলে রাজা বললেন, যদি আমায় সুখী করতে চাও তাহলে আমার কথা শোন।

সুরবালা বললেন, হে প্রভু, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, আপনি আজ্ঞা করুন।

রাজা বললেন, এই যদি তোমার মনের কথা হয় তবে আমার সামনে উপস্থিত ব্রাহ্মণ বসুমিত্রকে বরণ করে নাও।

সেই অপ্সরা 'তথাস্তু' বলে বসুমিত্রের গলায় বরমাল্য দান করে তাঁকে বিবাহ করলেন।

এরপর রাজা তাঁর রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনার যদি এমন সাহস ও উদারতা থাকে তবে অবশ্যই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিনও তাঁর সিংহাসনে বসা হল না।

ষোড়শ উপাখ্যান

পরদিন হরিমধ্যা নামে আর একটি পুতুল ভোজরাজকে বললো, শুনুন মহারাজ, একবার রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সব দেশের রাজাদের নিজ অধীনে এনে সেই সব রাজাদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান সব বস্তু উপঢৌকন পেয়ে তাঁদের নিজের নিজের সিংহাসনে বসিয়ে আবার রাজধানীতে ফিরে এলেন।

নগরে ঢোকার মুখে এক দৈবজ্ঞ বললেন, হে রাজন, এখন থেকে চারদিন নগরে প্রবেশের পক্ষে অশুভ।

দৈবজ্ঞের কথামত বিক্রমাদিত্য নগরের বাইরেই একটি উদ্যানের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে চারদিন কাটালেন।

সেই সময় ছিল বসন্তকাল। বসন্তের শোভা দেখে মন্ত্রী সুমন্ত্রী রাজার কাছে বললেন, মহারাজ, আসুন আজ বসন্তের পূজা করি। তাঁর পূজা করলে সব অমঙ্গল দূর হবে।

মন্ত্রীর কথায় রাজা বসন্ত পূজার আয়োজন করলেন। মন্ত্রী একটি সুন্দর সভামণ্ডপ বানিয়ে ব্রাহ্মণদের, গায়কদের এবং নর্তকীদের ডাকলেন অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হল।

সভাস্থলে রত্নখচিত সিংহাসন রাখা হল এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। পূজার জন্য কুমকুম, কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং জাঁতি, যূথিকা, মল্লিকা, কুশ, কেতকী প্রভৃতি ফুল সংগ্রহ করে আনা হল। এরপর রাজা পূজা সম্পূর্ণ করে ব্রাহ্মণদের ও উপস্থিত কলাকুশলীদের জামাকাপড়, টাকাপয়সা অনেক দান করলেন।

এই সময় এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, হে রাজন, আমার একটি আবেদন আছে।

রাজা বললেন, বলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি একজন ব্রাহ্মণ, নন্দিবর্ধন নগরে আমার বাস। আমার আটটি পুত্র, আমি সস্ত্রীক জগদম্বার নিকট সঙ্কল্প করেছিলাম — আমার কন্যা লাভ হলে কন্যার ওজনের সমপরিমাণ সোনা

দান করব আর কন্যাকে কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করব। যথাসময়ে আমার একটি কন্যা হয়। এখন তার বিবাহের সময় উপস্থিত। প্রতিশ্রুতি পালন করতে হলে কন্যার ওজনের সমপরিমাণ সোনা দান করতে হবে। একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্যই পারেন আমাকে এই দায় থেকে উদ্ধার করতে। তাই আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনি যথাস্থানেই এসেছেন।

তারপর ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, এই ব্রাহ্মণের কন্যার ওজনের সমান সোনা দাও এবং অন্যান্য কাজে ব্যয়ের জন্য আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা দাও।

রাজার আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

রাজাও শুভমুহূর্তে নগরে প্রবেশ করলেন।

পুতুল বললো, রাজন, আপনার মধ্যে যদি এরূপ ঔদার্য থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ নির্বাক হয়ে রইলেন।

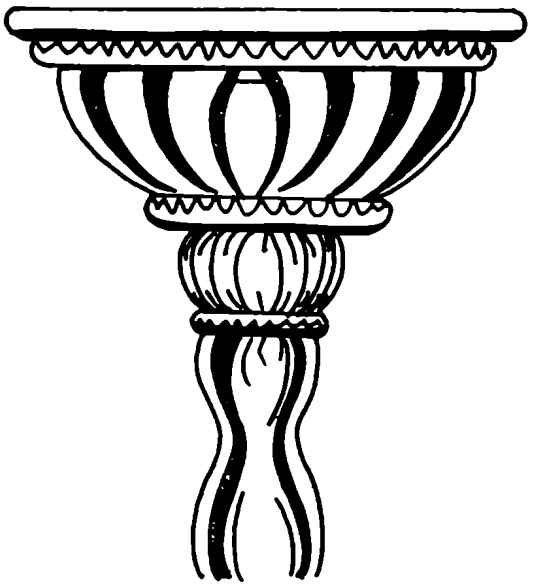

সপ্তদশ উপাখ্যান

পরদিন মদনসুন্দরী নামে আর এক পুতুল বললো, ঔদার্যগুণে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য কেউ ছিলেন না — এখনও নেই।

ত্যাগই একমাত্র গুণ। বীর্য, ধৈর্য ও জ্ঞান সকলেরই থাকে কিন্তু ত্যাগগুণ অতি বিরল। রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন।

একবার অন্য দেশের এক রাজার সামনে এক স্তুতিকার বিক্রমাদিত্যের গুণগান করছিল। তা শুনে রাজা ঐ স্তুতিকারের উপর ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি ডেকে বললেন, সকলেই তোমরা বিক্রমাদিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ — তাঁর কি এমন গুণ আছে?

স্তুতিকার বললো, মহারাজ, দান, পরোপকার, সাহস, শৌর্যে তাঁর মত রাজা আর একজনও নেই। মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে নিজের দেহকে কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর নিজের দেহকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

এই কথা শুনে রাজা বললেন, বিক্রমাদিত্যের মত আমিও পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করব। তিনি এক যোগীকে বললেন, পরোপকার করার জন্য রোজ যাতে নতুন নতুন বস্তু পাওয়া যায় তার উপায় বলুন।

যোগী বললেন, সেরকম কোন উপায় আমার জানা নেই। তবে অমাবস্যার রাতে চৌষট্টি যোগিনীচক্রের পূজা করুন। পূর্ণাহুতির জন্য নিজ দেহ আগুনে আহুতি দিতে হবে।

যোগীর পরামর্শ মত রাজাও ঐরূপ অনুষ্ঠান করলেন। যোগিনীচক্র প্রসন্ন হয়ে রাজাকে নতুন শরীর দান করে বললেন, রাজন, বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমার প্রাসাদে যে সাতটি মহাকলস আছে তা প্রতিদিন সুবর্ণপূর্ণ করুন।

যোগিনীচক্র বললেন, যদি তিন মাস আগুনে তোমার দেহ আহুতি দিতে পার তবে আমরা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব।

রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যথাবিহিত অনুষ্ঠান করে প্রতিদিন আগুনে নিজ দেহ আহুতি দিতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই ঘটনার কথা শুনে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে পূর্ণাহুতির সময় স্বয়ং আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

তখন যোগিনীচক্র তাঁকে আবার জীবিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তোমার দেহত্যাগের প্রয়োজন কি?

বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, পরোপকারের জন্য আমি এ দেহ আগুনে আহুতি দিচ্ছি।

যোগিনীচক্র বললেন, তোমার কথায় আমরা প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।

বিক্রমাদিত্য বললেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই রাজা প্রতিদিন আহুতির জন্য যে কষ্ট পাচ্ছেন তা দূর করুন এবং এর প্রাসাদে যে সাতটি মহাকলস আছে তা সুবর্ণপূর্ণ করুন।

তাঁরা 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে ফিরে এলেন।

এরপর পুতুল মহারাজকে বললো, আপনার যদি এরকম পরোপকারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার মত গুণ থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

পরদিন রাজা সিংহাসনে বসতে গেলে বিলাস-রসিকা নামে একটি পুতুল বললো, আপনার যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের মত গুণ থাকে তবে সিংহাসনে বসুন। তার আগে আমার এই গল্পটি শুনুন।

মণিপুরে গোবিন্দশর্মা নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি যখন তাঁর নিজের পুত্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দেন তখন আমিও তা শুনেছিলাম। সেই উপদেশ কি তাই আপনাকে এখন বলব।

যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা কখনও দুর্জনের সংসর্গে থাকে না। যদি থাকে তবে একের পর এক অনর্থের সৃষ্টি হয়। সর্বদা সজ্জনের সংসর্গই শ্রেয়। সাধুসঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে নেই। পরের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। বিনা কারণে ভৃত্যদের তিরস্কার করা ঠিক নয়। গুরুতর দোষ না দেখলে কাউকে ত্যাগ করতে নেই। শত্রুর কাছেও হিত কথা বলবে। দান ও অধ্যয়ন ভিন্ন সময় নষ্ট করতে নেই। পিতামাতার সেবা করা অবশ্য কর্তব্য।

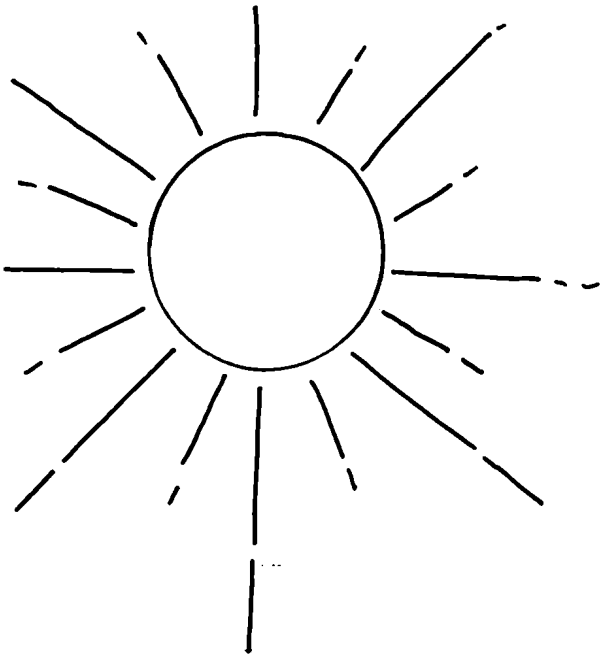

রাজা বিক্রমাদিত্য এই সব নিয়ম মেনে চলতেন।

একদিন এক বিদেশী পর্যটক সভায় এলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন, ঘুরতে ঘুরতে আশ্চর্য জিনিস কি দেখেছেন?

পর্যটক বললেন, এক আশ্চর্য জিনিস দেখেছি। উদয়াচলে সূর্যদেবের এক মন্দির আছে। সেখান দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সেই গঙ্গাতীরে পাপবিনাশন নামে একটি শিবমন্দির আছে। সেইখানে গঙ্গাপ্রবাহ হতে প্রতিদিন একটি করে সোনার থাম ওঠে। সেই থামের উপর নবরত্নখচিত একটি সিংহাসন আছে। সেই থাম ক্রমশ উঁচু হতে হতে সূর্যের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, তারপর দিনের শেষে আবার গঙ্গায় ডুবে যায়। প্রতিদিন একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

রাজা বিক্রমাদিত্য কৌতূহল দমন করতে না পেরে আর দেরী না করে সেই পর্যটককে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।

সকালে সূর্যোদয় হলে দেখা গেল গঙ্গাপ্রবাহ থেকে একটি সোনার থাম উঠল এবং তার উপর একটি রত্নসিংহাসন। রাজা বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসনের উপর নিজে বসলেন। সেটিও দেখতে দেখতে সূর্যের

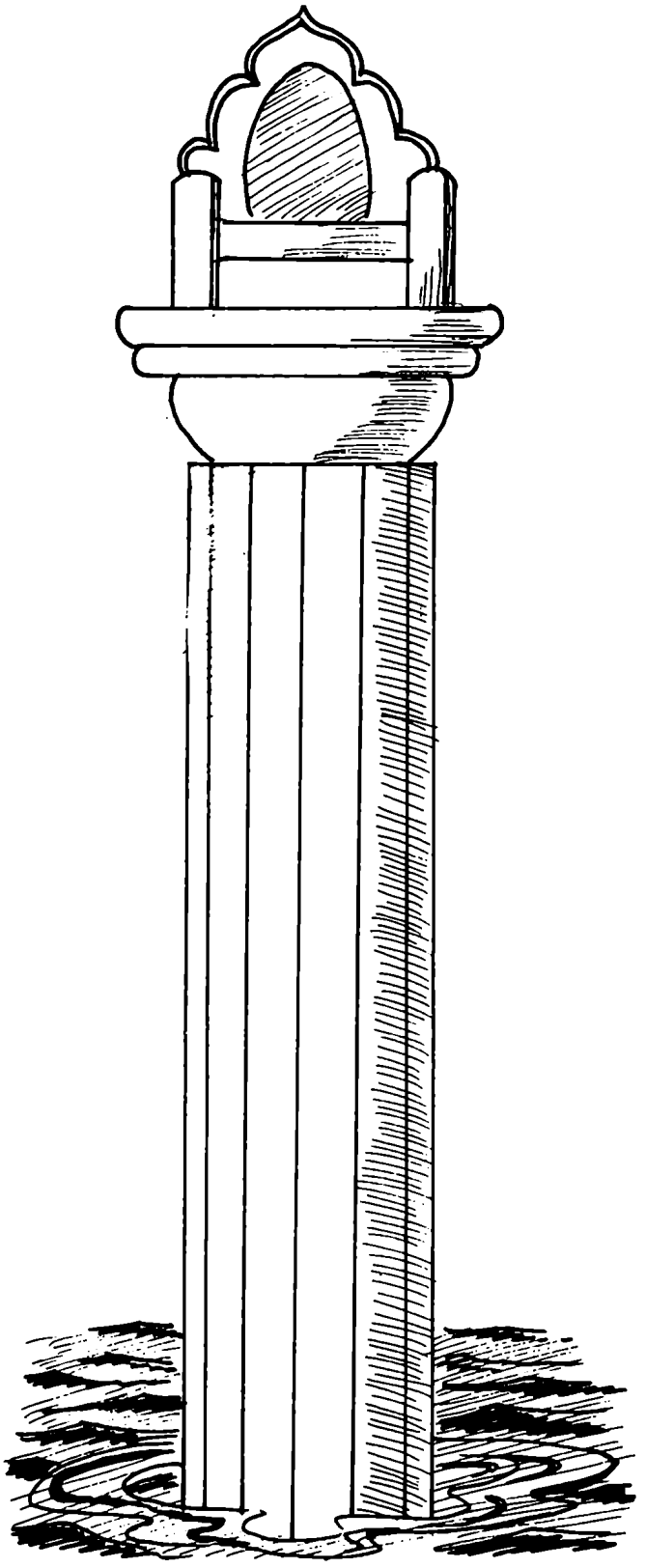

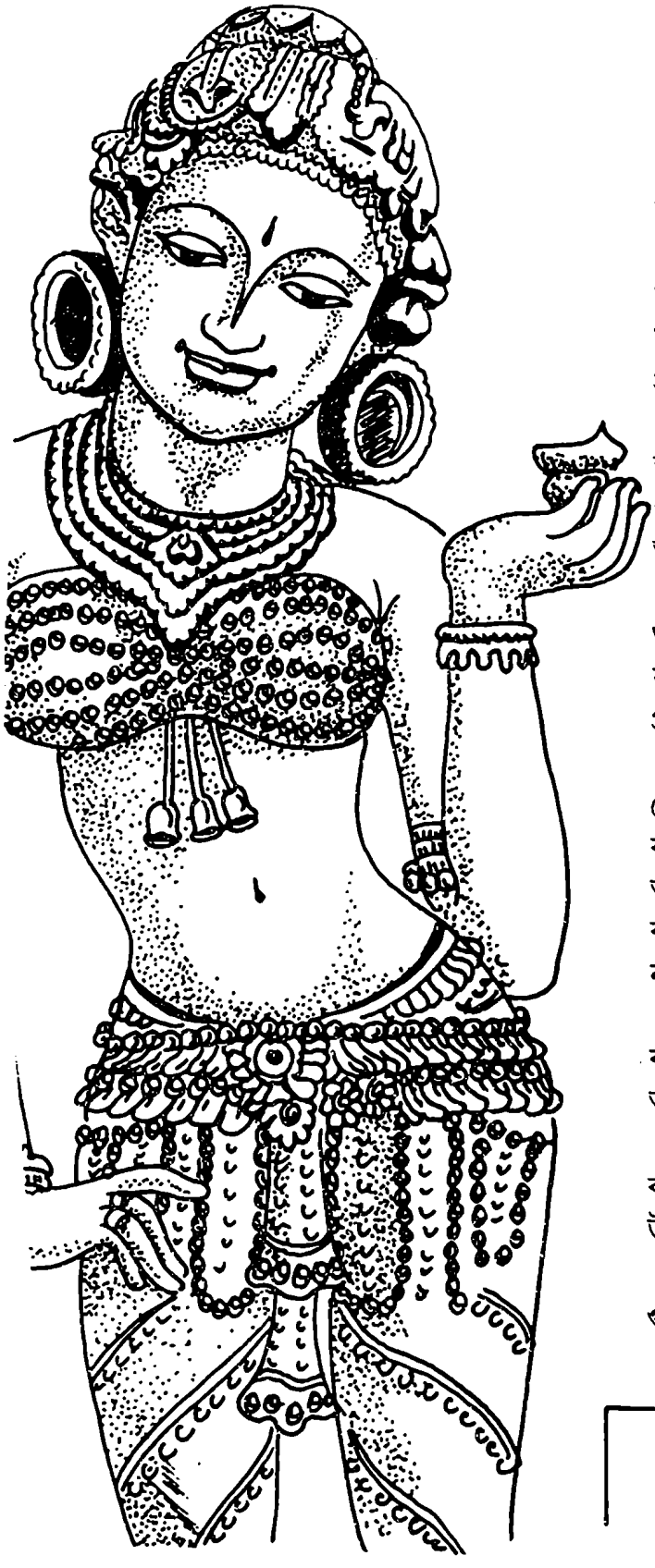

দিকে উঠতে শুরু করল। তিনি যখন সূর্যের কাছে উপস্থিত হলেন তখন সূর্যকিরণের তেজে তাঁর দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হল। সেই অবস্থাতেই তিনি সূর্যকে প্রণাম করে বললেন, জগতের একমাত্র চক্ষুকে, সৃষ্টি-বিনাশহেতুকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

তখন সূর্যদেব অমৃত ছিটিয়ে রাজাকে বাঁচিয়ে তুলে বললেন, হে রাজন, তুমি খুব সাহসী পুরুষ, প্রাণের মায়া ছেড়ে এখানে উপস্থিত হয়েছ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, বর চাও।

রাজা বললেন, মুনিদেরও অগম্য আপনার এই স্থানে প্রবেশ করতে পেরেছি, আমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে। আপনার অনুগ্রহে আমার কিছুরই অভাব নেই।

এই কথা শুনে সূর্যদেব খুব সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে তাঁর নিজের কানের কুণ্ডল দুটি দান করে বললেন, রাজন, এই কুণ্ডল দুটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এ থেকে প্রতিদিন একভার সোনা পাবে।

রাজা কুণ্ডল দুটি নিয়ে সূর্যকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেমনি উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করলেন অমনি এক ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ করি তাতে বাড়ির সকলের পেট ভরে না।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা কুণ্ডল দুটি তাঁকে দিয়ে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এই কুণ্ডল দুটি প্রতিদিন আপনাকে একভার করে সোনা দেবে।

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা করতে করতে সে স্থান ত্যাগ করলেন। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।

পুতুলটি বললো, হে রাজন, আপনার যদি এমন গুণ ও ত্যাগব্রত থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

রাজা এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ পরদিন সিংহাসনে বসতে গেলে অপর একটি পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম শৃঙ্গারকলিকা। আপনি সিংহাসনে বসবার আগে রাজা বিক্রমাদিত্যের কেমন ঔদার্যগুণ ছিল, তা শুনুন।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন। সভায় নানা রাজ্যের সামন্তপুত্ররা উপস্থিত আছেন। কেউ কেউ নিজের বংশের মহিমা কীর্তন করছেন, কেউ বা নিজ নিজ বাহুবলের প্রশংসা করছেন।

এমন সময় একজন ব্যাধ এসে রাজাকে প্রণাম করে বললো, মহারাজ, বনের মধ্যে বিরাট এক বরাহ উপস্থিত হয়েছে। পর্বতের মত তার আকার। আপনি যদি দেখতে ইচ্ছা করেন তবে আসুন।

ব্যাধের কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য উপস্থিত কুমারদের সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে দেখলেন, নদীতীরে কুঞ্জবনের মধ্যে বরাহটি রয়েছে। কোলাহল শুনে বরাহটি কুঞ্জবন থেকে বেরিয়ে এল।

তখন রাজা ছাব্বিশটি বাণের সাহায্যে সেই বরাহকে আঘাত করলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বরাহটি সেই সকল অস্ত্রাঘাত অগ্রাহ্য করে একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। রাজাও ছেড়ে দেবার পাত্র নন, তিনিও পিছনে পিছনে সেই গুহায় প্রবেশ করলেন।

গুহার মধ্যে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে কিছুদূর যাওয়ার পর সুন্দর অট্টালিকা শোভিত একটি নগরী দেখলেন। নানা দেবমন্দির ও উপবন রয়েছে সেখানে। তিনি একটি অতি মনোরম রাজভবন দেখতে পেলেন। বিরোচনপুত্র বলি সেখানে রাজ্যশাসন করছেন।

রাজভবনে প্রবেশমাত্র রাজা বলি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, আপনার এখানে আসার কারণ কি?

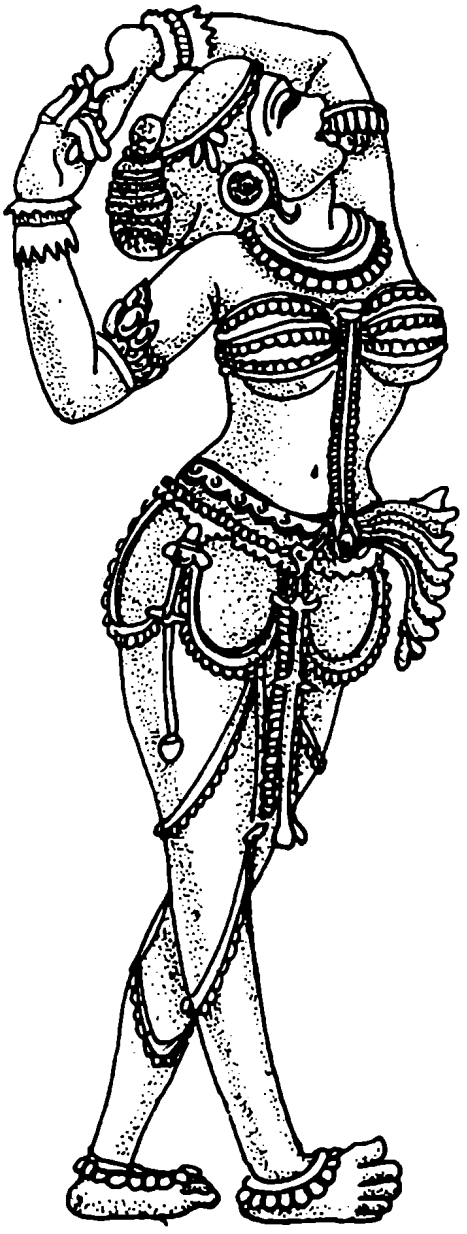

রাজা বললেন, আপনাকে দেখার জন্যই এসেছি, অন্য কোন কারণ নেই।

বলি বললেন, যদি আমাকে বন্ধু ভেবে এসে থাকেন তবে দয়া করে কিছু উপহার গ্রহণ করুন।

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই। আপনার প্রাসাদে যা কিছু আছে তার সবই আমার প্রাসাদে আছে।

বলি বললেন, প্রভু, আমি সে অর্থে বলছি না, বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ কিছু উপহার দিতে চাইছি।

এই কথা বলে তিনি তাঁকে রস ও রসায়ন নামে দুটি অদ্ভুত জিনিস দিলেন।

রাজা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে যেমনি পথে এসে পড়েছেন অমনি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্রসহ তাঁর সামনে এসে আশীর্বাদ করে বললেন, আমি অত্যন্ত দরিদ্র এবং পীড়িত, অনাহারে দিন কাটছে, যাতে খেয়ে বাঁচতে পারি আপনি তার ব্যবস্থা করুন।

রাজা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এখন আমার কাছে কিছুই নেই। যার দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তবে এই রস ও রসায়ন আছে। রসের দ্বারা যে কোন ধাতু সোনায় পরিণত হয় আর এই রসায়ন যিনি খাবেন জরামৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। দুটির যেকোন একটি নিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, যে রসায়ন খেলে জরামৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাই আমাকে দান করুন।

ব্রাহ্মণপুত্র বললেন, রসায়নে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, জরামৃত্যু রহিত হলে অনন্তকাল দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে, যে রসের দ্বারা ধাতু সোনায় পরিণত হয় তাই আমাদের দিন।

তখন রাজা বিক্রমাদিত্য দুটি জিনিসই তাঁদের দিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টচিত্তে রাজাকে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন। বিক্রমাদিত্যও তাঁর নগর অভিমুখে চললেন।

গল্প শেষ করে পুতুল বললো, এবার বলুন রাজা, এমন দানশীলতা আপনার মধ্যে আছে কি? যদি থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

সেদিনও ভোজরাজের সিংহাসনে বসা হল না।

বিংশ উপাখ্যান

আবার ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে আর একটি পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম মন্মথসঞ্জীবনী। আগে আমার এই গল্পটি শুনুন, তারপর সিংহাসনে বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য বছরে ছয় মাস রাজত্ব করতেন আর ছয় মাস দেশভ্রমণ করতেন।

একবার দেশভ্রমণে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পদ্মালয় নামে এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক উদ্যানে জলপূর্ণ একটি সরোবর দেখে সেই সরোবর থেকে জল পান করলেন। তারপর একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বসলেন।

ঐ সময় আরো কয়েকজন বিদেশী তৃষ্ণার্ত হয়ে ঐ সরোবরে জল পান করে ঐ গাছের নীচে বসে পরস্পর কথোপকথন করতে লাগল।

তারা সকলেই স্বীকার করলো, অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেছি কিন্তু কোন মহাপুরুষের দর্শনলাভ আজও হল না।

একজন বললো, মহাপুরুষ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটবে কি করে? তাঁরা যেখানে থাকেন সে স্থান মানুষের অগম্য। পথ অতি দুর্গম, পথে বিঘ্নও অনেক।

রাজা এই কথা শুনে বললেন, ওহে বিদেশী, এ কথা কেন বলছ, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। মানুষ যদি পৌরুষ এবং সাহসের সঙ্গে কাজ করে তাহলে কোন কাজই দুঃসাধ্য থাকে না। শাস্ত্রও বলেছে, মানুষ সাহস করলে বাঞ্ছিত দুষ্প্রাপ্য বস্তুও লাভ করতে পারে, কিন্তু যারা অলস প্রকৃতির তাদের তা কখনও লাভ হয় না। আকাশ থেকে কখনও কখনও জল পাওয়া যায় কিন্তু পাতাল থেকে জল আসবেই।

রাজার এই কথা শুনে সেই বিদেশী বললো, আপনি কি করতে মনস্থ করেছেন বলুন?

রাজা বললেন, এখান থেকে দ্বাদশ যোজন পথ অতিক্রম করতে পারলে মহারণ্যে পৌঁছান যাবে। সেখানে বিরাট এক পর্বত দেখা যাবে — সেখানে বাস করেন যোগীশ্রেষ্ঠ ত্রিকালনাথ। তাঁকে দর্শন করলে তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন। আমি সেখানেই যাচ্ছি।

বিদেশী বললো, আমরাও আপনার সঙ্গী হব। অনুমতি করুন।

রাজা বললেন, আপত্তির কোন কারণ নেই।

এরপর তারা রাজার সঙ্গে চলতে চলতে দুর্গম অরণ্যপথ দেখে বললো, সেই পর্বত আর কত দূরে?

রাজা বললেন, এখান থেকে আট যোজন দূরে সেই পর্বত। পথ খুবই দুর্গম, তবু আমরা সেখানে যাবই।

ছয় যোজন পথ অতিক্রম করার পর দেখল অতি ভয়ঙ্কর এক সাপ পথ অবরোধ করে পড়ে আছে। তার মুখ থেকে আগুনের মত বিষ বের হচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর সাপ দেখে ভয়ে সকলেই পালিয়ে গেল। রাজা কিন্তু ভয় না পেয়ে এগিয়ে চললেন। সাপটি

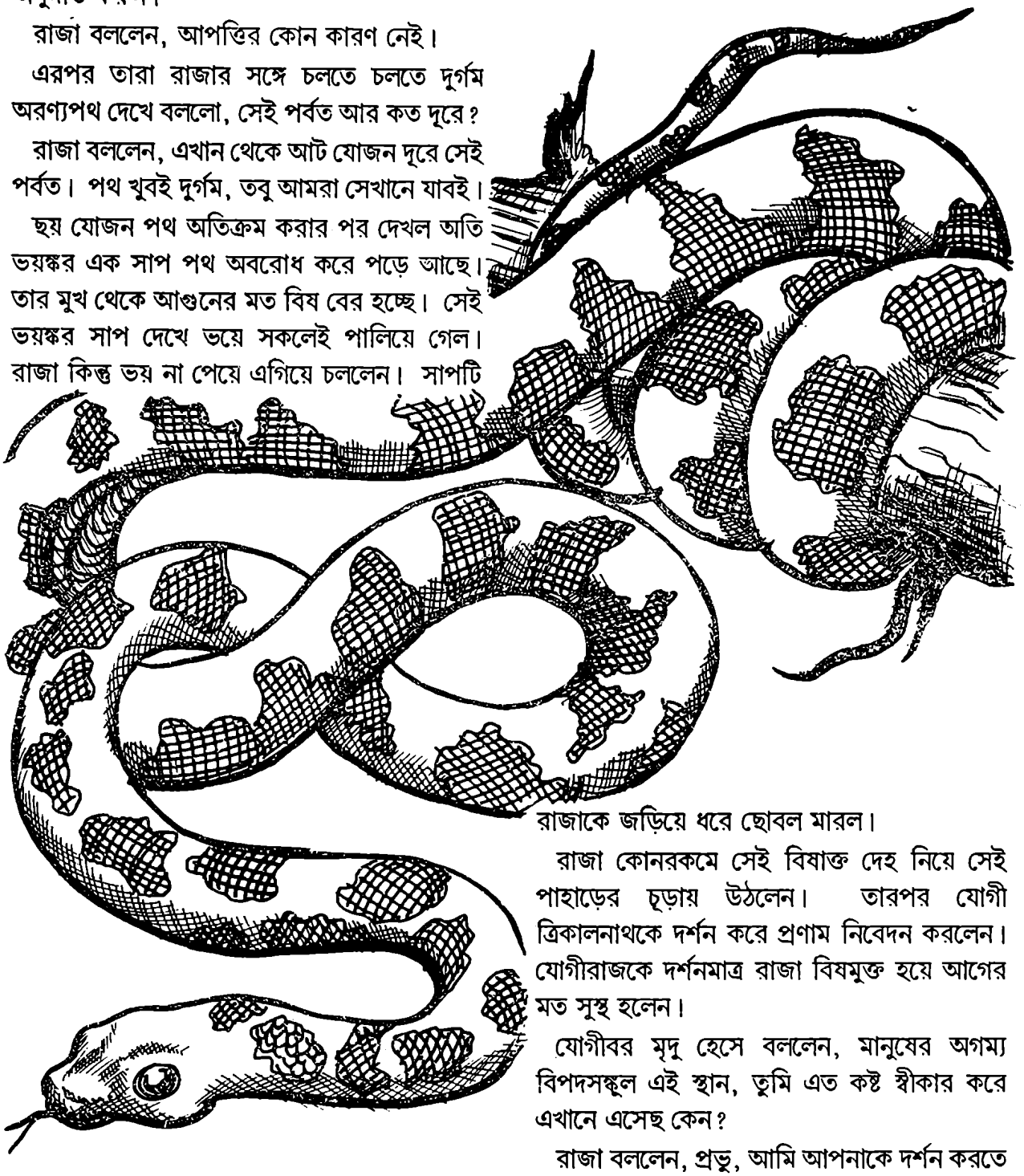

রাজাকে জড়িয়ে ধরে ছোবল মারল।

রাজা কোনরকমে সেই বিষাক্ত দেহ নিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। তারপর যোগী ত্রিকালনাথকে দর্শন করে প্রণাম নিবেদন করলেন। যোগীরাজকে দর্শনমাত্র রাজা বিষমুক্ত হয়ে আগের মত সুস্থ হলেন।

যোগীবর মৃদু হেসে বললেন, মানুষের অগম্য বিপদসঙ্কুল এই স্থান, তুমি এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছ কেন?

রাজা বললেন, প্রভু, আমি আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

যোগী বললেন, তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে।

রাজা বললেন, আমার কোন কষ্টই হয় নি বরং আপনাকে দর্শন করে আমার সকল পাপ দূর হল। আমি আজ ধন্য।

যোগীরাজ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি ঘুঁটি, একটি ডাণ্ডা ও একখানি কাঁথা দিয়ে বললেন, হে রাজন, এই ঘুঁটি দিয়ে মাটিতে যতগুলি দাগ টানা যায় একদিনে তত যোজন পথ যাওয়া যাবে। এই ডাণ্ডাটি ডান হাতে নিয়ে মৃত সৈন্যের গায়ে স্পর্শ করলেই সে জীবিত হয়ে উঠবে। আর বাঁ হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বিপক্ষের সৈন্য বিনাশ হয়ে যাবে। আর এই কাঁথাখানির কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।

রাজা ঐ তিনটি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে যোগীবরকে প্রণাম করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

পথে দেখলেন এক রাজপুত্র আগুন জ্বালার জন্য কাঠ সংগ্রহ করছে। রাজা জানতে চাইলেন, এ তুমি কি করছ?

রাজপুত্র জানাল, আমি রাজপুত্র, আমার জ্ঞাতিরা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। আমি আজ সব হারিয়ে দরিদ্রজীবন যাপন করছি, এ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে; তাই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরবো।

রাজা তাকে নিরস্ত করে যোগীর কাছে পাওয়া সেই ঘুঁটি, ডাণ্ডা ও কাঁথাখানি তাকে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন এই তিনটি জিনিসের কি কি গুণ।

রাজকুমার অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্যও তাঁর রাজধানী উজ্জয়িনীতে ফিরলেন।

পুতুল ভোজরাজকে বললো, রাজন, আপনার মধ্যে কি এই উদারতাগুণ আছে?

রাজা যথারীতি মৌন হয়ে রইলেন।

একবিংশ উপাখ্যান

পরদিন রতি-লীলা নামে আর একটি পুতুল ভোজ-রাজকে বললো, রাজন, আমি একটি গল্প বলছি, শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসিন্ধু নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। সেই মন্ত্রীর একটি পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল অনর্গল। সে ভাল ভাল খাবার খেত আর খেলাধূলা করে বেড়াত, লেখাপড়া একেবারেই করত না।

একদিন তার পিতা তাকে ডেকে বললেন, তুমি আমার ছেলে হয়েও বিদ্যাভ্যাস কর না, মূর্খ হয়ে রইলে। যে মূর্খ তার হৃদয় থাকে না। শাস্ত্রেও আছে —যে পুত্র বিদ্বান এবং ধর্মপরায়ণ নয় সে পুত্রের কি প্রয়োজন? যে গাভী বাছুর দেয় না এবং দুধ দেয় না সে গাভীর কি প্রয়োজন? মৃত এবং মূর্খ এই দুইয়ের মধ্যে মৃত তবু ভাল কারণ তা থেকে অল্প দুঃখ পাওয়া যায় কিন্তু মূর্খ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই দুঃখ দেয়।

পিতার মুখে এই কথা শুনে অনর্গলের অনুতাপ হল। সে আর দেশে না থেকে দেশান্তরে গমন করল।

ঘুরতে ঘুরতে এক নগরে উপস্থিত হয়ে জনৈক উপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সকল প্রকার নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দেশের পথ ধরল। পথের

মধ্যে অরণ্যে সে একটি দেবালয় দেখতে পেল। সেই দেবালয়ের কাছেই একটি সুন্দর সরোবর, সেই সরোবরের একদিকের জল খুব গরম। ক্রমে সূর্য গেল অস্তাচলে। রাত্রিকালে সেই গরম জলের মধ্য থেকে আটজন সুন্দরী মেয়ে উঠে এলো। তারা দেবালয়ে গিয়ে পূজা ও নাচগান করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করলো। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রসাদ দিলেন।

সকাল হলে তারা অনর্গলকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে একজন বললো, আমাদের সঙ্গে নগরে এস।

অনর্গলের মনের ইচ্ছা তাদের সঙ্গে যায় কিন্তু সেই গরম জলে তাদের প্রবেশ করতে দেখে ভয়ে সে যেতে পারল না।

অনর্গল যথাসময়ে নিজ নগরে ফিরে এল।

রাজা কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, ওহে অনর্গল, দেশান্তরে গিয়ে আশ্চর্য কিছু দেখেছ কি?

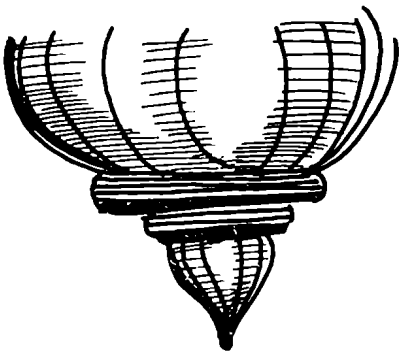

অনর্গল গরম জলের ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করল।

রাজা কৌতূহলী হয়ে অনর্গলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সূর্য গেল অস্তাচলে।

মধ্যরাত্রে সেই মেয়েরা এসে পূজা ও নাচগান করে দেবতাকে তুষ্ট করে সকালে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের মধ্যে একজন রাজাকে দেখে বললো, আমাদের সঙ্গে নগরে এস।

সাহসী এবং বীর রাজা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না

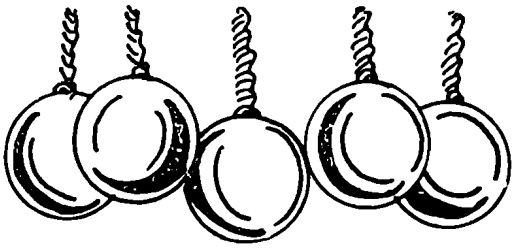

করে তাদের সঙ্গে জলে ডুব দিলেন। জলের তলায় সপ্ত পাতালে তাদের নগর। তারা রাজাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললো, আপনার মত বীর ও শৌর্যসম্পন্ন কেউ নেই, আপনি এই রাজ্যের রাজা হোন, আমরা সকলে আপনার সেবা করব।

রাজা বললেন, রাজ্যের আমার প্রয়োজন নেই। আমি নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এখানে এসেছি।

তারা বললো, আমরা সকলেই আপনার উপর প্রসন্ন হয়েছি। আপনি বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন, আপনারা কারা? পরিচয় দিন।

তারা বললো, আমরা অষ্ট মহাসিদ্ধ।

রাজা বললেন, তাহলে আমাকে অষ্ট মহাসিদ্ধ প্রদান করুন।

তারা রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত আটটি রত্ন দান করলেন।

রাজা সেই রত্নগুলি নিয়ে নিজ নগরের পথে রওনা হলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, মহারাজ, আমার অনেকগুলো পোষ্য—আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। স্ত্রীর ভর্ৎসনা সহ্য করতে না পেরে বিদেশে এসেছি। নীতিশাস্ত্রে বলেছে, নির্ধন পুরুষকে বাড়ির সকলেই পরিত্যাগ করে।

রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনে মনে বড় ব্যথা পেলেন এবং তাঁকে কিছুক্ষণ আগে পাওয়া বিশেষ গুণসম্পন্ন আটটি রত্ন দান করে নিজ নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল বললো, হে রাজন, আপনার যদি এরূপ ঔদার্য ও দানশীলতা থাকে তবে সিংহাসনে বসুন।

সেদিনও ভোজরাজের সিংহাসনে বসা হল না।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

পরদিন রাজা সিংহাসনে বসতে গেলে মদনবতী নামে আর একটি পুতুল বললো, আগে আমার একটি গল্প শুনুন। তারপর সিংহাসনে বসবেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করতে খুব ভালবাসতেন। একদিন তিনি পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে নানা দেবস্থান দর্শন করে এক প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। সেই প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে বহু শিবালয় ও বিষ্ণুমন্দির। তার চারদিকে সোনার দেওয়াল।

সেই নগরের বাইরে একটি সরোবরের পাশেই রয়েছে বিষ্ণুমন্দির। রাজা সেই সরোবরে স্নান করে বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন—হে নাথ, আমি আপনার মাহাত্ম্যের কিছুই জানি না। আমি আর কাউকে জানি না, অন্যের আশ্রয় চাই না, কেবল আমাকে আপনার শ্রীচরণের দাস করে নিন।

স্তব হয়ে গেলে রাজা বাইরে এসে দেখেন এক ব্রাহ্মণ এসেছেন। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি একজন তীর্থযাত্রী। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

রাজা বললেন, আমিও আপনার মত একজন তীর্থযাত্রী।

ব্রাহ্মণ ভালভাবে দেখে বললেন, আপনাকে দেখে কিন্তু সাধারণ একজন তীর্থযাত্রী বলে মনে হচ্ছে না। আপনার দেহে রাজলক্ষণ রয়েছে। রাজসিংহাসনে না বসে তীর্থপর্যটন করছেন কেন?

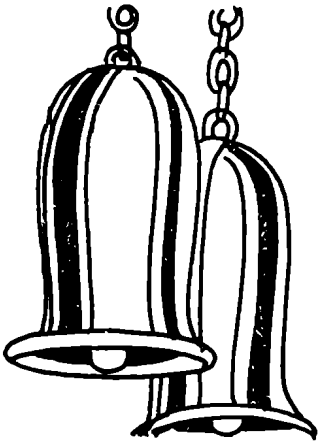

তাঁর কথা রাজা স্বীকার করলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনাকে এত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, শুনুন তবে, কাছেই নীল নামে একটা পর্বত আছে, সেখানে কামাক্ষী দেবীর অবস্থান। সেখান থেকে পাতালে প্রবেশের একটি সুড়ঙ্গপথ আছে। কিন্তু সেই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ। একমাত্র কামাক্ষীমন্ত্র জপ করলেই সেই দ্বার খুলে যায়। তার মধ্যে রয়েছে রসকুণ্ড। সেই রসের স্পর্শে অষ্ট ধাতু সোনায় পরিণত হয়। আমি বারো বছর কামাক্ষীমন্ত্র জপ করেছি, তবুও সেই দ্বার খোলে নি।

এইটুকু শুনেই রাজা নীল পাহাড়ে গিয়ে নিজ খড়্গ তাঁর নিজের গলা লক্ষ্য করে তুললেন, অমনি দেবতা সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার উপর, বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন, হে দেবী, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তবে এই ব্রাহ্মণকে রস প্রদান কর।

দেবী 'তথাস্তু' বলে ব্রাহ্মণকে রস প্রদান করলেন।

সেই ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতিবাদ করে নিজের দেশে ফিরে গেলেন আর রাজাও পর্যটন শেষ করে তাঁর নগরে ফিরলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনি কি পরের জন্য এতখানি ত্যাগ করতে পারবেন?

ভোজরাজ চুপ করে রইলেন।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

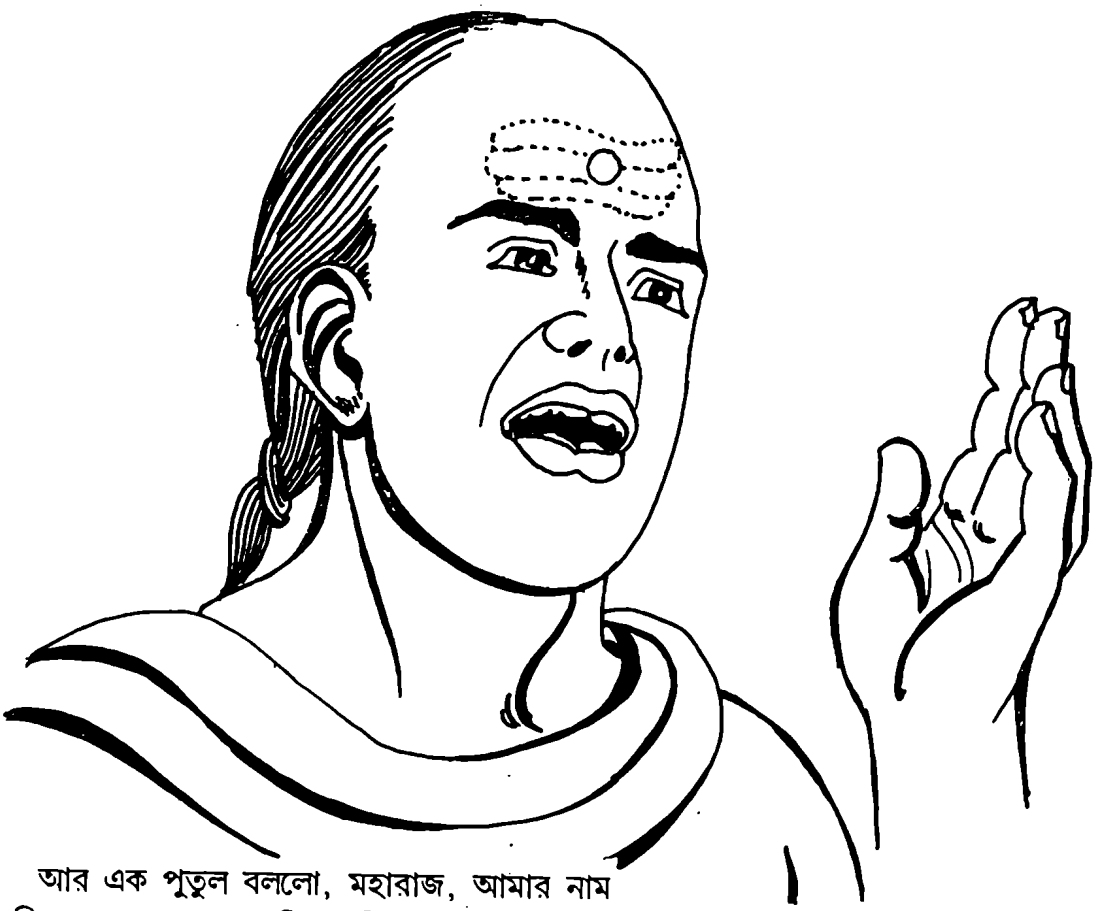

আর এক পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম চিত্রলেখা। রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন গুণের অধিকারী ছিলেন শুনুন।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে রাজধানীতে ফিরে এলে সুহৃদ এবং রাজ্যের প্রজাদের খুব আনন্দ হল।

প্রাসাদে প্রবেশ করে স্নান সেরে, ভাল কাপড় পরে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ষোড়শোপচারে অর্চনা করে স্তব করলেন—

'হে দেবাদিদেব, তুমি আমার পিতামাতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন;—তুমিই আমার সর্বস্ব।'

এই বলে স্তব শেষ করে দেবাদিদেবকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণদের গাভী, ভূমি ও তিল দান করে দীন, অন্ধ, বধির, কুব্জ, পঙ্গু—সকলকে দানে তুষ্ট করে খাবার ঘরে প্রবেশ করে বালক, বালিকা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের খাইয়ে শেষে বন্ধুদের সঙ্গে নিজে খেতে বসলেন।

সব কাজ শেষ করে রাত্রে তিনি শুতে গেলেন। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলেন— মোষের পিঠে করে তিনি দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। স্বপ্ন দেখেই তিনি বিষ্ণুকে স্মরণ করে বিছানা ত্যাগ করলেন। পরদিন সিংহাসনে বসে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

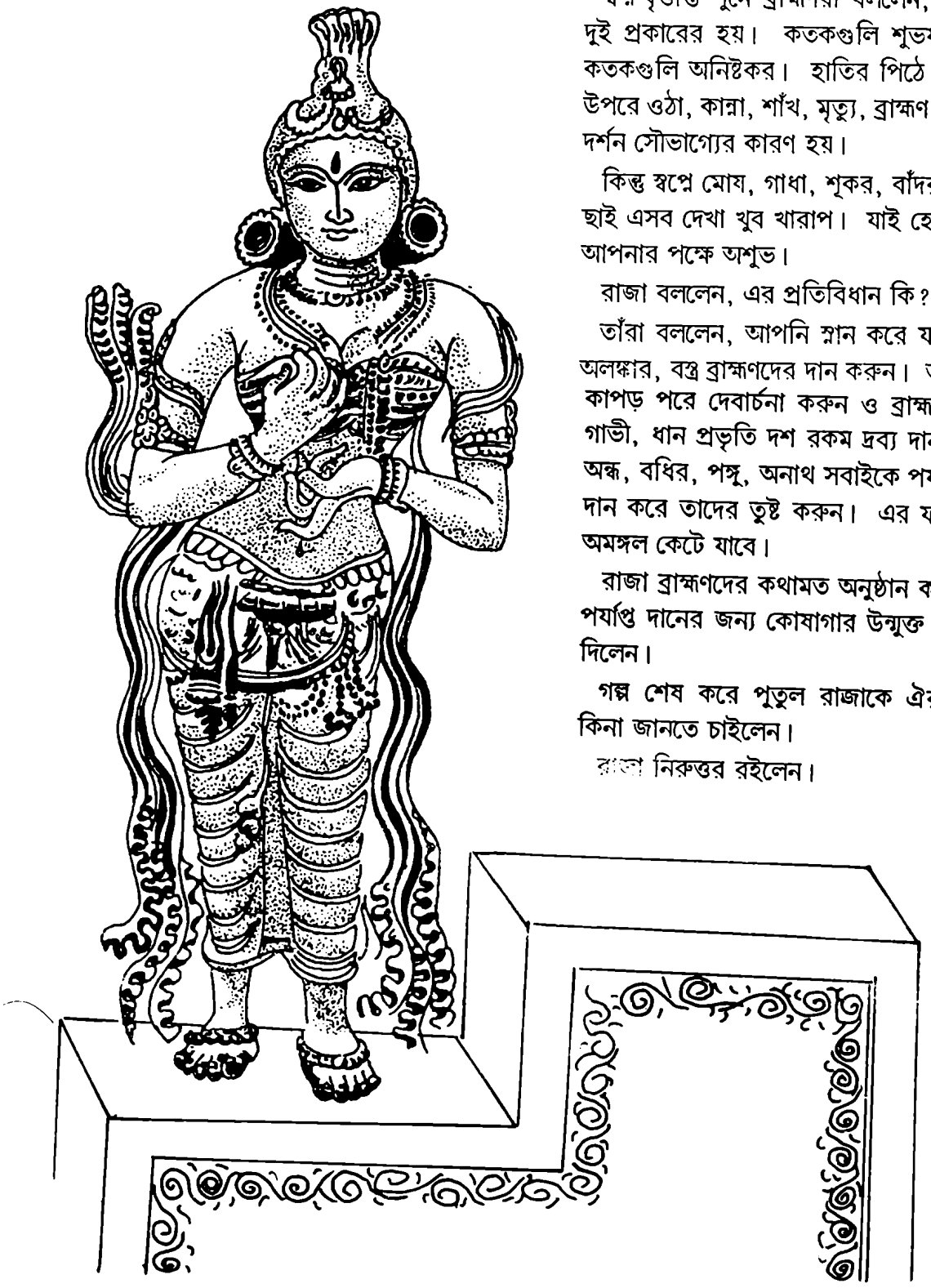

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে ব্রাহ্মণরা বললেন, রাজন, স্বপ্ন দুই প্রকারের হয়। কতকগুলি শুভফলপ্রদ, আর কতকগুলি অনিষ্টকর। হাতির পিঠে চড়া, বাড়ির উপরে ওঠা, কান্না, শাঁখ, মৃত্যু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, সোনা দর্শন সৌভাগ্যের কারণ হয়।

কিন্তু স্বপ্নে মোষ, গাধা, শূকর, বাঁদর, কাঁটাগাছ, ছাই এসব দেখা খুব খারাপ। যাই হোক, এই স্বপ্ন আপনার পক্ষে অশুভ।

রাজা বললেন, এর প্রতিবিধান কি?

তাঁরা বললেন, আপনি স্নান করে যজ্ঞদর্শন করে অলঙ্কার, বস্ত্র ব্রাহ্মণদের দান করুন। তারপর নতুন কাপড় পরে দেবার্চনা করুন ও ব্রাহ্মণদের আবার গাভী, ধান প্রভৃতি দশ রকম দ্রব্য দান করুন এবং অন্ধ, বধির, পঙ্গু, অনাথ সবাইকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করে তাদের তুষ্ট করুন। এর ফলে আপনার অমঙ্গল কেটে যাবে।

রাজা ব্রাহ্মণদের কথামত অনুষ্ঠান করে তিন দিন পর্যাপ্ত দানের জন্য কোষাগার উন্মুক্ত রাখার হুকুম দিলেন।

গল্প শেষ করে পুতুল রাজাকে ঐরূপ দানশীল কিনা জানতে চাইলেন।

রাজা নিরুত্তর রইলেন।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

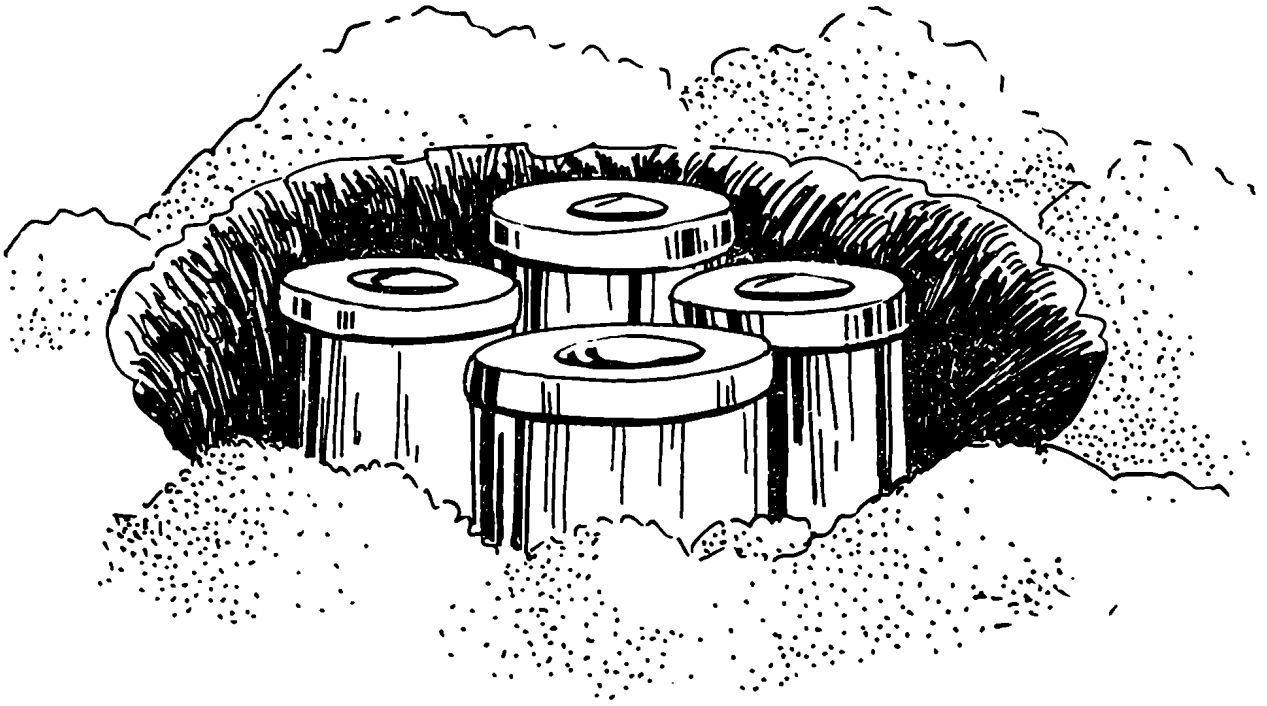

পরদিন সুভগা নামক একটি পুতুল বললো, শুনুন মহারাজ, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পুরন্দরপুরী নামে একটি নগরী ছিল। সেই নগরে সম্পদশালী নামে এক বণিক বাস করতেন। একদিন তিনি তাঁর চার পুত্রকে ডেকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা চার ভাই একসঙ্গে বসবাস করবে এ কথা ভাবতে পারছি না। তাই আমার সমস্ত সম্পত্তি বড়-ছোট অনুসারে ভাগ করে রাখছি। আমার মৃত্যুর পর আমার নির্দেশমত তোমরা তা গ্রহণ করবে।

পুত্ররা এতে রাজী হল।

একদিন বণিকের মৃত্যু হল।

তখন চার ভাই শান্তিতে থাকবার আশায় একত্র মিলিত হয়ে স্থির করল পিতার নির্দেশমত সমস্ত সম্পত্তি যার যা ভাগে পাওনা হয় তাই নিয়ে পৃথক থাকাই ভাল।

এই ঠিক করে খাটের নীচে মাটি খুঁড়ে একটি বড় ভাড়ের মধ্যে চারটি কৌটো তারা পেল। তার একটির মধ্যে রয়েছে মাটি, একটিতে কয়লা, অন্য একটিতে হাড় ও শেষটিতে কিছু খড়।

এই সব দেখে পুত্রদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

তখন চার ভাই মিলে রাজসভায় এসে উপস্থিত হল। সভায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকলেও এর কিছুই বুঝতে পারল না। তখন তারা অন্য এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হল।

এই সময় এক কুমোরের বাড়িতে রাজা শালিবাহন এসেছিলেন। তিনি জানতে পেরে সভায় উপস্থিত

হয়ে বললেন, এর মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে? বুদ্ধি খাটাবারই বা বিশেষ কি প্রয়োজন আছে। এরা চারজন একই বিত্তবান পিতার পুত্র। সেই ব্যক্তি বেঁচে থাকতেই তাঁর অতুল সম্পদ ভাগ করে রেখে গেছেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে মাটি দিয়ে গিয়েছেন, তার অর্থ হল সমস্ত ভূসম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্র পাবে। দ্বিতীয় পুত্রকে দিয়েছেন খড়, তার মানে যত ধান আছে সব দিয়েছেন তাকে। তৃতীয়জনকে দিয়েছেন হাড়, অর্থাৎ সমস্ত গৃহপালিত পশু তার অধিকারে থাকবে। আর চতুর্থ পুত্রকে দিয়েছেন কয়লা তার মানে এই পুত্র পাবে সমস্ত সোনা।

শালিবাহন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে চার ভাই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি তখনই এক দূত পাঠিয়ে শালিবাহনকে আহ্বান করলেন।

কিন্তু শালিবাহন রাজার এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বললেন, কে এই রাজা যে ডাকলেই তার কাছে যেতে হবে? যদি তার প্রয়োজন হয় তবে সে নিজেই আমার কাছে আসবে, আমার তাকে কোন প্রয়োজন নেই।

শালিবাহনের এমন স্পর্ধার কথা দূত মুখে শুনে তিনি রেগে গিয়ে বিশাল সেনা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। প্রতিষ্ঠান নগরে পৌঁছে প্রথমে দূত পাঠালেন শালিবাহনের কাছে।

দূত শালিবাহনকে গিয়ে বললো, মহারাজ এসেছেন, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

শালিবাহন উত্তরে বললেন, ওহে দূত, আমি রাজার সঙ্গে দেখা করব তবে সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে, দেখতে চাই রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন বীর!

দূত মুখে শালিবাহনের এই কথা শুনে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

শালিবাহন কুমোরের ঘরে তৈরি হাতি, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনা গঠন করে মন্ত্রে তাদের প্রাণদান করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

দুই পক্ষের সৈন্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা বিক্রমাদিত্য শালিবাহনের সমস্ত সৈন্যকে পরাজিত করে ফেলল। অবশেষে শালিবাহন উপায় না দেখে শেষ নাগকে স্মরণ করলেন। শেষ নাগ পাঠালেন অসংখ্য সাপ। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিক্রমাদিত্যর সৈন্যদের কামড়াতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে রাজা একা নগরে ফিরে এসে

সৈন্যদের বাঁচাতে জলে অর্ধেক দেহ নিমগ্ন করে নয় বৎসর বাসুকি-মন্ত্র জপ করলেন।

বাসুকি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বর প্রার্থনা কর।

বিক্রমাদিত্য বললেন, সর্পরাজ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক তবে শালিবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার দ্বারা প্রেরিত যে সব সাপ আমার সৈন্যদের কামড়ে হত্যা করেছে তাদের বাঁচিয়ে তোলার জন্য অমৃতকুম্ভ প্রদান কর।

সেই মত বাসুকি অমৃতকুম্ভ প্রদান করলেন।

অমৃতকুম্ভ নিয়ে রাজা যখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দ্রুত যাচ্ছিলেন তখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি প্রতিষ্ঠান নগর থেকে আসছি। আমার একটি জিনিস আপনার কাছে চাইবার আছে।

রাজা বললেন, আপনি যা চাইবেন, আমি তাই আপনাকে দান করব।

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনার হাতের ঐ অমৃতকুম্ভটি আমাকে দান করুন।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমাকে শালিবাহন পাঠিয়েছেন।

রাজা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি সেই অমৃতকুম্ভ ব্রাহ্মণকে দান করলেন।

ব্রাহ্মণ সেই অমৃতকুম্ভ গ্রহণ করে রাজাকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজাও তাঁর রাজধানীতে ফিরে এলেন।

পুতুল বললো, পারবেন মহারাজ, এমন দাতা হতে?

সেদিনও ভোজরাজ সিংহাসনে বসলেন না।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

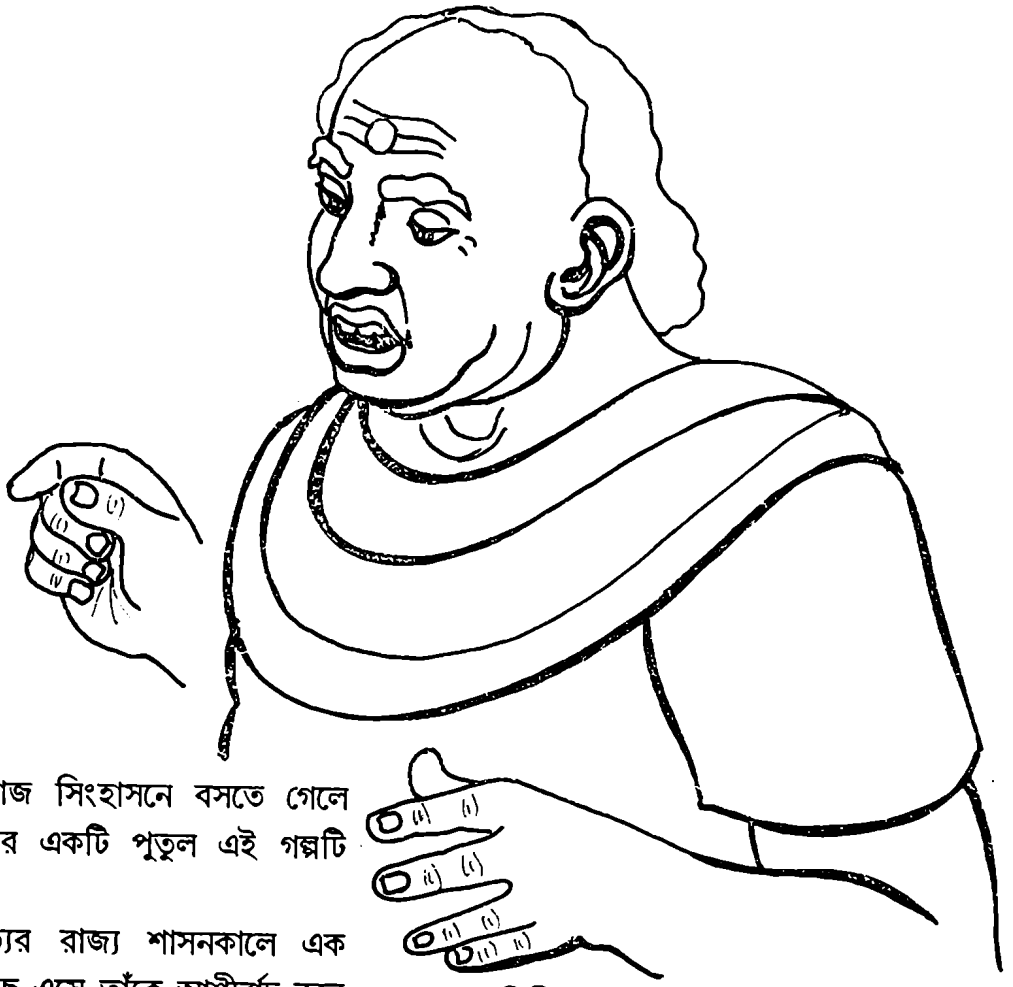

পরদিন রাজা ভোজ সিংহাসনে বসতে গেলে প্রিয়দর্শনা নামে আর একটি পুতুল এই গল্পটি বললো।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্য শাসনকালে এক জ্যোতির্বিদ তাঁর কাছে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, সূর্যদেব আপনাকে শৌর্য দিন, চন্দ্র দিন ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল দিন সুমঙ্গল, বুধ দিন বুদ্ধি, বৃহস্পতি দিন গুরুত্ব, শুক্র দিন পুত্র, শনি দিন কল্যাণ, রাহু দিন বাহুবল ও কেতু বংশের উন্নতি দান করুন।

রাজা সেই জ্যোতিষীর কাছে জানতে চাইলেন, এ বৎসর কোন্ গ্রহের কোথায় স্থান তা বর্ণনা করুন।

জ্যোতিষী বললেন, এ বৎসর রাজা রবি, মন্ত্রী মঙ্গল ও মেঘাধিপতি। শনি রোহিনী শকট ভেদ করে যাবে, সেই কারণে এ বৎসর অনাবৃষ্টি হবে।

জ্যোতিষীর এই কথা শুনে রাজা বললেন, এর প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই?

জ্যোতিষী বললেন, অবশ্যই আছে। গ্রহহোম করলে বৃষ্টি হয়।

তখন রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের কাছে সকল কথা বলে হোম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। অনুষ্ঠান শেষে রাজা চাল, কাপড় প্রভৃতি দান করে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করলেন। তারপর দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতিদের তুষ্ট করলেন। কিন্তু তাতেও বৃষ্টি হল না।

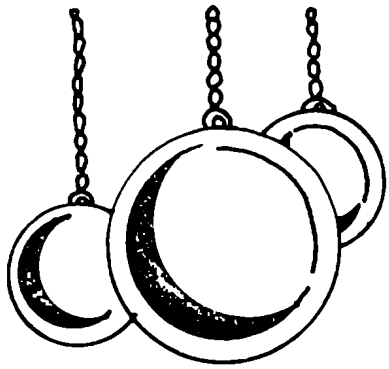

অনাবৃষ্টির ফলে দেশের লোক হাহাকার করতে লাগল।

রাজাও সকলের দুঃখে দুঃখিত হয়ে একদিন যজ্ঞগৃহে বসে যখন এই কথাই চিন্তা করছেন তখন আকাশবাণী হল—হে রাজন, যদি বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের গলা কেটে দেবীর চরণে উৎসর্গ করতে পার তবে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

এই আকাশবাণী শোনার পর রাজা দেবীকে প্রণাম নিবেদন করে যেই নিজ মস্তকে খড়্গাঘাত করতে উদ্যত হবেন অমনি দেবী তাঁর হাতখানি ধরে বললেন, হে রাজন, তোমার ধৈর্যগুণ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি, তুমি তোমার ইচ্ছা মত বর গ্রহণ কর।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়েছ তবে রাজ্যের এই অনাবৃষ্টি দূর করো।

দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান করলেন। রাজাও আনন্দিত চিত্তে সভায় উপস্থিত হলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনি কি প্রজাদের জন্য এতখানি ত্যাগ করতে পারবেন?

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

ষড়বিংশ উপাখ্যান

পরদিন আর একটি পুতুল বললো, হে রাজন্, আমার এই গল্প শুনুন। ঔদার্য, দয়া, বিবেক ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ রাজা আর কেউ ছিলেন না। তিনি যা বলতেন তার অন্যথা করতেন না। শাস্ত্রেও বলেছে—যেমন কথা তেমনি কাজ। সজ্জনদের মন, কথা ও কাজ এক প্রকার হয়।

একদিন স্বর্গে ইন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর সভায় অষ্টআশি হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটি দেবতা উপস্থিত আছেন। গন্ধর্বরাও আছেন। নারদ বললেন, ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্যের মত কীর্তিমান, পরোপকারী ও মহাগুণসম্পন্ন রাজা আর নেই।

তাঁর কথা শুনে সভায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন।

ইন্দ্র তখন সুরভিকে বললেন, তুমি মর্ত্যে গিয়ে বিক্রমাদিত্যের দয়া ও পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণের বিষয় সব জেনে আমাকে জানাও।

তখন সুরভি অত্যন্ত দুর্বল একটি গরুর রূপ ধারণ করে মর্ত্যে গমন করলেন।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান

পরদিন সুখসাগরা নামে একটি পুতুল এই গল্পটি বললো।

পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য এক ধার্মিক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করলেন। সেই রাজ্যের প্রজারাও ছিল সদাচারী, অতিথিপরায়ণ ও দয়াশীল।

সেখানে তিন-চার দিন থাকবেন ঠিক করে বিক্রমাদিত্য এক দেবালয়ে প্রবেশ করে দেবতাকে প্রণাম করে মণ্ডপে বসলেন।

এই সময় রাজপুত্রের মত দেখতে অতি সুদর্শন এক যুবককে দেখতে পেলেন। সঙ্গের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর সেই যুবক আবার চলে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে চিন্তা করলেন, কে এই যুবক!

দ্বিতীয় দিন সেই যুবক একা এসে মন্দিরে বসলো। এবার কিন্তু তার দেহে অলংকার ছিল না।

রাজা কৌতূহলবশত বললেন, হে যুবক, তোমার দেহ গতকালও ছিল অলঙ্কারভূষিত, সঙ্গে ছিল অনেক লোক। আজ কেন তোমার এই অবস্থা?

সেই যুবক বললো, গতকাল আমি সেইরকমই ছিলাম কিন্তু দৈবদোষে আজ আমার এই অবস্থা হয়েছে।

রাজা বললেন, কে তুমি?

যুবক বললো, আমি একজন জুয়ারী। পাশা খেলায় আমার হাত পাকা, তাছাড়া আমি শারীরক্রীড়াও জানি, বুদ্ধিবলও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সবই নিরর্থক, দৈববলই প্রকৃত বল।

রাজা বললেন, বিচক্ষণ হয়েও কেন তুমি এমন পাপ কাজ কর?

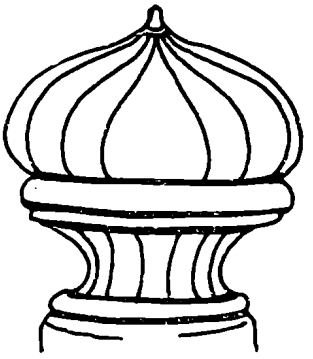

যুবক বললো, জুয়া খেলাই আমার জীবিকা, কি ভাবে তা ত্যাগ করব? যদি আপনি অর্থোপার্জনের কোন উপায় করে দিতে পারেন তবে এসব ছেড়ে দেব।

এই সময় দুই বিদেশী ব্রাহ্মণ এসে দেবালয়ের একপাশে বসে পরস্পরে আলোচনা করতে লাগলেন। একজন বললেন, আমি পিশাচলিপি দেখেছি, তাতে লেখা আছে এই মন্দিরের ঈশান কোণে তিন ঘড়া মোহর পোঁতা আছে; তবে তার কাছেই আছে এক ভৈরব মূর্তি। যে নিজের গলা কেটে দিয়ে ভৈরবকে তৃপ্ত করতে পারবে সে ঐ ধনের অধিকারী হবে।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে যেই নিজের গলা কেটে ভৈরবকে তৃপ্ত করতে উদ্যত হয়েছেন অমনি ভৈরব দেখা দিয়ে বললেন, তোমার ত্যাগ ও সাহস দেখে তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন, যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই যুবককে কলস তিনটি দিন।

ভৈরব রাজার কথামত তা দিলে যুবক রাজার প্রশংসা করে ফিরে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনার কি এমন গুণ আছে?

সেদিনও ভোজরাজের সিংহাসনে বসা হল না।

অষ্টবিংশ উপাখ্যান

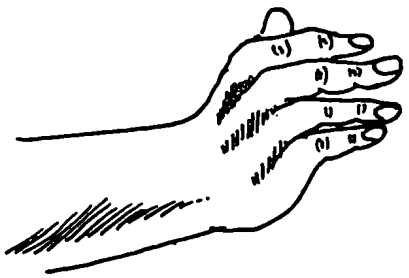

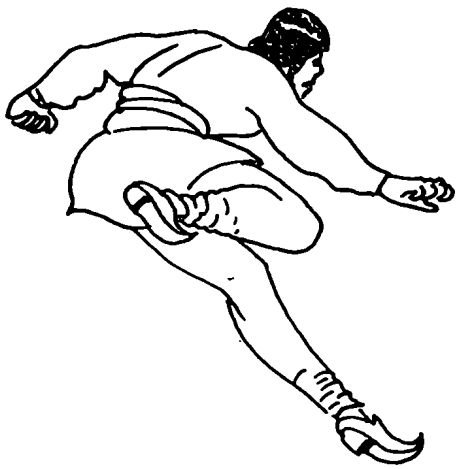

পরদিন শশীকলা নামে আর একটি পুতুল বললো, শুনুন মহারাজ, পৃথিবী পরিক্রমা করতে বেরিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য এক নগরে এসে উপস্থিত হলেন। সেই নগরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে এক নদী। সেই নদীর তীরে নানা ফুল ও ফলে শোভিত এক বন ছিল। সেই বনের মধ্যে ছিল অতি মনোরম এক দেবমন্দির। রাজা সেই নদীতে স্নান করে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরে বসলেন।

এই সময় চারজন বিদেশী এসে রাজার কাছে বসল। রাজা তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে পরিচয় জানতে চাইলেন।

একজন বললো, আমরা অপূর্ব এক দেশ থেকে আসছি।

রাজা বললেন, সেই অপূর্ব দেশে কি কি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে?

সে বললো, সেই দেশে বেতালপুরী নামে একটি নগর আছে। সেখানে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবতা আছেন। সেখানকার রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের যাতে কোন অমঙ্গল না হয় তার জন্য প্রতি বৎসর একজন পুরুষকে সেই দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়। সেই নির্দিষ্ট দিনে যদি কোন বিদেশী সেই নগরে উপস্থিত হন তবে তাঁকেই দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়। আমরাও সেইরকম দিনে সেই নগরে ভুলক্রমে গিয়ে পড়ি। সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের ধরতে এলেই আমরা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসি।

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালপুরীতে উপস্থিত হলেন এবং দেবতাকে প্রণাম করে সেই মন্দিরে বসলেন।

সেই সময় একজন লোককে বন্দী করে বহু লোক বাজনা বাজিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

রাজা বিক্রমাদিত্য বুঝলেন, একেই আজ দেবতার কাছে বলি দেওয়া হবে। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, আমি আমার এই দেহ মায়ের পায়ে উৎসর্গ করে একে বাঁচাব। এই দেহ খুব বেশী হলে একশত বৎসর থেকে তারপর তো বিনষ্ট হবেই।

রাজা সেই প্রধান পুরুষদের বললেন, এই লোকটিকে দিয়ে আপনারা কি করবেন?

তাঁরা বললেন, একে আমরা দেবতার কাছে বলি দেব। এই বলিদানের দ্বারা দেবী তুষ্ট হয়ে আমাদের মঙ্গল করবেন।

রাজা বললেন, এ ভয়ে কাতর এবং দেহও ক্ষীণ, এর দেহ বলি দিলে দেবী তুষ্ট হবেন না। একে ছেড়ে দিন, এর বিনিময়ে আমার শরীর দান করছি। আমার দেহ হৃষ্টপুষ্ট, আমার মাংস উপহার পেলে দেবী তুষ্ট হবেন। আমাকেই বলি দিন।

এই কথা বলে সেই লোকটিকে মুক্ত করে দিয়ে রাজা নিজে সেই দেবীর সামনে উপস্থিত হয়ে যেমনি নিজের গলায় খড়্গাঘাত করতে উদ্যত হলেন অমনি দেবী সেই খড়্গটি ধরে বললেন, তোমার পরোপকারিতা দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন, হে দেবী, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাক তবে আজ থেকে নরবলি বন্ধ হোক।

দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্ধান করলেন।

এরপর রাজা তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজ নগরে ফিরে এলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনি কি পরের জন্য এতটা চিন্তা করেন? যদি করেন তো সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ সরে দাঁড়ালেন।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন অন্য একটি পুতুল বললো, মহারাজ, আমার নাম চন্দ্ররেখা, আগে আমার এই গল্পটি শুনুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সভায় বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন রাজকুমারেরা। এমন সময় এক স্তুতিকার এসে বললো, হে রাজন, যতদিন পবিত্র গঙ্গা নদী প্রবাহিত থাকবেন, যতদিন আকাশে সূর্যদেব পৃথিবীকে তাপ ও আলো দিয়ে যাবেন, ততদিন পুত্র পৌত্রাদিসহ সুখে রাজত্ব করুন। আমি দূরদেশে বাস করি, আপনার অনেক খ্যাতির কথা শুনে এখানে এসেছি। আপনাকে পেয়ে আজ আমার দারিদ্র্যদশা ঘুচবে। আপনাকে দেখে জম্বরী নগরের রাজা ধনেশ্বরের কথা মনে পড়ছে। তিনি দরিদ্রদের দুঃখ দূর করার জন্য প্রার্থীদের অকাতরে ধন দান

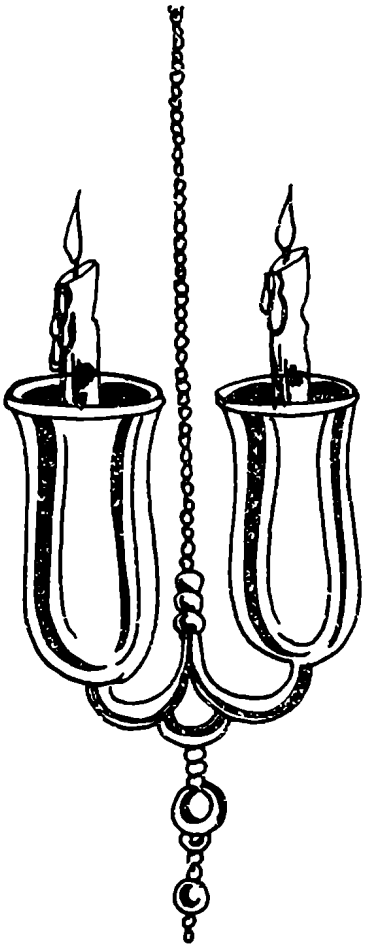

করতেন। তিনি একবার বসন্তপূজার আয়োজন করলে অসংখ্য প্রার্থী এসে উপস্থিত হয়েছিল। রাজা সেই প্রার্থীদের আঠারো কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করেছিলেন। উদারতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ সেই রাজার পর আপনাকেই প্রথম দেখলাম।

তার সব কথা শোনার পর রাজা তাঁর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আদেশ দিলেন, একে কোষাগারে নিয়ে যাও, এ যত রত্ন এবং মুদ্রা চাইবে, দিয়ে দাও।

কোষাধ্যক্ষ তাকে তার ইচ্ছামত রত্নাদি দিলে স্তুতিকার ব্রাহ্মণ রাজাকে 'ব্রহ্মার মত চিরজীবী হোন' বলে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

গল্প শেষ করে পুতুল বললো, মহারাজ, আপনি কি এমন দান করতে পারবেন?

ভোজরাজ নিরুত্তর রইলেন।

ত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন হংসগামিনী নামে আর এক পুতুল বললো, শুনুন মহারাজ, একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে পাত্র-মিত্র ও রাজকুমারেরা বসে আছেন, এক জাদুকর ঐ সময় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে রাজন, আপনি সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী, অনেক শ্রেষ্ঠ জাদুকর তাদের কলাকৌশল আপনাকে দেখিয়েছে, আজ আমি একটি বুদ্ধির খেলা দেখাব।

রাজা বললেন, এখন আমাদের সময় হবে না। আহারের সময় উপস্থিত। আগামী কাল সকালে দেখবো।

পরদিন বিক্রমাদিত্য সভায় এসে বসেছেন, এমন সময় কাঁধে বিশাল এক খড়্গ নিয়ে একজন লোক এলো, তার সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে।

সভায় উপস্থিত রাজপুরুষেরা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিদেশী, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

সে বললো, আমি ইন্দ্রের পরিচারক ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অভিশাপ দেওয়ায় আমি পৃথিবীতে বাস করছি। আমার সঙ্গে যাঁকে দেখছেন, ইনি আমার স্ত্রী। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, এখন আমি সেখানেই যাচ্ছি। তাই আপনার কাছে আমার স্ত্রীকে রেখে যেতে চাই।

এরপর সেই বিশালকায় লোকটি তার স্ত্রীকে রাজার কাছে রেখে খড়্গের উপর ভর করে যেমনি আকাশে উঠে গেল, ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে ভেসে এল 'মার মার, ধর ধর' এইরূপ ভীষণ কণ্ঠস্বর।

সভাস্থ সকলে আকাশের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে রাজসভার মাঝখানে একখানি রক্তমাখা খড়্গ ও রক্তাক্ত একখানি হাত এসে পড়ল। তারপরই একটা

কাটা মুণ্ড ও একটা মুণ্ডছাড়া ধড় এসে পড়লো। সবাই বুঝলো সেই লোকটিই মারা গেছে।

এই দৃশ্য দেখে সেই স্ত্রীলোকটি বললো, হে রাজন, আমার স্বামী যুদ্ধে শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছেন। আমি আর বেঁচে থেকে কি করবো? আমি ওর সঙ্গে সহমরণে যাব।

এই কথা বলে মেয়েটি রাজার পা জড়িয়ে ধরল। রাজা ব্যথিত মনে চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

স্বামীর শবসহ সহমরণের জন্য আগুনে ঝাঁপ দিল সেই স্ত্রীলোকটি।

সূর্য অস্তাচলে গেল।

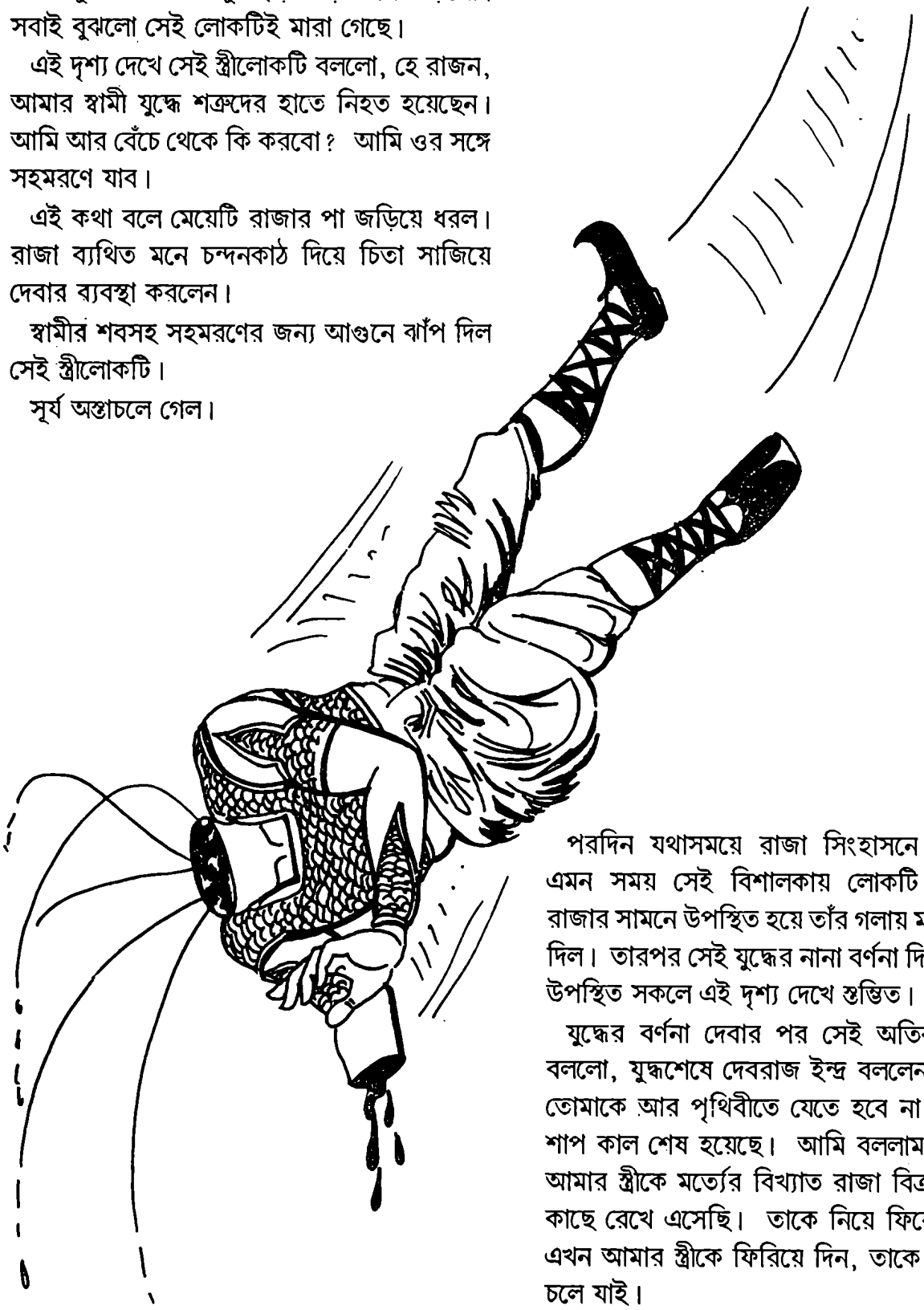

পরদিন যথাসময়ে রাজা সিংহাসনে বসেছেন। এমন সময় সেই বিশালকায় লোকটি খড়্গহাতে রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল। তারপর সেই যুদ্ধের নানা বর্ণনা দিতে লাগল। উপস্থিত সকলে এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত।

যুদ্ধের বর্ণনা দেবার পর সেই অতিকায় পুরুষ বললো, যুদ্ধশেষে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, হে বীর, তোমাকে আর পৃথিবীতে যেতে হবে না। তোমার শাপ কাল শেষ হয়েছে। আমি বললাম, হে প্রভু, আমার স্ত্রীকে মর্ত্যের বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে রেখে এসেছি। তাকে নিয়ে ফিরে আসছি। এখন আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিন, তাকে নিয়ে স্বর্গে চলে যাই।

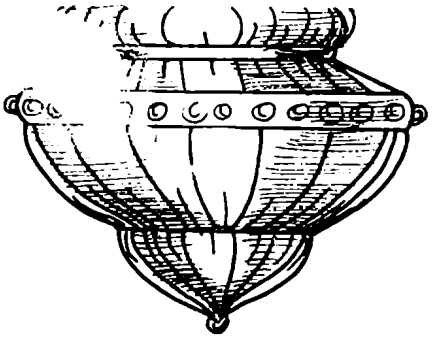

এই কথা শুনে রাজা এবং সভায় উপস্থিত সকলেই চুপ করে রইলেন।

সে বললো, আপনারা সকলে চুপ করে আছেন কেন?

সভাসদরা বললো, হে বীর, তোমার স্ত্রী আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় সকলেই চুপ করে থাকলে সেই পুরুষ বললো, মহারাজ, আপনি ব্রহ্মার মত চিরআয়ুষ্মান হোন। আমিই সেই জাদুকর। আপনাকে আমার জাদুর খেলা দেখালাম। রাজা খুব খুশি হলেন।

এমন সময় কোষাধ্যক্ষ এসে জানালেন, পাণ্ড্যরাজ্য প্রভুকে প্রচুর ধনরত্ন কর হিসাবে পাঠিয়েছেন।

রাজা বললেন, কি পাঠিয়েছে?

কোষাধ্যক্ষ বললেন, আট কোটি সুবর্ণমুদ্রা, তিরানব্বই কোটি মুক্তার ভার, পঞ্চাশটি হাতী, ও তিনশত অশ্ব।

রাজা বললেন, এই সবকিছুই এই জাদুকরকে দিয়ে দাও।

কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশ পালন করলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনি কি এতটা উদার হতে পারবেন?

ভোজরাজ চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না।

একত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন রসবতী নামে আর একটি পুতুল বললো, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে একদিন এক সন্ন্যাসী রাজার হাতে একটি ফল দিয়ে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বললেন, রাজন, আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে মহাশ্মশানে হোম করব। আমার ইচ্ছা আপনি হোন আমার উত্তরসাধক। সেই শ্মশানের অনতিদূরের একটি শিরীষ গাছে এক বেতাল বাস করে। আপনি অতিসন্তর্পণে তাকে নিয়ে আসবেন।

রাজা কথা দিলেন।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সেই গাছটি দেখিয়ে দিলে রাজা বেতালকে কাঁধে নিয়ে যখন নীরবে আসছিলেন তখন বেতাল বললো, হে রাজন, পথশ্রম দূর করতে আপনি একটা গল্প বলুন।

রাজা কিন্তু সন্ন্যাসীর কথামত মৌনই রয়ে গেলেন।

বেতাল বললো, আপনি মৌনভঙ্গের ভয়ে কথা বলছেন না বুঝতে পারছি। বেশ, তবে আমিই গল্প বলি, তবে আমার গল্প বলা শেষ হলেও যদি আপনি মৌনভঙ্গ না করেন তবে আপনার মস্তক শতচ্ছিন্ন হবে।

এই কথা বলে বেতাল গল্প বলতে আরম্ভ করলো।

হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্যবতী নামে এক সুন্দর নগরী আছে। সেখানকার রাজার নাম সুবিচারক। তাঁর পুত্রের নাম ময়সেন। একদিন ময়সেন শিকার করতে বেরিয়ে একটি হরিণকে দেখতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করে এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন। যা হোক, একটা পথ খুঁজে পেয়ে যখন একাকী চলছিলেন তখন একটা নদী দেখলেন। সেই নদীর

তীরে এক ব্রাহ্মণের দেখা পেলেন।

রাজপুত্র ময়সেন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আমি তৃষ্ণার্ত, আমার ঘোড়াটি একটু ধরুন, আমি জল পান করব।

ব্রাহ্মণ বললেন, কে হে তুমি? আমি কি তোমার চাকর যে তোমার ঘোড়াটি ধরব আর তুমি জল পান করবে? আব্দার তো তোমার মন্দ নয়!

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে রাজপুত্র ভীষণ রেগে গিয়ে তাঁকে চাবুকের বাড়ি মারলেন।

ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বললেন।

রাজা পুত্রের এই অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন।

মন্ত্রী রাজাকে বললেন, রাজপুত্র সুখে মানুষ হয়েছে, তাঁকে এই গুরুদণ্ড দেবেন না।

রাজা বললেন, মন্ত্রী, এই দণ্ডই ঠিক হয়েছে। ব্রাহ্মণকে চাবুক মারার এটাই উচিত শাস্তি। ব্রাহ্মণকে পূজা করা শাস্ত্রবিধি। আমার আদেশ, রাজপুত্র যে হাতে ব্রাহ্মণকে চাবুক মেরেছে সেই হাতখানা কেটে ফেল।

মন্ত্রী রাজি না হলে রাজা নিজেই পুত্রের হাতখানা কাটতে উদ্যত হলে সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রাজন, রাজপুত্র ভুল করে এই কাজ করে ফেলেছে, আর কখনও এমন করবে না। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি তাকে এবারের মত ক্ষমা করুন। আপনার বিচারে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তাঁর পুত্রকে ক্ষমা করলেন। ব্রাহ্মণও যথাস্থানে ফিরে গেলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, রাজা এবং ব্রাহ্মণ —এই দু'জনের মধ্যে কে গুণে শ্রেষ্ঠ বলুন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজাই গুণে শ্রেষ্ঠ।

রাজার মৌনভঙ্গ হওয়ায় বেতাল পুনরায় শিরীষ কাছে ফিরে গেল। রাজাও আবার সেই শিরীষ গাছে উঠে বেতালকে নামিয়ে তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

তখন বেতাল আর একটি গল্প বলতে আরম্ভ করল। এই ভাবে বেতাল পঁচিশটি গল্প রাজাকে বলেছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যেকটি গল্পেরই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। এতে বেতাল রাজার সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললো, হে রাজন, এই সন্ন্যাসী আপনাকে বধ করতে চায়। আমি আপনাকে যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনি যখন আমাকে সেই

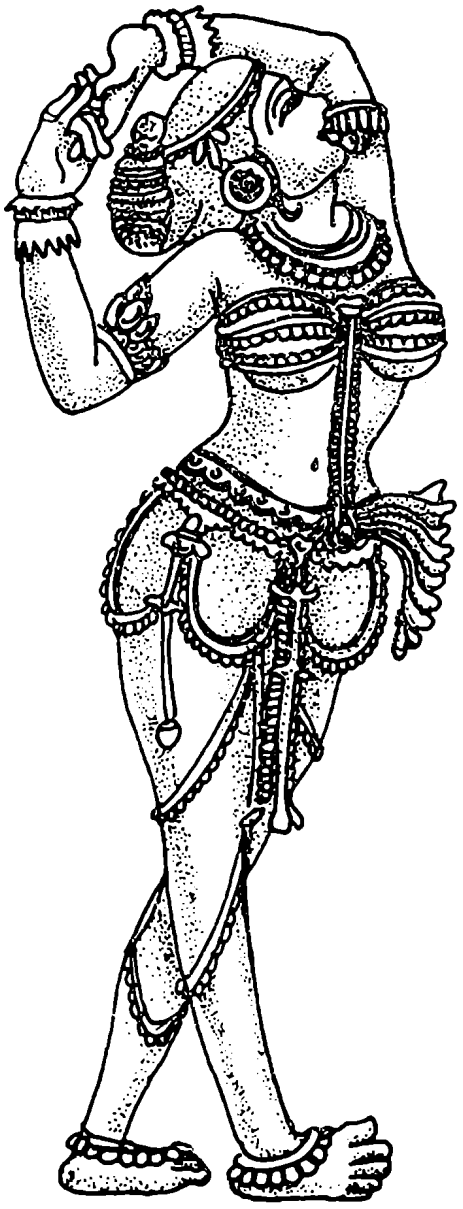

সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাবেন তখনই সন্ন্যাসী বলবে, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, এই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নিজের নগরে ফিরে যান।

সন্ন্যাসী এই কথা বললে আপনি যেই সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জন্য মাথা নত করবেন তখনই সে খড়্গ দিয়ে আপনাকে বধ করবে! তারপর আপনার মাংস দিয়ে হোম করবে। এই কাজটি করলেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে তার।

রাজা বললেন, এখন আমার কি কর্তব্য?

বেতাল বললো, সন্ন্যাসী যখন আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে বলবে তখন আপনি বলবেন—আমি রাজা, সকলে আমাকেই প্রণাম করে, আমি কাউকে প্রণাম করি না তাই জানি না কিভাবে প্রণাম করতে হয়। আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন। দেখাবার জন্য যেই সন্ন্যাসী মাথা নত করবে তখনি আপনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। তাহলে অষ্টসিদ্ধি লাভ আপনারই হবে।

বেতালের পরামর্শমত রাজা তাই করলেন।

বেতাল বললো, হে রাজন, আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি—বর প্রার্থনা করুন।

রাজা বললেন, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়েছ তবে প্রতিশ্রুতি দাও, আমি যখনই তোমাকে ডাকব তখনই আমার সামনে উপস্থিত হবে।

'বেশ, তাই হবে' বললে বেতাল সে স্থান ত্যাগ করলে রাজাও তাঁর নগরীতে ফিরে গেলেন।

পুতুল বললো, মহারাজ, আপনার কি এমন সাহস আর ধৈর্য আছে?

ভোজরাজ মাথা নীচু করলেন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান

পরদিন রাজা ভোজরাজ সিংহাসনে বসতে গেলে শেষ পুতুলটি বললো, হে রাজন, আমার নাম উন্মাদিনী, এই সিংহাসনে একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্যই বসবার যোগ্য। তাঁর তুল্য রাজা এই পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তিনি কাঠের খড়্গ নিয়ে সারা পৃথিবী জয় করে একচ্ছত্র রাজা হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, সমস্ত দুর্জনদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে, দরিদ্রদের অকাতরে দান করে দারিদ্র্যমোচন করেছিলেন।

হে রাজন, আপনি তো শুনলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সকল গুণের কথা। যদি এই সব গুণ আপনার থাকে তবে অবশ্যই সিংহাসনে বসুন।

ভোজরাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বত্রিশটি পুতুল এবার সমস্বরে ভোজরাজকে বললো, হে রাজন, আপনিও সামান্য একজন রাজা নন, আপনার মত পবিত্র চরিত্র, কলাবিশারদ, ঔদার্য গুণসম্পন্ন রাজা বর্তমানে আর কেউ নেই। আপনার অনুগ্রহে আমাদের পাপ ক্ষয় হল। আমরা শাপমুক্ত হলাম।

আমরা বত্রিশজন পার্বতীর সখী ছিলাম। আমরা দেবীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলাম।

একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আমাদের অভিশাপ দিলেন, তোরা নির্জীব পুতুল হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি কর গিয়ে। আমরা তখন তাঁকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে এই শাপের অবসানের জন্য প্রার্থনা করলাম। তখন দেবী বললেন, সেই সিংহাসনে একসময় রাজা বিক্রমাদিত্য বসবেন। তারপর রাজা ভোজরাজ ঐ সিংহাসনে বসতে গেলে তোদের মুখ থেকে রাজা বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণ ও দয়াশীলতার কথা শুনবে এবং তখনই তোদের শাপের অবসান হবে।

এরপর ভোজরাজের অনুমতি নিয়ে পুতুলরা চলে গেল।

ভোজরাজ আর সিংহাসনে বসলেন না। ঐ সিংহাসনের উপর শিব-পার্বতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রোজ পূজা করতে লাগলেন এবং বিক্রমাদিত্যের আদর্শ অনুসরণ করে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

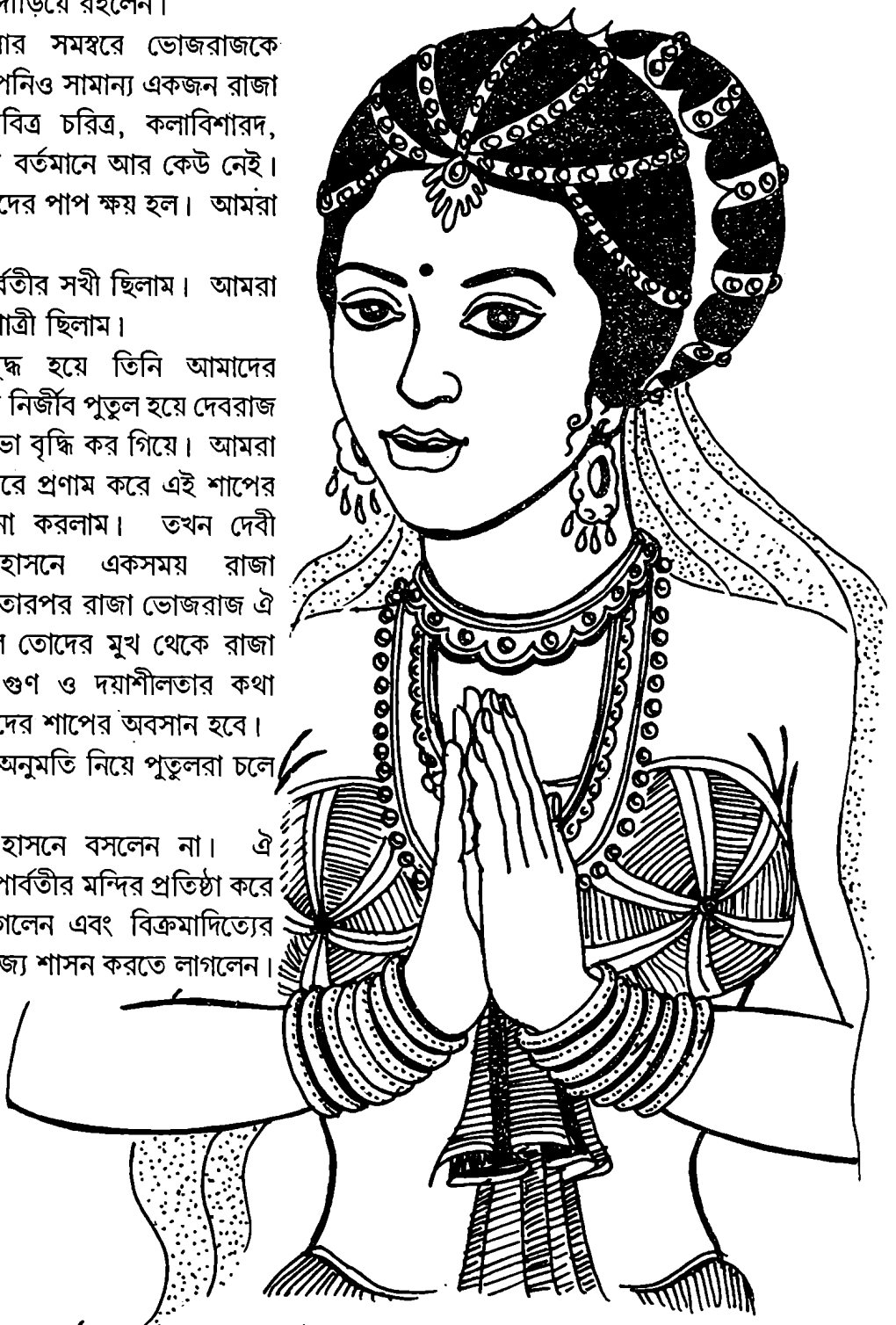

।। শেষ ।।